সংখ্যা — ১, ৮ - ১২
১৩৬১ -- ১৩৬২

ত্রয়োদশ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
অকালজন্ম শিশু	শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	২০০
অভিভাবকের অভিজ্ঞতা	শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী	২০৯
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মরণে	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২০৪
আচার্যের ভাষণ	ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৩
আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের স্থান	শ্রীস্বামাপদ বর	২৩২
আমাদের বাণীপুর	শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	২১৯
আলোচনা	১, ২৫, ৪১, ৭৩, ৯৭, ১২১, ১৫৪, ১৬৯, ১৯৩, ২১৭, ২৪১, ২৬১	
আমার শিক্ষক	শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	৭৬, ২২৯
ইতিহাসের লক্ষ্য ও মূল্য	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	২৮১
উপাচার্যের ভাষণ	ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	৫৪
একটি আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়	শ্রীস্বামাপদ বর	৯০
গ্রাম থেকে জেলা ও প্রদেশ	শ্রীবকুলমালা সেন	২৫২
ছাত্র-জীবনের স্মৃতি	শ্রীমৈত্রেয়ী দাসগুপ্তা	২৫৬
জগত্তারণ দাস	শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	১৯৬
টয়েনবী ও বর্তমান জগৎ	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১০২
টোলের শিক্ষা	শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য	২৪৭
"দাও প্রেম, আ'রো প্রেম"	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৯১
দার্জিলিংএর পথ	শ্রীআদিনাথ সেন	২০৭
নয়ী তালিমের কর্মীদের প্রতি	শ্রীবিনোবা ভাবে	১২৪
নয়ী তালিমের শিক্ষকদের হাতে	"	২৩৪
নূতন শিক্ষায় কাতাই শিল্প	শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১১৪
পাঠে ছেলেদের পরিচালনা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	১৫৩
পাশ্চাত্যদেশে ইতিহাসলেখার ক্রমবিকাশ	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	১৬৩
প্রাথমিক শিক্ষকের পত্র	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	১৬৮
প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	১৯১
বয়ঃসন্ধি	শ্রীমতী শেফালি গুপ্ত	৮৪
বঙ্কিমের মতপরিবর্তন ও ভবিষ্যৎগণনা	শ্রীআদিনাথ সেন	১৮৫
বাংলা পড়াশোর পর্যবেক্ষণ শক্তির অনুশীলন	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	২১১
বি. টি. কলেজ ও শিক্ষণ সমস্যা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	১৭৪

প্রবন্ধ	লেখক	পত্রাঙ্ক
বিদ্যালয় পরিদর্শন	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	১৪৮, ২২৬
বিশ্রামের পরিবর্তন	শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত	২১১
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীবিমানচন্দ্র রায়	৬০
বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসব	ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী	৫৭
বুনিয়াদি শিক্ষার পরীক্ষা	শ্রীবিনোবা ভাবে	১০০
ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান	ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫, ৪০, ৭১, ৮১, ১১৭, ১৪০, ১৫১, ১৭৬
ভূগোল শিক্ষা	শ্রীমতী বকুলমালা সেন	৪১,৬৮,১০১,১৪৭,১৭৮,২৬৮
মাষ্টার মশাই সুকুমার মিত্র	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩২
শারীরিক কাজ আর বুনিয়াদি শিক্ষা	শ্রীকালীপদ ঘোষ	৪১
শিশুজীবনের দ্বিতীকরণ	শ্রীজহরলাল নেহেরু	৪১
শিশুর শিক্ষায় অনুকরণ বৃত্তির প্রভাব	শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত	১৭০
শিশুর সমস্যা	শ্রীনীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪২
শিক্ষা ও সমাজসেবা	ঐ	২৫৮
শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি কথা	শ্রীজীবেন্দ্র দে	১৮৮
শিক্ষাসংস্কারের একটা দিক	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ	১২, ২৮
শিক্ষায় একদিক	শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত	৯৪
সবব'ন্ত প্রথায় শিক্ষা	শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী	১৬
সমাজশিক্ষার আদি কথা	শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়	২৩৪
সমাবর্তন অভিভাষণ	শ্রীজীবেন্দ্র দে	৮৮
সার্থকতার পথ		৬৬
সিয়েরা ও ইস্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা	শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত	১৩৩
	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	৭

P30590

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৬১ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

নববর্ষ

মানুষের নববর্ষ প্রাণে নূতন আশার কথা বহন করিয়া আনে। নূতন উদ্যম নূতন আনন্দের হিল্লোলে মানুষের চেতনাকে পুলকিত করিয়া তোলে। শিক্ষার নববর্ষ আজ কি নূতন উদ্যম ও আশার কথা আমাদের জন্য বহন করিয়া আনিল? এই পত্রিকা পরিচালনার সার্থকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা পথ চলিতেছি। সেই পথ সুগম হউক, শিক্ষার মূল সূত্রটি সব লোকের মনেও ধ্বনিত হউক, সহযোগের সাড়া জাগাইয়া তুলুক, শিক্ষাব্রতে অন্তত দুই চারি জনেরও নিষ্ঠা আসুক, ইহাই আমাদের কামনা। শিক্ষার লেখক, পাঠক ও গ্রাহক সকলের সহযোগিতা ও শুভকামনা আমাদের পাথেয় হউক।

ভারতের উচ্চ শিক্ষা

শিক্ষাসমস্যার অনেকগুলি দিক আজ দেশের লোকের মনে চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে ইহা আশার কথা। সমাধান সাধারণ লোকের হাতে কতটুকুই বা আছে। কিন্তু যখন দেখি সকলেই কিছুটা মাথা ঘামাইতেছেন, হয়তো শুধু প্রচলিত ধারাকে নিন্দা করিয়াই কাজ হইতেছেন, তখন মনে আশা হয়। একেবারে অন্ধের মত মানিয়া লওয়া মৃত্যুর সমান। সমালোচনা যখন হয়, তখন পরিবর্তন একদিন আসিবেই। দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ, এই তিন স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধেই আজ চিন্তাশীল লোকে চিন্তা করিতেছেন। আমরা আগেও বলিয়াছি, এই স্তরগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, শিক্ষার গোড়াতেও দিতে হইবে, মধ্যবর্তী স্তরেও তাহাকে পরিশোধন করিতে হইবে, তবে তো উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য-কমিশন অন্যান্য সিনিদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের সুযোগসুবিধা প্রদানের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এক প্রেস কনফারেন্সে কমিশনের সভাপতি ডাঃ ভাটনাগর বলেন যে কমিশন শিক্ষার মান আশানুরূপ উন্নত মনে করেন না এবং শিক্ষাদান ও গবেষণার উন্নতি বিধানের জন্য সরকার কি করিবেন তাহাও তিনি জানান।

তিনি বলেন, ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান ও গবেষণার উন্নতিকল্পে আগামী

পাঁচ বৎসরের জন্য বার্ষিক পাঁচ কোটি টাকা হিসাবে সাহায্য-কমিশনের হাতে টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত অর্থাৎ প্রায় পনেরো কুড়ি লক্ষ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কমিশন ইতিপূর্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ লক্ষ, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এগারো লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কমিশনের সভাপতি ডাঃ ডাটনাগর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ঘোষ ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নত করা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা আশা করি, এই সব আলোচনার ফল শুভ হইবে ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত গবেষণার কাজ উপযুক্ত ভাবে চলিবে ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা গৌরব অর্জন করিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সারা বৎসর ধরিয়াই কোন কোন পরীক্ষা চলিতে থাকে। তবে ফেব্রুয়ারি মাসে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হইতে আরম্ভ হইয়া বি. এ, বি. টি, বি. কম পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষার ভোর মরশুম চলিতে থাকে। পরীক্ষার দিন নির্ধার, প্রশ্নপত্র রচনার নির্ভুল ব্যবস্থা, পরীক্ষা ভবনে ছাত্রছাত্রী ও পরিদর্শকদের আচরণ, খাতা সমস্যা এ সময়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া মনে আশঙ্কা জাগে। যাওদার বাহিরে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থা তো চরমে উঠিয়াছে। আমরা সর্বান্তঃকরণে চাহিতেছি, এ বৎসর পরীক্ষা ব্যাপারটি যেন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে। কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তা ও ন্যায়নিষ্ঠার থাকিলে ছাত্রদের ব্যবহার অবিনীত হওয়ার কারণ কম ঘটিবে। বাধ একবার আলগা করিলে পরে টানিয়া ধরা কঠিন।

আমেরিকার স্কুল সমূহে বিভিন্ন বর্ণের ছাত্রছাত্রীর মেলামেশা

আফ্রিকার কথা ছাড়িয়া দিই। সেখানকার বর্ণবিভেদ সমস্যা শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এত প্রকট যে তাহার আলোচনা নিতান্তই অপ্রীতিকর। আমেরিকার কালা গোরা অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ও নিগ্রো আমেরিকানদের বর্ণ বৈষম্য আবহমান কাল হইতে অনেক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। অন্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা মর্মান্তিক ক্ষতি করে—আজ আমেরিকাবাসী সেদিকে খানিকটা সচেতন হইয়াছেন। শিক্ষা মন্দিরে বৈষম্যের যে বীজ শিশুর হৃদয়ে উপ্ত হইল তাহাই তো জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিবে। শিক্ষাবিদ্ ও হিতৈষীগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রের সমুদয় বিদ্যালয় হইতে বর্ণবৈষম্য বাতিল করিয়া রায় দিয়াছেন। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমেরিকান রিপোর্টারের মতে উত্তর অঞ্চলে বিশেষত রাজধানী ওয়াশিংটনে এবং দক্ষিণের কোন কোন স্থানে এই নির্দেশ পালনের ইচ্ছা দেখা যাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মেরিল্যাণ্ডের একটি সহরের বিদ্যালয়ের শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রো ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি বসা খাওয়া, খেলা ও পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা চলিতেছে। তাহাতে কেহ বাধা দিতেছে না—এই মুক্ত লোকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণের একটি মাত্র স্থানের দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইতেই বোঝা যায় যে সুপ্রীম কোর্টের রায় সেখানে এখনও কাগজে কলমে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার এক কারণ, সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কি উপায়ে উহাকে কাজে পরিণত করা যায় তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ তাঁহারা দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যৎ

নানা অকল্যাণের আশঙ্কা আজও লোকের মনে বদ্ধমূল।

অবশ্য আন্দোলন যদি চলিতেই থাকে তবে সহরাঞ্চলে যাহা সহজ হইয়া আসিতেছে ক্রমে গ্রামাঞ্চলেও তাহা গৃহীত হইবে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন বিদ্যালয়গুলি যদি তাহাদের বৈধব্যমূলক ব্যবস্থা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হয় তবে ভবিষ্যতে জাতির জীবনে আবার কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিবে না।

সারদা-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রদর্শনী

পরম সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনব্যাপী সাধনার ফল ও তাঁহার অপূর্ব জীবনকথা আজ শুধু বাঙলা দেশে নয় বা শুধু ভারতে নয়, দেশে বিদেশে সর্বত্র এক মহা ভাবের রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব বলিবার কথা নয়, সারা বিশ্ব আজ স্বীকার করে যে ভারতবাসীর সকল প্রেরণার মূল উৎস তাহার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। যুগে যুগে যে সকল মহাপুরুষ এই অধ্যাত্ম চেতনার দীপ জ্বালিয়া জাতিকে প্রেরণায় ও চেতনায় ভাবের পথে পরিচালিত করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।

এই মহাপুরুষের সাধনার পথে যে সব শুভ যোজনা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন শ্রীসারদা দেবী। এক শুভ লগ্নে ইনি স্বামীর কাছে আসিলেন—সেবার পরিচর্যার সান্নিধ্যে তিনি আদর্শ জীবনসঙ্গিনী, সহধর্মিণী ও সহকর্মিণীর পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আপাতিক অর্থে নয়—সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গিনী হইলেন। এই আদর্শ নারীর মধ্যে ভারতের চিরন্তন নারীর মূল মূর্তিটি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহিমময় নারীত্বে তিনি সকলের মা হইয়া পূজা পাইয়াছেন। তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া নারীমহিমার যে আদর্শ পালন করিয়াছিলেন তাহাকে লোকচক্ষুর সমক্ষে তুলিয়া ধরার প্রয়োজন ছিল—সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যই বুঝি স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতার এদেশে আসা। ভগ্নী নিবেদিতাকে আমরা অনেক কিছুই দান মনে রাখিব কিন্তু তাঁহার সব চেয়ে বড় কাজ বোধ হয় সারদা দেবীর চিরন্তনীয় এই নারীত্বের মহিমার দেশবাসীর কাছে ভারতের নারীর আদর্শ প্রচার করা। নিবেদিতা বুঝিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের বহু জিনিস গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু ভারতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ না হইলে ভারতের নারী নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সারদা দেবী সাদাসিধা কথায় সহজ ভাষায় নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন, তাহাকেই রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখ অনেক তাঁহার অনুরাগী কন্যাগণ।

আমাদের দেশ আজ নানা বাহ্যিক আড়ম্বরে চাকচিক্যে বিভ্রান্ত, সেখানে এই সব আদর্শ মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনকথা যত শোনান হয়, চিত্রে, কাহিনীতে উজ্জ্বল করিয়া ধরা হয় ততই মঙ্গল। ভুলিয়া যাওয়া মানুষের স্বভাব, স্মৃতিপূজায় তাই সার্থকতা। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ এই প্রদর্শনী সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলে অনেক জিনিস শিক্ষা করা যাইবে। পরের অনুকরণ না করিয়া ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলে আমাদের কল্যাণ।

আদর্শ শিক্ষক

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাষণে ডাঃ এস. ভাটনাগর বলিয়াছেন আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষকের—কেননা অধ্যাপকগণকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। অধ্যাপক যদি ছাত্র-ছাত্রীর মনে জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা জাগ্রত করিতে না পারেন তবে তাঁহার অধ্যাপনা ঠাণ্ডা লোহার উপর

কাদায়ের হাতুড়ি পেটানোর মতই নিষ্ফল। আরও অনেক মনীষী এই কথাটাই অন্য ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমস্যা আসলে শিক্ষাপ্রণালীর সমস্যা তত নয়—সমস্যা উপযুক্ত ও আদর্শ শিক্ষকের এবং পরিচালনার।

এ বিষয়ে আমরা শিক্ষা পত্রিকায় নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে—সমাজ যদি চায় ছেলেমেয়েরা আদর্শ শিক্ষকের নিকট বিদ্যালাভ করুক, তবে সমাজকেই শিক্ষকের আর্থিক মর্যাদা সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আদর্শ কল্যাণের সম্পর্ক কখনই গড়িয়া উঠিবে না। ডাঃ অমর নাথ রা এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বুভুক্ষু শিক্ষক সমাজের ভীতির কারণ। কথাটা অনুধাবনের উপযুক্ত। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ বিদ্যা দান করিতেন, রাজা তাঁহার বৃত্তির ব্যবস্থা করিতেন—একে অন্যকে অবলম্বন করিয়া সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ বিধান করিতেন। আজ রাষ্ট্র যদি সেই ভার গ্রহণ করে তবেই কল্যাণ, নতুবা শুধু সমাজের একটি অংশের উপর চাপ দিলে কি হইবে?

শিক্ষকের বৃত্তি আর্থিক মর্যাদায় অন্য বৃত্তির সমান করে হইবে জানি না। তবে সমাজের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। শিক্ষক ও অধ্যাপককে ছাত্র সংগ্রহের যন্ত্রমাত্র মনে করিয়া সেই ভাবে দেখিলে শিক্ষক ছাত্র কাহারও মঙ্গল নাই। শিক্ষকের জীবনে শ্রেষ্ঠ লাভ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে হৃদয়ের যোগ। সুকুমার চিত্তগুলির বিকাশের পথে তাহাদের সঙ্গে পথ চলা, কল্যাণের দিকে তাহাদিগকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া, তাহাদের ভিতরকার গুপ্ত শক্তিগুলির উন্মেষ ও সার্থক বিকাশ প্রত্যক্ষ করার যে আনন্দ তাহাই শিক্ষকের জীবনের চরম পুরস্কার। অন্য কিছুর প্রত্যাশা শিক্ষক করেন না। এই নিঃস্বার্থ বৃত্তির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতম ছাত্র-ছাত্রী যেন আকৃষ্ট হয় তাহা দেখা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। আদর্শ শিক্ষকসৃষ্টি একতরফা হওয়া সম্ভব কি?

পরলোকে আচার্য হেমচন্দ্র শাস্ত্রী

নবদ্বীপের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য হেমচন্দ্র শাস্ত্রী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। বহুদিন সরকারি কলেজে অধ্যাপনার পরে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজ-শিক্ষা-শিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। তিনি বহুদিন বঙ্গবাণী কলেজের উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে রাঢ়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া মোহাট বৃত্তি লাভ করেন। হিন্দু শাস্ত্রের ষড়্‌দর্শন ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। তিনি প্রথম জীবনে পাটনা সেমারেল পোষ্টাফিসে বড় চাকুরি লন, কিন্তু সংস্কৃত চর্চায় ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি ঐ কাজ ছাড়িয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। পরে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন ও কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে আমরা পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১) ভূমিকা

শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের যে কোনও পরিকল্পনা নিম্নলিখিত চারিটি মূল আধারের পূর্বপরাপেক্ষেই হইতে পারে :—

(১) আমরা আমাদের অতীতের সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া একটা নূতন শিক্ষা প্রণালী তাহার স্থানে গ্রহণ করিতে পারিনা। যে যে দেশে এইরূপে আমূল পরিবর্তন করিতে গিয়াছে, তাহাদের শিক্ষানীতিও সেইরূপে অসম্পূর্ণ আর অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছে। শুধু বুদ্ধির শতাব্দীর সংস্কার দেখিলেই চলিবে না। সুদূর অতীতের মধ্যে যে সংস্কারের ধারা বর্তমান তাহার খবরও আমাদের রাখিতে হইবে ও তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) দেশে সঙ্গে বর্তমান জগৎকেও উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। অতীত একদিক দিয়া আমাদের পরিবর্তনের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ইহা সত্য বটে, কিন্তু হয়তো প্রাচীন যুগের রীতি একেবারে ঠিক বর্তমানে প্রযোজ্য নহে। বর্তমান যুগোপযোগী পরিবর্তন আমাদের অবশ্যকর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

(৩) যে কোনও পরিবর্তন আমরা স্থির করিব তাহার অনুসরণ আমাদের দেশের অবস্থার কতদূর সম্ভব তাহাও বিচার করিতে হইবে। আমাদের দেশ মূলতঃ কৃষিপ্রধান থাকিবে। আমাদের শিল্প সম্ভার বৃদ্ধির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির পট্টভূমি ও ও তাহার কারণ আর্থিক দৈন্য ভুলিলেও চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক শিল্পসম্ভার বৃদ্ধির চেষ্টার কল মনে রাখিতে হইবে। আমাদের লোকসংখ্যার চাপ এত বেশি যে যান্ত্রিক শিল্পবিস্তারের ব্যাপক চেষ্টা দেশে বেকার সমস্যা আনিবে। আমাদের একটা প্রধান সমস্যা এমন একটা শিক্ষানীতির প্রচলন, যাহার যাদুতে আমাদের সামান্য অর্থকোষ বহুলে সমর্থ হয় ও যাহার ফলে আমাদের ছত্রিশ কোটি জনসাধারণের অজ্ঞানতা দূর হইয়া কতক অংশ কৃষিকার্যে, কতক অংশ লাভজনক কুটির শিল্পে ও সামান্য অংশ যান্ত্রিক শিল্পে নিয়োজিত থাকিতে পারে।

(৪) এই শিক্ষাপ্রণালী একমুখী না হইয়া বহুমুখী হইবে, প্রাথমিক বা উচ্চতর শিক্ষার সংস্কার এক সঙ্গে-ই সম্ভব। আলাহিদা রূপে এক একটির সমাধান সম্ভব নহে। অতীতে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চশিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়স্কের শিক্ষা, লাইব্রেরীর স্থাপনা সমস্তই একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল মূল কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের প্রথমে দেখিতে হইবে, দেশের সংস্কারের ধারা আমাদের শিক্ষানীতিকে কোন দিক হইতে প্রভাবিত করিতেছে। শুধু ১৯৩৭ সালের ব্যবধানই আমাদের অতীত নহে। হয়ত সুদূর প্রসারী অতীতকে উপেক্ষা করার জন্যই ইংরাজের যুগের শিক্ষা-নীতি এতটা কৃত্রিম হইয়াছে। সেইজন্য সর্বপ্রথমে আমাদের প্রাচীন যুগ হইতে যে সংস্কৃতি দেশের মধ্যে প্রবহমান তাহার পরে মুসলিম যুগে তাহার পরিবর্তন ও শেষে উপযুক্ত বিশ্লেষণের দ্বারা ব্রিটিশযুগের শিক্ষানীতির আলোচনা কর্তব্য।

(২) প্রাচীন ভারত

অনেকে মনে করেন বর্তমান ভারতের শতকরা ৭৯·২ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত, প্রাচীন

ভারতে যুগে যুগে সেইরূপই ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতের আশ্রমগুলি বর্তমান বেসরকারী বিদ্যালয়ের মত রাষ্ট্র বা জনসাধারণের সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে আপনাদের শিক্ষা-ধারা নিয়ন্ত্রিত করিত। বৈদিক যুগে এই আশ্রম-গুলির পরিচালনার বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইলেও, উপনিষদের যুগে আমরা দেখিতে পাই, এই সকল আশ্রম রাজা ও জনসাধারণের সাহায্যে পুষ্ট ছিল। আশ্রমগুলি বিভিন্ন চরণ ও চরণগুলি বিভিন্ন পরিষদের অধীন ছিল। এইরূপ পরিষদের নিদর্শন বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ প্রথম শ্লোকে আছে। এই সকল আশ্রম যে শুধু স্থানীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করিত না, পরন্তু সুদূরান্তর হইতে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র এখানে আসিত তাহার প্রমাণ আমরা প্রশ্নোপনিষৎ (১-১-১) হইতে পাই। বিভিন্ন আশ্রম যে বনের মধ্যে ছিলনা, পরন্তু জনপদের নিকটবর্তী ছিল, তাহার প্রমাণ রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে পাই, (৩-৫৫-১১ ও ১৮), ও সাংখ্য (৫-৫-৫ ও ৬) ইহা প্রতিপন্ন করে যে এই আশ্রমগুলি জন-সাধারণের সাহায্যে পুষ্ট ছিল। ছান্দোগ্যো পনিষৎ (৪-২-১ হইতে ৩) ইহা প্রতিপন্ন করে যে প্রাচীন ভারতে শিক্ষা শুধু নিঃশুল্ক ছিল না, পরন্তু শিক্ষার পরিবর্তে কিছু প্রতিদান গ্রহণের উল্লেখও সদ্‌গুরুর অবদানোদ্দেশ্যে করণ হইত।

এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনায় রাজকীয় দায়িত্বও যে কম ছিল না তাহার প্রমাণ ছান্দোগ্যো পনিষৎ (৫-১১-৫) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব (৩৭) ও রঘুবংশের (১-২৪, ৫-২০ ও ১৪-২৩) নানা স্থান হইতে পাই। শুধু শিক্ষাব্যয় নহে, পরন্তু ছাত্রের আহারব্যয়ও আশ্রম বহন করিত। এই সকল প্রমাণ হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, আশ্রমগুলি জনসাধারণের সাহায্যপুষ্ট, নিঃশুল্ক ও পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। যদিও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহা হইলেও এগুলি স্বেচ্ছাচোলিত ছিল না। সেকালের রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র হওয়ায় ও পরিষৎগুলি সুপরিচালনায় সমর্থ হওয়ায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের কথা ওঠে নাই। তথাপি যদু, অন্ধপতি বা রামচন্দ্রের ন্যায় প্রতাপশালী রাজাদের সময় ইহাদের নিয়ন্ত্রণের ভার যে অনেকাংশে রাজার উপর ন্যস্ত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ যুগে শিক্ষা আরও কেন্দ্রীভূত হয়। তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখ রামায়ণের যুগ হইতে পাইলেও বৌদ্ধ যুগের প্রথম ভাগেই ইহা উন্নতির শিখরে উঠে। জাতক হইতে দেখা যায় অন্য স্থানের মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তবে ছাত্রেরা এখানে পড়িতে আসিত, ছাত্রদের আহার ও বাসের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য সহস্র নিষ্ক শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলেও দরিদ্র ছাত্র যাহাতে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা এই মূল্য পরিশোধ করিতে পারে সেরূপ উপায়ও ছিল। পরবর্তীকালে নালন্দ বা বিক্রমশীলা, বল্লভী বা তাম্রলিপ্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনের বিষয়ে আমরা অনেক তথ্য পাই। এই সকল বিদ্যালয় রাজকীয় সাহায্যে পুষ্ট ছিল ও নিকর ভূমির উপস্বত্ব হইতে ইহাদের পরিচালনা হইত। শিক্ষক ও ছাত্রের আহার, বাস ও ঔষধের ব্যয়ও ইহা হইতে নির্বাহ হইত। বৌদ্ধ ও হিন্দু, সকল বিদ্যার্থীর পড়িবার সুযোগ ছিল ও স্থাপত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন, বিষ বিজ্ঞান প্রভৃতির পাঠনা ইহাতে হইত। এই বিদ্যালয়গুলি আবার একই সূত্রে গ্রথিত ছিল ও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অধ্যাপকের বদল হইতে পারিত এইরূপ প্রমাণও আছে। উৎসাহী পাঠক যদি জাতকের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ পুস্তক, বর্ধমান (১২৬, ১৩১, ১৭৪) কুলচন্দ (৫-১৪-১) মহাবংশ (৫-১০-৪ ও ৮-৩২-৭-১ ৩৫) মহাবংশ (৫-২৭০ হইতে ২৮০) Giles অনূদিত কাহিনী,

Samuel Beal অনূদিত হুয়েনসাং বা ইট্‌ সিং এর ভ্রমণ কাহিনী দেখেন তবে উপরোক্ত যুক্তির সমর্থন দেখিতে পাইবেন। তাঁহার বৌদ্ধ (Spirit of Buddhism) তাঁহার বি, বি দোখলে (Buddhe and Asoke) এবং Nalanda University রচয়িতা ডাঃ সংকলীয়াও তাঁহাদের গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্র (২-১২-৩১ হইতে ৫০, ২-২৩-৪১-১ ও ২১-৪০-২১-১ এবং নারদ (৫-১৬ ও ১৭) হইতে আমরা দেখিতে পাই যে শিল্প শিক্ষার আয়তন গুলিও এইরূপে আবাসিক ও কেন্দ্রীভূত ছিল। শ্রীযুক্ত শাম শাস্ত্রী ইহাও দেখাইয়াছিলেন যে এই সকল কেন্দ্রই বর্তমানে পকায়েতে রূপান্তরিত।

কি হিন্দু কি বৌদ্ধ যুগে শিক্ষা আবাসিক, নিঃশুল্ক (এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহারের ব্যবস্থাও ছিল ও তাহারা জনসাধারণ ও রাজার আনুকূল্যে পরিচালিত হইত ও একই সূত্রে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ভাবে তাহাদের পরিচালনা হইত, তাহা আমরা এই সকল প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন করিতে পারি। এমন কি স্ত্রী শিক্ষাতেও যে আবাসিক নীতির প্রচলন ছিল তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক হইতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

সিরিয়া ও হল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

আগে সিরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিতেছি। নিউইয়র্ক সহরে ইন্টারন্যাশনাল হাউসে থাকা কালীন ঐ দেশের এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হইয়াছিল। তিনি বেইরুট সহরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক; পলিটিক্সে এম. এ। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়িতে আসিয়া লাইব্রেরি বিজ্ঞানে এম. এস্. সি ডিগ্রী পাইয়াছেন।

সিরিয়ার রাজধানী দামস্কাস, ভাষা আরবি, লোকসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ; আয়তন একষট্টি হাজার বর্গ মাইল, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আড়াইগুণের কিছু কম, কিন্তু লোকসংখ্যার সাতভাগের এক ভাগ। প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ বাসিন্দা মুসলমান। খ্রীষ্টানদের এক সম্প্রদায়ের নাম Syrian Church; খ্রীষ্টান বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ফুতপূর্ব প্রিন্সটন অধ্যাপক টয়ন্‌বী এই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান। রপ্তানি হয়, চামড়া, কল, তুলা ইত্যাদি কৃষিপ্রধান।

সিরিয়ার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। খ্রীষ্টপূর্ব উনবিংশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশ হিটাইট ও মিশর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী সহরগুলিতে ফিনিসিয় সভ্যতার পত্তন হয়। উত্তর আফ্রিকার বর্তমান টিউনিসিয়ার কার্থেজ সহরে এই ফিনিসিয়গণ গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। দেশটির উপর দিয়া নানা ঝড় ঝাপটা গিয়াছে। আসিরিয়া, ব্যাবিলন ও মিশর সাম্রাজ্য সব সময়ই এই দেশটির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য লালায়িত ছিল। ইহার

পর পাশ্চাত্যের আধিপত্যের সূত্রপাত হইল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে আলেকজান্ডার ও তাঁহার সেনাপতি সেলুকাসের আবির্ভাব। ইহার পর রোমক যোদ্ধাদের দলের পর দল। প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বিশুদ্ধ সেন্টদের দামস্কাস যাইবার পথেই দীক্ষিত হন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর অধিকাংশ বাসিন্দাই মুসলমান হইল। কয়েক শতাব্দীর পর সেলজুক শাখার তুর্কীগণ সেলটি দখল করিল। ক্রুসেডে বিখ্যাত তুর্কী বীর সালাদীন সেলটিতে মুসলমান আধিপত্য দৃঢ় করিলেন। সারাসিনের, আরবদের মত খ্রীষ্টানগণ অশেষ বীরত্ব, লোকবল, অর্থব্যয় ও স্বেচ্ছাধীন মনোবৃত্তি দেখাইলেও পরাক্রমশালী সালাদীনের (তুর্কীনাম: সালাহউদ্দীন) বিক্রমে তাঁহারা হটিয়া গেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ ইহুদি সিয়াছিল। স্বাধীনতা পাইবার আশায় সিরিয়ার মুসলমান অধিবাসী তুর্কীর বিরুদ্ধে, ফিলিস্তাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে ফ্রান্সের হাতে সেলটি ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৬ সালে সিরিয়া স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল।

শিক্ষা সকল স্তরেই অবৈতনিক, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য বেতন লাগে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচটি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাতটি শ্রেণী। বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন উপাধি পাইতে হইলে চার বছর পড়িতে হয়। ইহার পর ইন্টারমেডিয়েট—দুই বছরের কম হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাঁহারা পড়াইবেন, তাঁহাদিগকে অন্তত দুই বছর পড়িতে হয়। যে ডিপ্লোমা পাওয়া যায় তাহাকে Shahadat Ta'lim al Ibtida 'yyah (Diploma of training for edcation in elementary schools) বলে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াইতে হইলে চার বছরের ট্রেনিং লইতে হয়, সেই ডিপ্লোমাকে বলে Shahadat Talim al Aliyah.

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবি, পাটিগণিত, জ্যোগ্রাফি, আরব ইতিহাস, প্রাথমিক বিজ্ঞান ও গৌরবশাস্ত্র পড়ান হইয়া থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরবি, ফরাসী অথবা ইংরাজি ভাষা, পাটিগণিত, জ্যোগ্রাফি, বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান (জীববিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা) পড়ান হয়। শেষের দুই শ্রেণীতে ঐ একই বিষয়গুলি থাকে কিন্তু তর্কশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব ও ঐসলামিক ধর্মশাস্ত্র পড়িতে হয়। এইগুলি কলা এবং বিজ্ঞানের সকল ছাত্রই পড়িয়া থাকে, তবে কলা ছাত্রদের বেশি করিয়া পড়িতে হয়। উচ্চ জীববিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও উচ্চ অঙ্ক (ক্যালকুলাস, ত্রিকোণমিতি, ও cosmography) সকল ছাত্রকেই পড়িতে হয়, তবে বিজ্ঞানের ছাত্রকে বেশি করিয়া পড়িতে হয়।

ম্যাট্রিকুলেশন উপাধি যে বিষয়ে পাইতে হইবে সেই বিষয় আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মত প্রথম বছর হইতেই বেশি করিয়া পড়িতে হয়। ডাক্তারি যাহারা পড়িবে তাহারা এক বছর পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও জীববিদ্যা পড়িয়া পাঁচ বছর ডাক্তারি পড়ে। আমাদের দেশের মত প্রতি পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হয়, গ্রেড দেওয়া হয় না।

দেশে একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়—দামস্কাস নগরে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষাই আরবির মারফত দেওয়া হয়। অক্টোবর হইতে জুন পর্যন্ত বছর চলে, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর বন্ধ থাকে। বসন্ত কালে বারো দিন মাত্র ছুটি থাকে, অন্যান্য ছুটি খুব কম। বৃহস্পতিবারে অর্ধেক ও শুক্রবার পূরা দিন বন্ধ থাকে। আমাদের দেশের মত শেষ পরীক্ষা ফেল হয় না, গভর্মেন্ট লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম পাঁচ শ্রেণীর পর প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম তিন শ্রেণীর পর মধ্যবর্তী মাধ্যমিক পরীক্ষা ও শেষ তিন শ্রেণীর পর শেষ মাধ্যমিক পরীক্ষা লওয়া হয়

যদিও বেলজিয়ামে শতকরা হিসাবে পাকিস্থানের চাইতে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, তবুও স্কুলে ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া হয় না। ভদ্রলোকের ঠিকানা :

Mr. Labbeb Zowiyya

Lecturer, American Universily of Beirut

Beirut, Lebanon.

এইবার আলোচনা করিতেছি হল্যাণ্ড দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা। হল্যাণ্ডের লোককে ডাচ বলে। ভাষার নামও ডাচ। ডাচেরা নিজের দেশকে নেডারল্যাণ্ড (পাতালপুরী) বলে। ইন্টারন্যাশনাল হাউসে থাকা কালীন এক ডাচ ভদ্রলোকের সাথে দেখা হইয়াছিল। Bachelor ডিগ্রীর জন্য Institute of International Education-এ ভারতেও আসিয়াছিলেন। এক বছর পড়িয়া দেশে ফিরিতেছেন। ডিগ্রী পান নাই ; দেশে গিয়া সম্পূর্ণ করিবেন। এই এক বৎসরের পড়ার ফল তাহাতে সাহায্য করিবে, অর্থাৎ কিছু কম পড়িতে হইবে। তিনি ইন্টারন্যাশনাল হাউসের ভাণ্ডারে আমার মতই কাজ করিয়া তিন বেলা খাদ্য সংগ্রহ করিতেন। সেজন্য মাত্র দুই ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। নিজেদের হাঁতে তাওয়া ছিল বলিয়া সব চাইতে ভাল খাদ্য আমাদের পেটে যাইত। ডাচ ছাত্রটির নিকট হইতে তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা লিখিয়া লইয়াছিলাম।

হল্যাণ্ডের আয়তন প্রায় তের হাজার বর্গ মাইল ; লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটি। বসতি খুবই ঘন। আয়তন আমাদের খুলনা জেলার দেড়গুণ। লোকগুলি বড়ই পরিশ্রমী। উপকূলে বাঁধ দিয়া সমুদ্রের জল সেচিয়া চাষ করিবার জমি তৈয়ারি করে। আমেরিকা ও ভারতবর্ষ আবিষ্কারের পর ইংরাজদের মতই ডাচেরা যথেষ্ট বাণিজ্য করিত। ক্রমওয়েলের শাসনসময়ে ইংলণ্ডে ডাচদের সামুদ্রিক বাণিজ্য পণ্ড করিবার জন্য এক আইন পাশ হইল যে, আমেরিকা হতে যে জাহাজে আসিবে সেই জাহাজ হয় ইংলণ্ডের হইবে, না হয়, যে দেশের মাল সেই দেশের হইবে। দুইটি দেশই তখন নূতন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী, দুইবেই ক্যাথলিক স্পেনসরকারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, অথচ বাণিজ্যের ব্যাপারে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিল না, স্বার্থ এমনই জিনিস! কালক্রমে ইংরাজদের মত তাহাদেরও সাম্রাজ্য হইল। ইণ্ডোনেশিয়া হাত ছাড়া হইবার পর ওলন্দাজী আর বিশেষ নাই। মধ্যযুগ হইতে দেশে উট ও মিল চালু ছিল। বিদ্যুৎ ও বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের অনেক আগেই ইহার সাহায্যে জল সেচন করা হইত। এদেশে যাহাকে বলে Heavy Industry তাহা জার্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্সের তুলনায় একেবারেই কম, তবে লোকগুলি অলস নয়। বাঁধ দিয়া সমুদ্র সেচিয়া যাহারা চাষবাসের জমি তৈয়ারি করিতে পারে তাহারা অলসের বংশ নয়। খনিজসম্পদের মধ্যেও তাহারা যথেষ্ট কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন করে। পোষাক জাতি হইয়াও তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ যোগানি করে। আমরা ভারতীয়েরা পোষাকের সেবা করিলেও দেশে দুধ আমদানি করিতে হয়। সাগরের জলকে বিতাড়িত করিয়া ভূমিগর্ভ যখন করিবার জন্য ডাচগণ বড়ই গর্বিত। Zuider Zee এই প্রকার বল পূর্বক দখলীকৃত একটা অংশ। তাহারা বলিয়া বেড়ায়, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর তাহারা Zuider Zee সৃষ্টি করিয়াছে।

দুই হাজার বছর আগে রোমকদের সময় বাটাভি নামে এক জাতি রাইন নদীর মোহানায় বাস করিত। পরে এক সময়ে বর্তমান হল্যাণ্ডকে বাটাভি বলা হইত। ওলন্দাজদের প্রধান সহরের নামকরণ করা হইয়াছিল বাটাভিয়া। বাস্তবী লেবু ওলন্দাজদের ফল। আমাদের দেশে বাটাভিয়া সহরের নাম অনুসারে লেবুর নাম হইল বাস্তাবী।

পঞ্চম হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে তিন জার্মানীতে ফ্রাঙ্ক জাতি আধিপত্য করে। পরে বর্তমান ফ্রান্সের অধিকাংশ উত্তরপূর্ব অঞ্চল, এবং মধ্য ইউরোপের অনেক অংশ তাহাদের দখলে যায়। হোলি রোমান এম্পায়ার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বর্তমান হল্যাণ্ড তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। মধ্য যুগের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য সমিতি Hanseatic League-এর সাথে হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ শহরগুলি সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সময় হইতে হল্যাণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। পরে হাপ্সবার্গ সম্রাটগণ স্পেনের মালিক হন। স্পেনের হাপ্সবার্গ সম্রাট, ইংলণ্ড বিদ্বেষের উদ্দেশ্যে আর্মাডা প্রেরণকারী বিখ্যাত ফিলিপ ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অবিরাম অত্যাচার করিলেন; কিছুই হইল না, স্বাধীনতাকামী ডাচ জাতি অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া গেল। অবশেষে ১৬৪৮ সালের ওয়েষ্টফেলিয়ার সন্ধিতে বর্তমান হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ইউরোপের দুইটি ক্ষুদ্র দেশ ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড গোটা ক্যাথলিক ইউরোপের সংঘবদ্ধ প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া নিজেদের দেশে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম চালু রাখিল। ক্যাথলিক দেশের কুশলী শিল্পী ও শ্রমজীবি এই দুই দেশে আশ্রয় গ্রহণ করাতে শিল্প বাণিজ্যে এই দুই দেশের উন্নতি ঘটিল। স্পেন তখন গোটা পশ্চিম গোলার্ধের মালিক ছিল, সেখান হইতে সোনা লুটিয়া আনিত। কিন্তু সে দেশে শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিল না। ফলে সোনা যখন আর আসিতে পারিল না, তখন দেশের ঐশ্বর্যও থাকিল না। ব্যবসা বাণিজ্য না খাটাইয়া সোনা যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তবে তাহা যেমন কোনও কাজে আসে না তেমনি দেশে শুধু সোনা আমদানি করিলে সে ঐশ্বর্য স্থায়ী হয় না। যাহা হউক, বাণিজ্য করিয়া দেশটির যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল। হল্যাণ্ডের তৃতীয় উইলিয়ম (তাঁহার নাম অনুসারে কলিকাতার কেল্লার নাম ফোর্ট উইলিয়ম) তাঁহার শ্বশুর দ্বিতীয় চেম্‌সকে ১৬৮৮ সালের রক্তপাতহীন সেই Glorious Revolution এ সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্ত্রী মেরীর সাথে ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। চতুর্দশ লুইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া তৃতীয় উইলিয়ম ইউরোপের রাজনীতিতে ভারসাম্য (Balance of power) রাখিলেন। নেপোলিয়নের সময় হল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা হারাইল। কংগ্রেস অব ভিয়েনার ঠিক হইল যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত যে বেলজিয়াম অষ্ট্রিয়ার দখলে ছিল সেই বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড এক রাজার শাসনে থাকিবে। কিছু দিন পরে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম পৃথক হইল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নিরপেক্ষ থাকিতে পারিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর কুক্ষিগত হইল। ইণ্ডোনেশিয়া এখন তাহারা হারাইয়াছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর বাণিজ্যে তাহাদের যথেষ্ট হাত আছে। হীরা কাটার ব্যবসায়ে আমষ্টারডামের জুড়ি নাই। আমেরিকা, ইংলণ্ড, নরওয়ের পর বাণিজ্য জাহাজে হল্যাণ্ডের স্থান।

অন্যান্য দেশের ন্যায় হল্যাণ্ডেও বিদ্যালয় তিন স্তরে বিভক্ত; প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময় একটা পরীক্ষা লওয়া হয়। ছয় বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হইবার নিয়ম। দুইটি শ্রেণী আছে। পরীক্ষকের কোন বেতন লাগে না। ৬+বছর বয়স হইতে ১৪+বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চার শ্রেণীর শিক্ষা আছে meer uitgbreid lager onderwijs, ১২+ হইতে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত। ডাচ, ইংরাজী, জার্মান ও ফরাসী এই চার ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, ও অন্য হিসাবশাস্ত্র পড়ান হয়। Javigo অর্থ শ্রেণী। Hogere Burger স্কুলে ১২+ হইতে ১৮ বৎসর পর্যন্ত যাহা পড়ান হয়, এই স্কুলে তাহাই কিছু বেশি পরিমাণে পড়ান হয়—কোর্সও এক বছর বেশি। Hogere

Burger স্কুল আর এক প্রকার আছে; তাহাতে পাঁচটা শ্রেণী ১২—১৭ বছর পর্যন্ত পড়িতে হয়। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত; "A" ভাগে ডাচ, জার্মান, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, ইকনমিকস্, হিসাবপত্র পড়িতে হয়। "B" ভাগে ঐ চারিটি ভাষা ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক পড়ান হয়। Gymnasium শ্রেণীর স্কুলে ছয়টা শ্রেণী আছে। তাহাতে ঐ চারিটি ভাষা ছাড়াও লাতিন ও গ্রীক, অঙ্ক, জীব-বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, ভূগোল ও ইতিহাস পড়ান হয়। Gymnasium-ও দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমটায় ভাষার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, দ্বিতীয়টায় বিজ্ঞান বিষয়ের উপর বেশি দেওয়া হয়। হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড দেশে যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চারটি ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকে তবে আমরা কেন তাহা করিব না?

স্কুলের বৎসর সেপ্টেম্বর হইতে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। বছরে তিনটা পরীক্ষা। "A" "B" ইত্যাদি গ্রেড না দিয়া ১ হইতে ১০ পর্যন্ত গ্রেড দেওয়া হয়। ৬ পাইলে পাশ করা যায়, তাহার কম হইলে ফেল। সকাল ৮।৩০ হইতে ১২ টা এবং ২ টা হইতে ৪।৩০ পর্যন্ত স্কুল বসে। যদি কোন ছাত্র স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ফেল করে তবে সে প্রমোশান পায় না। স্কুলের শেষ পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে প্রশ্নপত্র পাঠান হয়। প্রতি স্কুলে গভর্ণমেণ্ট মনোনীত পাঁচ জন সুপারভাইজারের সাহায্যে স্কুলের শিক্ষকগণ উত্তরের খাতা দেখিয়া থাকেন। যাহারা পাশ মার্ক পাইবে না, তাহারা পরের বার আবার পরীক্ষা দিবে। সচরাচর স্কুলের শিক্ষকগণ আমাদের দেশের মত প্রাইভেট টুইশনি করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট শিক্ষকগণের বেতন দেন। স্কুলে তিনটি ছুটি আছে, —বড় দিন (১৪ দিন), ইষ্টার (১০ দিন) ও গ্রীষ্ম (৭ সপ্তাহ)। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী যদি গরীব হয় তবে বিনামূল্যে বই পায় এবং বিনা বেতনে পড়িতে পায়। তবে আমেরিকা যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ডের মত দুপুরে অল্পমূল্যে খাবারের কোন ব্যবস্থা নাই। জুলাই ও আগষ্ট মাসে গরমের ছুটি।

দেশে দশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি Faculty আছে; ধর্ম, আইন, চিকিৎসা, সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান এবং রাজনীতি। কোন বিষয়ে আড়াই বছর, কোন বিষয়ে চার বছর পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া CANDIDAT ডিগ্রী পাওয়া যায়। ডক্টরেট ডিগ্রী পাইতে আরও বেশি সময় লাগে। শিক্ষক শিক্ষণের জন্য তিনটি কলেজ আছে, তাহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত নয়। সেখানে পাঁচ বছর পড়িতে হয়।

জার্মান ভাষার সাথে ডাচ ভাষার নৈকট্য আছে। গত যুদ্ধের সময় যেবার জার্মানদের দখলে ছিল তখন নাৎসী নেতারা বড় গলা করিয়া ঘোষণা করিতেন যে জার্মান ডাচ জাতি ভাই ভাই, তাহাদের ভাষা মূলত একই। কিন্তু অত্যাচার করিতে কসুর করে নাই। সুতরাং তবি ভুলিবার নয়। সুবিধা পাইবা মাত্র তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।

শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি কথা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শাস্ত্রে অপ্রিয় সত্য বলতে নিষেধ আছে বটে, কিন্তু এমন এক সময় আসে, যখন অপ্রিয় সত্য না বললে প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হয়। বিশেষত যখন জাতির স্বার্থের ক্ষতি হতে থাকে, অথচ 'জনপ্রিয়তা' হারাবার ভয়ে নেতারাও কঠোর সত্য উচ্চারণ করতে সাহস করেন না। আজ শিক্ষার ক্ষেত্র, বিশেষত বাঙালা দেশের ক্ষেত্র যেমন সেই রকমই মনে হচ্ছে।

আমি শিক্ষাবিদ্ নই, শিক্ষণ-দায়ের তত্ত্ব আমার জানা নেই, কাজেই কমিটি কমিশনের মত গুছিয়ে ভাল ভাল কথা লেখবার বৃথা চেষ্টাও আমার নেই। কিন্তু আমি এই কথা জোর গলাই বলি যে, দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিক এবং অভিভাবক আমারই মত অ-বিশেষজ্ঞ এবং আমি অন্তত সেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে, যারা নিজেরা একখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী মাড়াবারও এমন কৈশোরিক সময়টায় সেই পরীক্ষার আগে মোট দুখণ্ড করা বিস্তে খুলতে বসেছে এবং যারা ছেলে মেয়েদের ইস্কুল কলেজে পাঠায়, এই আশায় যে, সেখানে ছেলেমেয়েরা কিছুও কিছু শিখবে, ভবিষ্যৎ জীবিকার পথও খুঁজে পাবে, আর মোটামুটি তাদের জীবন, আদর্শ সংস্কৃতিতেও একটা পালিশ পড়বে। সুতরাং আজকাল খবরের কাগজের শিরোনামা হতে সাধারণত মনে হয় শিক্ষার ক্ষেত্রটা বুঝি শিক্ষকদের ও সরকারের দল ও তার উপর কমিটি-বিশেষজ্ঞদের প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটা বস্তুত তা নয়। তার বাইরেও ছাত্রসমাজ আছে, অভিভাবক সমাজ আছে, দশের উপর দেশ আছে, জাতি আছে, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বড় অংশীদার, হয়তো প্রধানতম অংশীদার। শেষ পর্যন্ত শিক্ষাই বলুন, শিক্ষকই বলুন, তাদের সামূহিক দাবাই খাটে জাতি-গঠনের কষ্টিপাথরেই।

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই হতাশ হতে হয়। ঐ কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়ছে না, এমন কি ব্যাবাট পোল্ডেরও নয়। এক এক সময় সন্দেহ হয়, পিতলেরও কস উঠছে না কি; ইস্কুলে কলেজে নিয়তম শিক্ষার প্রতিযোগিতা চলেছে। ছাত্রের উৎকর্ষ বাড়াবার চেয়ে ছাত্র সংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর। কোনও কলেজে শিকটে শিকটে যদি পাঁচ হাজার ছাত্র পড়ে, তাহলে সেখানে পড়াশোনার সত্যসত্যই কি কোনও আশা থাকে? শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকি একটি নিয়ম আছে যে, কোনও কলেজেই দেড় হাজারের বেশি ছাত্র থাকতে পারবে না (হয়তো এ নিয়ম এতদিনে উঠে গিয়েছে), কিন্তু ঐ সব বিরাট কলেজের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এ নিয়ম প্রয়োগ করতে সাহস করেন না, কেন না এ সব কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপকেরাই বেশির ভাগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য। ক্লাসে অধোগতি ছাত্র। প্রোফেসারেরা কি করে বিনা মাইক্রো-ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ঐ রকম অনলভাবে চেঁচিয়ে যান তাবলে তাঁদের কণ্ঠশক্তির তারিফ করতে হয় এবং তাঁদের ধৈর্যে বিস্মিত হতে হয়। বহু ছাত্রকে অবসরের ঘণ্টায় স্বাস্থ্যভাবে কলেজের বাইরে রাস্তায় পাইচারি করতে হয়, তবু শিক্ষাবিস্তারের অজুহাতে ঐ বিপুল সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতেই হবে? এতে কি

সত্যই শিক্ষাবিস্তার হচ্ছে? ছেলেরা জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে? এমন কি যে সব বিষয় পড়ছে, অন্তত সেগুলিতেও কি সত্যি সত্যি পণ্ডিত হচ্ছে? যদি তা না হয়, তা হলে শিক্ষাবিস্তারের অনুষ্ঠান দেওয়া কেন? আর, কলেজগুলিরই অবস্থা এই, ইস্কুলগুলির প্রসঙ্গ নাই তুললাম। সেখানে উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সামান্য, পঠন প্রণালী অনাধুনিক, লাইব্রেরী নিরর্থক মাত্র, আর শতকরা ত্রিশ নম্বর পেলেই খুব সম্মানে পাশ ও প্রমোশন। তার উপরে আছে গৃহশিক্ষক নামে একটি ব্যাপার। আজকাল কোনও ছাত্রই ইস্কুলের পড়ানোর উপর নির্ভর করে না বা করতে পারে না। ঘরে ঘরে গৃহশিক্ষক। প্রায়ই তারা সেই ইস্কুলেরই শিক্ষক। এই নিয়ে পরীক্ষার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও সময় সময় ওঠে। কিন্তু সে অভিযোগ সত্য হোক আর নাই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনই বা হবে কেন? আর গৃহশিক্ষকতা করতে করতে শ্রান্ত, ক্লান্ত শিক্ষকেরা ইস্কুলে গিয়ে পড়াবেনই বা কেমন করে? তাঁরা তো যন্ত্র নন, তাঁরা তো মানুষ। আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বালকের বাড়ীতে শিক্ষক ও ইস্কুলে শিক্ষক তার পাঠ্যকে বটিকা আকারে গিলিয়ে পরীক্ষায় ত্রিশ পার্সেন্ট রূপ মোকলাভের আশায় তাকে গরু তাড়াচ্ছেন, তার সত্যি সত্যিই গরুতে পরিণত হওয়া ছাড়া কি হতে পারে? তার মন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে কি করে? জ্ঞান-বিজ্ঞানেও বিভিন্ন পথে নিজের পায়ে চলবার মত ক্ষমতা হবে কি করে? তার পড়ুয়া মুচবে কি করে? তার বদলে ছাত্রেরা যে মাইনে গৃহশিক্ষকদের দেয় সেই মাইনে ইস্কুলের হাতে তুলে দিক, আর ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ সেই টাকা শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে শিক্ষকদের বলুন, ইস্কুলের অঙ্গ হিসেবে ইস্কুলেই বাড়তি টিউটোরিয়াল ক্লাস করতে হবে—এ রকম ব্যবস্থা হয় না কেন? তাহলে আবহাওয়াটা পরিষ্কার হয়, শিক্ষারও বোধ হয় উন্নতি হয়।

তার উপর সম্প্রতি আরও নতুন বিপদ দেখা যাচ্ছে। অনেক আগে ইস্কুলগুলি ছিল সেক্রেটারী-বাবুর প্রবল প্রতাপের ক্ষেত্র। পরে কালক্রমে সে যুগ কেটে গেল, তখন শুরু হল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে মন-কষাকষি ও মুখ-কষাকষি চলে। সম্প্রতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক মারা-মারির চলে। এমনিতেই আজকাল যে বিষয়েই রাজনীতির হাওয়া চলেছে। আমাদের জীবনে রাজনীতিই যেন প্রধানতম বস্তু হয়ে উঠেছে—যদিও আমরা সত্যি কথা বলতে প্রকৃত রাজনীতি না করে রাজনীতির ফেনিল আবর্তে নাচানাচি করাটাকেই সারবস্তু বলে প্রাণপণে গ্রহণ করেছি। সামান্যতম উপলক্ষ হলেই শোভাযাত্রা ইনকিলাব তো আছেই। ধোপাও দুচারটি ক্ষেত্রে চলতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সে কথাও বলছি না। সাধারণ নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার ছাড়াও শিক্ষকদের শিক্ষক হিসেবেই বিশেষ ভোটাধিকার হয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্বাচনে নয়—সেখানে তো শিক্ষকদের ভোটেই সব হওয়া উচিত—তাঁদের বিশেষ ভোট কাউন্সিলের নির্বাচনে। সুতরাং সে ভোটাধিকার থাকলে শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়বার অধিকারও দিতে হবে, ইস্কুলে ইস্কুলে শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে কংগ্রেস কমিউনিষ্ট ও আরও পাঁচটা দল থাকবে ও স্বাভাবিকভাবে মারামারি করবে, একদল একদিন শোভাযাত্রা বার করলে আর একদল তার পরদিন পালটা শোভাযাত্রায় ছেলেদের টানলে আপত্তি করবার কোনও যুক্তিই থাকবে না। তাতে আর যাই হোক্, লেখাপড়া হওয়া সম্ভব কি? যদি কোনও অভিভাবক প্রশ্ন করেন, সাধারণ নাগরিক হিসেবে ছাড়া অভিভাবক হিসেবে ওঁদেরও ঐরকম বিশেষ ভোট থাকবে না কেন,

তাহলে তার জবাব কি? তাঁরাও তো শিক্ষা সম্বন্ধে কম আগ্রহশীল নন। সাধারণ ছাত্র-সমাজেরই বা থাকবে না কেন? শিক্ষার সমস্যা তো বস্তুত তাদেরই সবচেয়ে জীবন মরণ সমস্যা।

কিন্তু রাজনীতির ধাক্কা এইখানেই থামে নি। ম্যানেজিং কমিটিতেও ভোট হয়েছে, সেখানেও এই ব্যাপার। আরও আছে। আজকাল অনেক ইস্কুল রাতারাতি গড়িয়ে ওঠে, দিংশয়ন্ত সরকারের ডিজিক ডিপার্টমেন্টের টাকা পাওয়া গেলে। যথা যাক্, সে ইস্কুলের কিছু লোক ও ছেলেরা একজন রাজনৈতিক কর্মীর অ্যাসেম্ব্লি ইলেকশনে খুব খেটেছে। রাজনৈতিক কর্মীটি তখন ইস্কুলটিকে তাঁর পকেটে আশ্রয় দিলেন। পর পর ইস্কুলে যন্ত্র খুশি অনাচার চলতে লাগল, কিন্তু সাত খুন মাপ। শেষে সন্দেহক্রমে একদিন শিক্ষা বিভাগের বড় কর্তারা হঠাৎ দুপুরবেলা ইস্কুল দেখতে গিয়ে দেখলেন, না আছে ইস্কুল না আছে এমন কি চোর বেকি। ইস্কুলের অনুমোদন কেটে দেওয়ার কথা হল। রাজনৈতিক কর্মীটি চটলেন, তাঁর দাদাদের কাছে গিয়ে হুড়ি খেয়ে পড়লেন। তাঁরা সরাসরি কিছু না বললেও আমাদের ইঙ্গিতে হয়তো একটু ইশারা করে দিলেন। ফলে শিক্ষা বিভাগের হাত বন্ধ হল, ইস্কুল নেই অথচ তা কাগজে কলমে সগৌরবে করে চলতে লাগল। আশেপাশের ইস্কুলেরা অবাক্ বিস্ময়ে দেখতে লাগল, ভাবতে লাগল এরকম করেও তাহলে ইস্কুল চালানো যায়। এই আবহাওয়ায় শিক্ষাবিস্তার হবে কেন? আর, আমরা যারা ইস্কুল কলেজ চালাই তারা কোনও-রকম সুযুক্তিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস ব্যবস্থার চেষ্টা হলেও শিক্ষাসংকোচ হবে বলে মেশমর চিৎকার তুলি, কিন্তু ভেবে দেখি না যে আমরা সত্যই শিক্ষাবিস্তার করছি কি না। আমাদের দেশে, বিশেষত প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে, wastage একটা খুব বড় সমস্যা বলে অনেকদিনই পরিগণিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ নীচের ক্লাসে যত ছাত্র ভরতি হয় উপরের ক্লাসে উঠবার আগে তার অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। ফলে তাদের অনেকেই আবার নিরক্ষর পর্যায়ে পড়ে এ কথা সরকারী রিপোর্টেও বহুদিন থেকে উল্লিখিত হয়ে আসছে। এর কোনও সমাধান হয়েছে? উপরের দিকেই বা কি হচ্ছে? মাত্র ত্রিশ পার্সেন্ট পাশমার্ক সত্ত্বেও এত ছেলে ফেল করে কেন? এত গ্রেস-মার্ক, এত খোতাঘাস্তা, ডাইস-ডাপেনসারদের এত তয় দেখানো সত্ত্বেও তো পর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেলের কুতুব-মিনার রচিত হতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ-গুলিতে তো সবচেয়ে বাছাই ছাত্রই নেওয়া হয়—একদম সেরা ছাত্ররাই সেখানে যায়। তবু তবি এক্সপো'র মধ্যে সেখানে নাকি সবের কুড়িটার বেশি ছাত্র পাশ হয় না। কিন্তু কেন হয় না? এন্-জীনিয়ারিং কলেজেও তো ঐরকম বাছাই ছাত্রই নেওয়া হয়, আর সেখানে পাশও করে অনেক বেশি বলে শুনছি। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন করতেই হয় এন্জীনিয়ারিং কলেজগুলি যা পারে, মেডিক্যাল কলেজগুলি তা পারে না কেন? গলদ কোথায়? এর নাম কি শিক্ষাবিস্তার? না, অভিভাবকদের অর্থব্যয়?

কিন্তু তাহলে দেখা যাবে, 'এই বাহ্য আগে কহ আর' এ সব গলদ তো আছেই। তার উপর সব চেয়ে বড় কথা হল, আমাদের শিক্ষা উদ্দেশ্যবিহীন, অবাস্তব শিক্ষা। গোড়ার দিকের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে বেশি তর্ক নেই। সব চেয়ে গোড়ার স্তরে সে শিক্ষা Three R' নিয়েই যাবা যামায়। সব দেশেই এই আদর্শ। কিন্তু তার পর? তারপর হতে আমরা নানারকম আজেবাজে জিনিস দিয়ে ছেলেদের ভারাক্রান্ত করে তুলি। একজন সাধারণ বাঙালী ছেলের কথা ধরা যাক্। সে প্রথমত অনেকগুলো ভাষা শিখতে বাধ্য। বাংলা তো পড়তেই হয়, ইংরাজী পড়তে হয়, হিন্দীও পড়তে হয়

বা হবে, সংস্কৃতও পড়ে। সে কি ভাষাতত্ত্ববিদ্ হবে? না সারাজীবন অন্য কাজকর্ম ছেড়ে শুধু এই সব সাহিত্যের রস আস্বাদন করেই কাটাবে? সেরকম কটা ছেলে পাবে? সে যদি বাস্তবজীবনে এসবের চর্চা কোনদিনই না করে তাহলে এতগুলি ভাষা শিখে তার লাভ কি? আর শেখেই বা সে কতটুকু? সাহিত্য আস্বাদনের মত প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করা দূরে থাক্, ভাষার কাঠামোটাও সে ভাল করে শেখে না, ব্যাকরণ চর্চা করে না। ফলে পদে পদে ভুল। পরীক্ষার খাতা দেখলেই দেখা যাবে উঁচু পরীক্ষাতেও ইংরেজি ভাষার আক্রমণই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে। ভাল'টা শিখব, অথচ কার্যকালে ব্যাকরণশুদ্ধ মোটামুটি ভাল ভাষা লিখতে পারবনা—তাহলে অকালে যৌবনক্ষয় করে, মাথা খামিয়ে, অর্থ নষ্ট করে সে ভাষা শিখে লাভ কি হল? তার উপর ভাষা ছাড়াও একজন ইস্কুলের ছাত্রকে অঙ্ক শিখতে হয়, বিজ্ঞান শিখতে হয়, ইতিহাস পড়তে হয়, ভূগোল পড়তে হয়—আরও কত কি পড়তে হয়। এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা প্রশাখাতেই তাকে বিচরণ করতে বাধ্য হতে হয়। ফলে গাছের শিকড় গাড়ে না, কেবল পাতার বাহার হয়। তার উপর শিকড়ের রস না থাকায় পরীক্ষার মৌসুমী বায়ু কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাতা শুকিয়ে যায়। সুতরাং সেগুলি বিদ্যার মহীরুহও নয়, পাণ্ডিত্যের গাছও নয়, পরীক্ষার বর্ষার আগাছা। এই সব বিদ্যায় পল্লবগ্রহণ করে আমরা 'ইম্পরটান্ট কোশ্চনের' তালিকা বাহাই করে করে কোনওরকমে পরীক্ষার খাতায় তা উজাড় করে দিয়ে আসি। শুধু ইস্কুলেরই বা দোষ দিই কেন? আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলি। অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষা আমার, একটি বিষয় বিরাট পট-ভূমিকায় পড়তে হত। বহু জন্মের বহু যুগের কথা, মধ্যযুগ হতে একেবারে এ কালের আজ পর্যন্ত। বিষয়টিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, বহু বই সাময়িক পত্রিকা নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় একজন সহপাঠী একটা সহজ উপায় বাতলে দিল, সে দেখলে, গত পনের বছর ধরে কতকগুলি প্রশ্নই ফিরে ফিরে আসছে। একবার কতকগুলি, পরের বছর আর কতকগুলি, তারপর তৃতীয় বছরে প্রথম বছরের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, চতুর্থ বছরে দ্বিতীয় বছরের। এর কখনও ব্যতিক্রম হয় নি।

সহপাঠী বলল, এর কারণ আমাদের অধ্যাপক-টিই গত পনের বছর পড়িয়েও আসছেন, প্রশ্নও করে আসছেন এবং তিনি তাঁর বাঁধা প্রশ্নতালিকার একটুও বাইরে যান না। সুতরাং আগের আগের বছরের প্রশ্ন দেখলেই এ বছরের প্রশ্নের হদিস মিলে যাবে। তখন তার কথা বিশ্বাস করিনি। কার্য-ক্ষেত্রে দেখলুম তার কথাই ঠিক। অন্য বিষয়ের কথা জানিনে, কিন্তু আমাদের ছাত্রাবস্থায় অন্তত অর্থনীতির এম্-এ ক্লাসে এ-ও দেখেছি, আধুনিক এবং জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান কোনও বিষয়েও অধ্যাপক বছরের পর বছরের তাঁর টাইপ করা নোট ছেলেদের ঘণ্টা ধরে লিখিয়েই তাঁর লেকচার (?) শেষ করেন। ব্যবসাদারেরাও সে কথা যেনে সেই নোটের নকল সংগ্রহ করে পুরোনোটাই সাইক্লো-টাইল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশে বিক্রি করে দু'পয়সা কামায়। গুরুনিন্দা মহাপাপ, তা করছি নে। বস্তুত এমন অনেক অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁদের স্পর্শে শুধু যে লেখাপড়াই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই নয়, জীবনের মলিনতা পর্যন্ত কেটে যায়। তবু দু'চার ক্ষেত্রে যে গলদ দেখেছি তার উল্লেখও নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। সুখের বিষয়, আজকাল উন্নতি হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু মোটামুটি এই রকম আবহাওয়াই যখন চলছে তখন সেখানে পাঠ্যবস্তুকে সত্যভাবে গ্রহণ করা সম্ভব কি? যা লিখি তা কি আমার ভবিষ্যতের জ্ঞান ও কর্মের প্রস্তুতির হয়েই রইল?

স্থানের সন্ধান পাবে। সাধনার যে ক্ষেত্র ছিল অতীত যুগে, তাকেই আমাদের যুগে ফিরিয়ে আনতে হবে নব কলেবরে কিন্তু আদর্শ সেই একই, শান্তং শিবং সুন্দরম্।

খেলার মাঠ, ছেলেরা খেলতে এসেছে। কত বয়ের শিশু, বালকবালিকারা। তাদের কলকোলাহলে মাঠ মুখরিত। একটু দূরে কয়েকটি ছেলেতে মিলে 'গুলি' খেলছে, তাদের দলের মধ্যে খেলার পালা চলছে, গুলি বাজী রেখে এই খেলা হয়, যার লক্ষ্য ঠিক হয় সে সেই গুলিটা পায়। একটি ছোট ছেলে, বার বার হেরে যাচ্ছে—ক্রমে সে তার সব গুলি হারালো। বলে তার ছয় গুলি, কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এল— মা বলেন, কি হল রে, মাঠ থেকে কেঁদে বাড়ী এলি কেন? ছেলেটি বলে, আমার সব গুলি নিয়ে নেছে যা—আমি হেরে গেছি—।

'কেন তুমি হেরে গেলে বলত'—

আমি ঠিক মত লক্ষ্যে মারতে যে পারিনি—।

'তবে অন্যের কোন দোষ নেই, আচ্ছা কাল তোমাতে আমাতে খেলব, রোজ রোজ তুমি আমায় হারিয়ে দিবে, তোমার লক্ষ্য ঠিক করে তবে খেলতে যেও।'

মায়ে ছেলেতে খেলা করে ঘরের মেঝেতে বিছানায় বসে। কয় দিন পরেই ছেলের হাতের টিপ ঠিক হয়ে গেল, একদিন খেলে অনেকগুলি গুলি জিতে এনে, হাসতে হাসতে মাকে দেখাল।

ছেলে সব খেলায় কিন্তু পেরে ওঠে না বড় ছেলেদের সঙ্গে, তাই মা বোন হয় খেলার সঙ্গী—মায়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ে কাজ করে; কবিতা শেখে, গল্প করে, মায়ের তারা সঙ্গী হয়, যাও হয় তাদের সঙ্গী। তাই বোনে বেশী ঝগড়া বিবাদ হয় না, বাড়ীতে অথবা কোন অশান্তি হয় না। অল্প হাতের কাজে মায়ের ধৈর্যের দরকার, তবু ছেলেমেয়েরা তাঁকে সাহায্য করে। ছেলেটির সব ভার মেয়ের উপর। মায়ের সময় কম অন্য কাজ অনেক থাকে। ভাইটির সব ভার বোন করে। ভাই বোনে বিবাদ হয় না। কেউ কাউকে ছেড়ে একটু থাকে না, কেউ কাউকে ফেলে কোন জিনিস খায় না। মায়ের চোখ থাকে ছেলেমেয়েরা কি করছে সেই দিকে। যা কিছু তাদের জানার মাকেই তারা জিজ্ঞাসা করে, মা তাদের প্রশ্ন করে, তাদের সঙ্গে গল্প করে সব বুঝিয়ে দেন। তাদের নিয়ে মায়ের যে সময়টা কাটে তা আনন্দেই কাটে। ছেলেমেয়েও মাকে কিছু লুকায় না। আর একটি ছেলে ঐ খেলার দলেরই, পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ী খেলতে যায়, রোজই কারো না কারো ঘর থেকে খেলনা বাড়ী নিয়ে যায়। তার মা তাকে কিছু বলেন না। ক্রমে মিথ্যায় আশ্রয় নেয়, লোভ বাড়ে, সঙ্গী-সাথীদের কু-পরামর্শে কু-অভ্যাস সৃষ্টি হয়। বাড়ীতেও তাদের নানা অন্যায় অত্যাচার চলে, শিশু-সুলভ আমার মনে করে অন্যায় মনে হলেও প্রায় গৃহেই উপেক্ষা করা হয় কিন্তু ছেলে-মেয়েরা বড় হওয়ার সাথে ঐ বদ্ অভ্যাস বিরক্তিকর হয়ে ওঠে; পরে হয় উদ্বেগজনক; তখন আর শোধরানোর চেষ্টা করেও শোধন হয় না, অশান্তি হয়। ছেলেবেলার দোষকে দোষ, অন্যায়কে অন্যায় বলতে মা যদি উপেক্ষা করেন তবে শিশু তাকে দোষ বলে বোঝে না। মায়ের উপর শিশুর স্বাভাবিক ভালবাসা থাকায় তাঁর কথায় যেমন বিশ্বাস হয় সেরূপ দোষগুণ সবই তাঁর শিক্ষার মধ্যে গিয়ে পড়ে। পরবর্তী জীবনে তাই মায়েরই দোষ হয় সব—মায়ের চোখের জলও তাই শুকায় না।

শিশুকালেই শিশুশিক্ষা সুরু হয়। শিশুর জ্ঞানের আগেই অভ্যাস ও নিয়মের দ্বারা মনের মনোভাব তৈরী হয়।

বছর আড়াই তিনের ছোট মেয়ে, খেলা করে বাড়ীর অন্য ভাড়াটের পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। হয়ত হাতে করে নিয়ে এসেছে কিছু।

প্রথম দিনই মায়ের চোখে পড়ল, মা বলেন কোথায় পেলে মা এটা? আধ আধ বুলিতে যেটে বলে। মা তাকে দিয়েই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেন সে ফিরিল পাশের ঘরে। বলেন 'নিতে নেই ছিঃ, লোকে নিন্দে করে'; পাখীর বুলি শেখার মত শিশুকে মা ভাষা শেখান; তেমনি শেখান রীতিনীতি শু-অভ্যাস। প্রতিনিয়ত চোখ রাখতে হয়। আগ্রহ চেতনাকে মার্জিত সুন্দর নীতি দিয়ে গড়তে হয়। শিক্ষা ও আচার ব্যবহার মায়ের হাতে।

প্রাণী একমাত্র ছাঁচেই হবে না তা জানো কথা; তবে ভালোর একটা ছাঁচ আছে। সেই ছাঁচে ফেলে গড়তে হবে মায়ের মন, যেখান থেকে ছেলেমেয়ে শিক্ষা পাবে। বাইরের শিক্ষা, বড় হলে শিক্ষায়তনে যা শেখে তাকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়; কিন্তু জন্মক্ষণ থেকে যে শিক্ষায় শিশু গড়ে ওঠে তা মায়ের হাতে। তাই যে মায়ের রুচি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আচার ব্যবহার শান্ত ভদ্র, যে বাড়ীর পরিবার পরিজন শান্ত সমাহিত, প্রায়ই সে মায়ের শিশুরাও সেইরূপ হয়।

মায়ের চোখের দৃষ্টি প্রথম থেকেই যেমন শিশুর উপর না থাকলে শিশুর অসুখ হয়, তার খাওয়া শোয়া সব মায়ের অনুভবের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তেমনি বড় হলে মায়ের কর্তব্য বাড়ে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের বন্ধুত্বও বাড়ে। সন্তানের প্রতিদিনের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মায়ের দৃষ্টি প্রখর থাকলে তবেই সন্তানকে গড়ার কাজ সুষ্ঠু হয়।

বছর আট নয়ের মেয়েটি বাগান দিয়ে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিল, হাতের কাছে পাকা পেয়ারা, লোভ আর সামলাতে পারল না; হাত দিয়েই পাকা ফলটি হাতে এল। বাড়ী এসে কেটে ভাইবোনে ভাগ করে খেলো। মা ডাক দিয়ে বলেন, "হঠাৎ অসময়ে পেয়ারার শখ কেন মুখে? এমন পেয়ারা কোথায় পেলে?"

"ওদের বাগান থেকে এনেছি"—

'বলে এনেছ কি?'

'না।'

"যাও গিন্নিমাকে বলে এসে যে তুমি না বলে তাঁদের গাছ থেকে পেয়ারা পেড়েছ"—না বলবার উপায় নেই—যেতেই হলো। শিশুমনের লজ্জায় সেই গ্লানি জীবনে সে ভোলেনি—এবং আর কখনও সে অপরাধ করেনি।

ছেলেমেয়ের উপর মায়ের সজাগ দৃষ্টি থাকলে তবে তাদের স্বভাব ও দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসগুলি সুন্দর করে তোলা যায়। উদাসীন মা —অন্যায় আবার সহ্যশীলা মা—বিনিদা, ঠাকুমা, কি পিসি মাসী যে দোষগুলির প্রশ্রয় দেবেন বড় হলে সেইগুলি পরিণত দোষরূপে ফুটে ওঠে। ছোট দোষও দোষ, ছোট মিথ্যাও মিথ্যা। প্রবঞ্চনা করা পাপ, এই বোধ শিশুমনে যত শীঘ্র ছাপ ফেলতে পারে ততই ভাল—বড় হলে আর সে বোধ হয় না। তাই মায়ের আদর্শ চাই বড়।

সন্তান যখন নেবার প্রথম অনুভূতি থেকে ঘড়ির কাঁটার মত মায়ের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আদর্শ হিসাবে কতকগুলি নৈতিক পদ্ধতি আছে, যা কম বেশী সর্ব সমাজে, সর্ব ধর্মে, স্বদেশে ও বিদেশে কার্যকরী দেখতে পাওয়া যায়। দোষ ও সেইরূপ সর্বত্র দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়

১। যেমন মিথ্যা কথা বলা

২। লোককে ফাঁকি দেওয়া বা প্রবঞ্চনা করা

৩। লোভ, হিংসা দ্বেষ

৪। চুরি করা বা না বলে নেওয়া—ইত্যাদি কতকগুলি দোষ মানুষের মধ্যে থাকে, তাকে কমানো আদর্শগত জীবনের লক্ষ্য, তাকে বাড়ানো উচ্ছৃঙ্খল জীবনের দিকে গতি; সবটাই ছোট থেকে শিশুকাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পিতা মাতার উভয়ের মিলিত সংসারই সমাজের কাঠামো, এবং শিশুই ভবিষ্যৎ সমাজ সংসার ও রাষ্ট্র সংগঠনের উপাদান। তাই শিশুর জীবনচিত্র

বিয়েই আমাদের ভাববার কথা। কেন এমন হয় যা শোভন নয়, যা সুন্দর নয় পবিত্র নয়?

দরিদ্র-সংসার, স্থান অপ্রতুল, শিশুরা বাবা মার সঙ্গেই শয়ন করে। মা বাবা শিশুরা ঘুমিয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে গল্প কথাবার্তা প্রেমের অভিব্যক্তিতে শিশুর অস্তিত্ব ভুলে যান কিন্তু শিশুর মনে সকলের অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে এই ছবি আঁকা হয়। দুটি শিশু খেলা করছে—

আচ্ছা ভাই আমি মা হই তুমি বাবা হও, কেমন? আর এই বালিশটা খোকা হবে।

খেলা চলে যেন চলচ্চিত্রের অভিনয়। কোথায় পায় তারা নানা ইঙ্গিতপূর্ণ অভিব্যক্তি? বাপ মা অভিভাবকের অভিনয়? শিশুদের এই খেলা কেউ মন দিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রতিটি ছবি ও কথায় তারা বড়দের জীবনের অভিনয় নিজেদের ছোট্ট খেলাঘরে করছে।

আমরা যখন শিশুর মনো বড়দের হাতে তার দেখি খুব খুশী হই, ভাবি তারা যা করছে বলছে সেটা যথার্থ শিক্ষা, কিন্তু আমাদের যে ছবি শিশু মনে আঁকা হচ্ছে, এ তারই বহিঃ প্রকাশ মাত্র। চাকরদের গাল দিতে শুনে আর আর বুলিতে তারা গাল দেয় শাস্তি দেয়, ইত্যাদি। খুব মিষ্টি লাগে শুনতে কিন্তু একটু বড় হওয়ার সঙ্গে তা শোনায় বিশ্রী। ছোট হাতের মার মিষ্টি লাগে কিন্তু সেই আদরের মার পরে আবার মার দিয়ে শাসাতে হয়। তাতেও শাসন না মানে—তারা বড় হয়ে মা বাবাকেও বলে ঠেঙাব।

• • • •

বছর দশবারো বয়সের মেয়েরা বসে আছে স্কুলের টিফিনের সময়—গল্প চলে নানা বিষয়ের—তার মধ্যে প্রধানত কার ঘরে কি রান্না হয়, বড়রা কি করেন, কি বলেন এই সব কথা। নিজেদের ঘরের গোপনীয় ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলে। পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নানা চলন-বলন তাদের অনুকরণীয় হয়ে পড়ে। তার মধ্যে অশ্লীল গল্পও চলে। এটা সৃষ্টি হয় পরিবারগত অসাবধানতার জন্য। শিশুরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে নানা বিচিত্র ব্যবহার তাদের সামনেই হচ্ছে, কোনও গোপনতা বা আলোচনার বিচার নেই। শিশুদের অনুকরণ-প্রিয় তাই বড়দের ব্যবহারগুলি বিকৃত রূপ নিয়ে সেই মনের মধ্যে ক্রিয়া করে। আগেকার দিনে বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে শিশুদের থাকার ব্যবস্থা ছিল পৃথক্—পাশ্চাত্য দেশে অনেকটা এই ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এরও কুফল কুফল দুইই আছে। তবে চার-পাঁচ বছরের ছেলে-মেয়েদের সামনে আমরা মা-মাসী-পিসীরা যে গল্প করি তার যে কত বিষময় ফল ফলে ঐ সব অপরিণত শিশু মনে, তা ভেবেও দেখি না—পরে তার প্রকাশ দেখি অতি অকাল-পক্কতায়। পূর্বাপর এই ধারাই চলে আসছে। তখন এ জিনিস চলত; কারণ একমাত্র সংসার-যাত্রা ছাড়া তখন আর বাইরের কিছু চিন্তা করবার ছিল না। কিন্তু এখনকার আদর্শ তা নয়। মেয়েরা ভাই, আদর্শ কি তা ভাবতে শিখবে যদি দেখে মা মাসীদের আদর্শপূর্ণ জীবনে।

• • • ছোট্ট মেয়ে, বয়স তার বছর আট নয়, স্কুল থেকে এসে মাকে বলে,

"হাঁ মা অনিমার মা যেন গর্ভের ভিতর থাকে?" মা শুনে ভাবেন এ কথার অর্থ কি? ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেন কি তাদের কথা হয়েছিল। কিন্তু কথার পরে বোঝা গেল, 'গর্ভবতী' কথাটি ঐ ছোট মেয়ের অজানা তাই অন্য মেয়ে যখন বলেছে তার মা গর্ভবতী, তখন সে ভেবেছে বা বুঝেছে গর্ভের মধ্যে। ঘরের কথা বা মায়ের কথা নিয়ে স্কুলে আলোচনা না করার কোনও শিক্ষা সে পায়নি। দুটি ছোট মেয়ে গল্প করছে, "জানিস্ ভাই, আমার দিদির বিয়েতে কত গয়না, সাড়ী দিতে হয়েছে তবু তাই মা দুঃখু করে বলছিলেন—'আমরা গরীব কিনা

তাই একটা সেলাই এর কল দিতে পারলাম না।" অন্য জন বলে, "আমার দাদার বিয়ে হল, বউদিকে কত গয়না দিয়েছে কি রকম সব বাক্স ভরতি, আমি সব দেখেছি। মা বলছিলেন বউদির বাপের বাড়ী থেকে আরও দেবার কথা ছিল—দেয়নি—কি যেন সব বলছিলেন—তাই বউদি কেঁদেছিল। আমার বিয়েতে তো এই সব দেবে, না ভাই, কি বলিস্?"

এই ধরণের গল্প শিশু মনের সরলতাকে নষ্ট করে। কেবলি শিশুকে সাজানো, তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে বার বার বলা, তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জামা কাপড় গহনা খেলনা দেওয়াতে শুধু যে তার লোভকেই বাড়ান হয় তা নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্রে যদি সে অবস্থা অনুসারে সব কিছু না পায় তাতে অসন্তোষ অভিযোগ বাড়ে। শিশুকে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের বাধা ত্যাগ শিক্ষা দিতে হয়। শিশু যে ত্যাগ করতে শিখবে সে বিধান তো তাকে মেনে নিতেই হয়—যখন মায়ের কোলে আরেকটি ছোট ভাগীদার আসে। এই সময় মায়ের কোল ছাড়ার জন্য তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝালে সে কম আঘাত করে। মায়ের ধৈর্য ও শিক্ষার গুণে শিশু পরবর্তী ভাই-বোনকে ভালবাসতে শেখে—হিংসা করে না। অনাগত ভাই বোনের আগমনী সংবাদটুকু যা তাকে জানাবে অন্য প্রথায়। যদি একটু বুঝতে পারে যে তার ভাই বোন আসবে—তখন থেকে মা তাকে একটি সুন্দর শিশুর গল্প করে তার প্রতি প্রীতি বর্ধন করবেন। যে শিশু জ্যেষ্ঠ হল সে তাকে বড় বলে স্বীকার করবে—এই কথা শিশুর কাছে বলতে হবে। 'তুমি বড়', 'তোমায় একে দেখতে হবে' ইত্যাদি তাকে বললে এই বড় হওয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সে প্রথম থেকেই বুঝবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা তার কর্তব্য-পালনে প্রীতি ও আনন্দ এনে দেবে।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মা ও পরিজনের নানা আচরণের দোষে ভাইবোনের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়। হয়তো একটি সন্তান একজনের বেশী প্রিয়, অপরটিকে সে তুচ্ছ করে, তাতে উভয়ের মনে পরস্পর বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। পরে তাই থেকে বিরোধের কারণ ঘটে। শিশু যে একই অধিকারযুক্ত, একই ব্যবহার পাবে এ শিক্ষা অতি অল্প বয়সের জানা থাকে। বড় ছেলেটি নির্বোধ, মেয়েটি কিছু চতুর, তার বুদ্ধির জন্য সে সমাদর পায় কিন্তু তার নির্বোধ দাদাটিকে সে উপেক্ষা করতে শেখে শিশুকাল থেকে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ছোট ভাইকে বলা হয় "ওটা গাধা ওর কান মলে দে", ছোট ভাই উৎসাহে আদেশ পালন করে। ভবিষ্যৎ জীবনে বড় ভাইয়ের প্রাপ্য সম্মান সে দেয় না। এদিকে বাড়ীর নির্বোধ ছেলেটি বোকা খ্যাখ্যা খেতে খেতে নিজের বুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, তার আত্ম-চেতনা কখনও হয়ত আর জাগে না।

স্কুলে অনেক শিক্ষক একটু স্থূলবুদ্ধি বালককে বিদ্রূপ করে বুদ্ধিমান বালককে দিয়ে শাস্তি দেওয়ান, তাতে উভয়ের ক্ষতি হয়। একের হয় অহঙ্কার, অন্যের হয় আত্মসম্মান-হানি। মানুষের মর্যাদার দাবী সকলের আছে, তা নিজ নিজ চেতনার মধ্যে উন্মেষিত হবার জন্য চাই সাহায্য।

এ সাহায্য আসে মায়ের কাছ থেকে প্রথম। যে পরিবারে মায়ের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বেশী, সেই সংসারে প্রায়ই সন্তান সুসংযত হয়ে মানুষ হয়। মায়ের শিক্ষা, সংযম ও নিষ্ঠা শিশুর জীবনের প্রধান উপাদান।

এখনকার মত শিক্ষা না থাকলেও, পুরাকালে বহু পরিবারে নিষ্ঠা ও নীতির গুণে আদর্শ আপনি তৈরী হয়ে উঠত। এই নব্য যুগের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের বহির্মুখীনতা এত বেশী আকর্ষণীয় হয়েছে যে, গৃহ, পরিবার পরিজন, সন্তান, সমাজ, বার বার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। এত মিশ্রিত ভাবের যে সমাবেশ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে কিন্তু আদর্শ-

P30590

গড় কোন ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে না। এই খানে দরকার মায়ের মনের দৃঢ়তা ও মায়ের মনের সংযত আদর্শ বোধ।

শিশু সন্তানটিকে অন্নপ্রাশনের পর হতে, সাবান পাউডার, সেন্ট, তোয়ালে, আয়না, জুতোর, মোজার মুড়ে, তার স্বাভাবিক সমস্ত বিকাশকে নষ্ট করা হয়, মনগড়া আধুনিক নকলনবিশ জীবসৃষ্টি হয়। তাই দেখি তার নিজের মনের দিকে তার দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি তার বাহিরের সৌন্দর্যের কোথায় একটু মুছে গেল, কাপড়ের ভাঁজ কোথায় উল্টে গেল।

আয়ার, কাপড়ে, জুতার, হাতের ছাতার, মাথার ছিতার, চোখের কাজলে, ঠোঁটের রংএর দিকে কি প্রখর দৃষ্টি। দৃষ্টি নেই শীলতার দিকে, নেই দৃষ্টি স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যের আবশ্যের দিকে, দৃষ্টি নেই স্ত্রী পুরুষ কারোই তার তার মর্যাদা রক্ষার দিকে।

বাহিরের চাকচিক্যে মুগ্ধ শতকের মনোভাব যদি সৃষ্টি হয়, তবে মানব সমাজে জেগে ওঠে পশুভাব, আর সব গুণ চাপা পড়ে, দেশে দেশে বেধে যায় হিংসার হানাহানি, তবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? বিশ্বস্রষ্টা এই মানবসমাজের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব বোধ দিয়েছেন তা আমাদের কাজে প্রতিপন্ন করতে হবে। আমাদের শুভ বুদ্ধির প্রথম সৃষ্টি হয় মাতৃগর্ভে তাই সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান চাই এই মাতৃত্বের অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মাতৃগোষ্ঠির উন্নতি সাধন। এই সাধনায় ধাপ গড়া এখনি সুরু করতে হবে অনাগত মাতৃত্বের আবহাওয়ায়, ঐ শিশু কন্যা-মনের শিক্ষায় পরিহিতে, ঐ কিশোরীর স্বপ্ন বিলাসের মধ্যে। এই সব বালিকার কল্পনায় বস্তু-লোকের মধ্যে আনতে হবে অনাগত ভবিষ্যতের আদর্শ চরিত্রগঠনের পদ্ধতি।

তাই চাই শিশু শিক্ষার প্রথম পাঠশালা
শিশু পালনের জন্য মাতৃশিক্ষালয়।—

শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি কথা

(১৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দ্বিতীয়: পাঠ-তালিকার কার্যক্রম।

পূর্বে যা বলেছি, তা হতেই পাঠ তালিকার কার্যক্রম কোন্‌দিকে, কি ভাবে বদলান দরকার, তা বোঝা যাবে। এ বিষয়ে দুই একটা দিকের ইঙ্গিত পূর্বেই করেছি। ইংলণ্ডে ছাত্রদের একটা খুব বড় সুবিধে এই যে, তারা নিজেদের ভাষা আয়ত্ত করলেই সেই ভাষার সাহায্যে আসল পাঠ্যবস্তু—যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন সুরু করে দেয়। তাদের সবচেয়ে প্রাথমিক কর্তব্য হল জ্ঞানলাভের হাতিয়ার হওয়া। যারা সাহিত্য-চর্চা করবে না অথবা ভাষার গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হবে না, তাদের কাছে ভাষাই তাদের চরমার্থ নয়, ভাষা কেবল মাত্র জ্ঞানলাভের হাতিয়ার মাত্র। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে যে চাষী চাষ করবে, তার সংস্কৃত হিন্দী বা ইংরেজী কিছু পড়াশুনা করে না। রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী দরকার হবে কোর্টে আদালতে—তা সে কাজ তো সে উকিল মুহুরী দিয়ে করিয়ে নেবে—তার জন্য তার নিজের সে ভাষা শিক্ষা করবার কোনও প্রয়োজন নেই। তার যা কিছু দরকার, সে সবই বাঙলা ভাষার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে—এমন কি, কৃষিবিজ্ঞান ও পশু বিজ্ঞানের কঠিনতম জ্ঞান পর্যন্ত। তার ইস্কুলের শিক্ষা এই ভবিষ্যৎ জীবনের মত গড়ে দিতে হবে। তেমনি যে তাঁতকলের উইভিং মাস্টার হবে, তাকে আর একটু বেশি পড়তে হবে অবশ্য, কিন্তু তিনিও যাতে বাঙলা ভাষার মাধ্যমেই কাজে চালাতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরেজরা কি ল্যাটিন শিখে তবে বাইসক্যান কোরক্যান হয়? কিন্তু যিনি উকীল হবেন, এমন কি গ্রামের পোষ্টমাষ্টার ও হবেন, তাঁকে বাঙলা ছাড়াও হিন্দীও ইংরেজি অবশ্য শিখতে হবে, কারণ তা না হলে তার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। কিন্তু তা বলে গ্রামের সকলেকেই যে খোকার পাতা পর্যন্ত ইংরেজি কার্ষ্টবুক পড়তে হবে তার কোনও মানে নেই। এককালে আমাদের একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হয়েছিল আমরা ইংরেজদের হারিয়ে দেব তাদেরই ভাষার জ্ঞানে, তাদের সাহিত্যের আস্বাদনে, সেই জন্য সকলকেই মাইকেল বা রবিনাথ যে করে তুলবার একটা অদ্ভুত চেষ্টা হয়ে গেছে আমাদের পাঠতালিকায়।

কিন্তু তখন 'সকল' বলতে বোঝাত শুধু কয়েক জনকে। আজ তা নয়। সে কারণে সে ইচ্ছা শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। ১ তাতে অযথা শক্তিক্ষয় হয়, মন আসল বিষয়ে প্রবেশের বদলে ভাষার পাকে পাকে ঘুরে মরে, শেখেও না আসলে কিছু। তেমনি ইতিহাস ভূগোলের কথা। আমার গ্রাম, শহর, তারপর আমার প্রদেশ, দেশ ও প্রতিবেশী দেশের খবর না জেনে শুধু ইরান-তুরান ওড়ালে কোনও কাজ হয় না, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অকেজো। এই সব কথা ভেবে পাঠতালিকার ঢেলাই সম্পূর্ণ বদলে দিতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, অন্তত তৃতীয় স্তরের লোকদের শিক্ষা পুঁথিগত হলে চলবে না—তাদের সমাজ, জীবন ও কর্মের সঙ্গে সে বিদ্যাকে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের ছেলের পাঠ-তালিকায় হাইজিন থাকলেই হবে না, কম্পোষ্ট তৈরীও থাকবে। বরং বিজ্ঞান শেখানোর অছিলা করে যে সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করা হয়, তার বদলে হাতে কলমে কম্পোষ্ট তৈরী শিখিয়ে তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তা অনেক বেশী কার্যকর হবে। চাষীর বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা না করে কি ভাবে এড়ো বাঁশ দিয়ে আশেপাশের ঘোষাই বন্ধ করা যায় ও মাটির তলার জল-সঞ্চয় বৃদ্ধি

করা যায়, তা জানলে ভের বেশি ভাল ফুটবল খেলা যাবে।

১। স্বর্গত বিহারীলাল রায় মহাশয়ের নিকট একটি গল্প শুনেছিলাম। ওকাকুরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার সময় কলকাতায় একটি বিদায়-সভা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন স্বর্গত ফুলেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনর্গল ইংরেজিতে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। উত্তর দিতে উঠে ও কাকুরা প্রথমেই বললেন, Me no speak good English; me no compelled to learn English. স্বাধীন রাষ্ট্রবাহুল্য আছে আর পরাধীন অনুকরণপ্রিয় আছে তফাৎ এইখানে।

(ক্রমশঃ)

(অগ্রহায়ণ—১৩৬১, বেণু পত্রিকার সৌজন্যে)

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বৎসর মাঘ অনুসারে গণিত হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ তোতার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিক্ষকের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৮৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ তোতার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | পৌষ ১৩৬১ | ২য় সংখ্যা

আলোচনা

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য

আচার্য সুশীল কিমোর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদটি খালি হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করিয়া উপাচার্য পদের জন্য ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব ও মানব সম্বন্ধ বিভাগের ডিরেক্টাররূপে নিযুক্ত আছেন। একদিকে পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে শিক্ষকতার খ্যাতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সহিত বিশেষ পরিচয়, উভয়দিকেই তাঁহার এই পদের জন্য যোগ্যতা সকলেই স্বীকার করিবে। আশাকরি কার্যকরী কমিটির এই প্রস্তাব কাজে পরিণত হইবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের এই পদে নিয়োগ বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

ছাত্রাবাস স্থাপনের পরিকল্পনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ এক প্রেস কনফারেন্সে জানাইয়াছেন যে, ছাত্রদের অবসরসময় যাপনের জন্য চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কতকগুলি ছাত্রাবাস স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের একটি পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে কার্যে পরিণত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে রিডিং রুম থাকিবে, এবং স্নান আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকায় ছাত্ররা যাহাতে অন্তত চৌদ্দ ঘণ্টা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকিতে পারে তাহার সুযোগ থাকিবে।

ছাত্রদের সমাজসেবা

বিগত বড়দিনের ছুটির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের যুক্ত পরিচালনায় কলিকাতার অনতিদূরে হুগলি জিলার অন্তর্গত সুহারীমোরা নামক গ্রামে যুবকদের দেহগঠন ও সমাজসেবাকার্যে শিক্ষাদানের জন্য একটি শিবির স্থাপন করা হয়। ইহাতে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদল যোগ দেয়। দশজন অধ্যাপক ও চল্লিশজন ছাত্র লইয়া এই শিবিরের স্থাপনা হয়।

রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করা, পুরাতন জলাশয়াদি সংস্কার করা এবং গ্রামে বয়স্কদের লেখা-

পড়া শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি এই শিবিরের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রামবাসীদের সহায়তায় ও স্থানীয় নেতাদের উৎসাহে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে সমীক্ষা আলোচনা ও গ্রামের কর্মধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন, সেখানকার মূল্যবান ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল জাতি গঠনের কাজে ছাত্রদের উৎসাহ দেখিলে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে আশার ভাগে। কোন কমিটি শিক্ষাবিদ্ বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির একবৎসর আবশ্যিকভাবে সমাজসেবার কাজ করিতে হইবে, তবে তাহাদিগকে উপাধি লাভের যোগ্য বিবেচনা করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের যোগ্যতা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড শুনিতেছি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধনের জন্য একটি নূতন প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন ইতিপূর্বে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, সাধারণ সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি যোগ্যতার অপরিহার্য প্রমাণরূপে গৃহীত হওয়া সমীচীন নয়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই যোগ্যতার মাপকাঠি এইরূপ নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশকে সর্বোচ্চ যোগ্যতা এবং সতেরো বৎসর বয়সকে উচ্চতম বয়স গণ্য করিবার প্রস্তাব করিবেন। বোর্ডের মতে ইহাতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অযোগ্য ছাত্রছাত্রীর প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হইবে, আর তাহার ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হার কমিয়া যাইবে, উচ্চ শিক্ষার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইবে, এবং জাতীয় শক্তির অপচয় বন্ধ হইবে।

অবশ্য ইহাতে একটি আশঙ্কার কথা আছে, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের সময় কর্তৃপক্ষ-অধিকারীদের তরফে পক্ষপাতদোষের সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

মাজিয়া ইউনিয়ন গণপরিষদ

বর্ধমানের অন্তর্গত পূর্বস্থলী থানার মাজিয়া ইউনিয়নে ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৭টি গ্রামের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া গ্রাম উন্নয়নের জন্য এক গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই গণপরিষদ প্রকৃত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ সেবার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। নিরক্ষরতা দূর করা, সাথী সেনা নামে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, পল্লী মঙ্গল নামে দুর্ভিক্ষ নিবারণ কমিটি, সমবায় সমিতি স্থাপন, বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য বিভাগ খোলা—এই সকল ইহাদের কার্যতালিকার মধ্যে। সংস্কৃতি বিভাগে বালক ও যুবকদের উৎসাহে ব্যায়ামের জন্য মৈদানিতলায় স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য পাঁচটি টিউবওয়েল খনন করা হইয়াছে, আরও তিনটি শীঘ্রই করা হইবে। এই মাজিয়া ইউনিয়ন গণপরিষদ লোকের অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, গ্রামের রাস্তা ঘাট সংস্কারের দিকে শুধু মন দেন নাই, তাঁহারা গ্রামের লোকের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকিরণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব-প্রকার কুসংস্কারমুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাহাদের এই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হউক।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাব

মাদ্রাজের উপকণ্ঠে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাবটিকে আমরা দেশবাসীকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে সরকারি কর্তৃপক্ষের মুখে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের কথা অনেক ভাবে শোনা গিয়াছে, কিন্তু আমরা কাজে কতটা অগ্রসর হইয়াছি তাহা সকলেই জানেন। এবার জাতীয়

কংগ্রেস প্রস্তাব করিয়াছেন, অনতিকালের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার ও বিস্তৃতরতা দূর করার চেষ্টায় তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইবেন। দশ বৎসর বেশি দিন নয়—এই সময়ের মধ্যে এই দুইটি প্রস্তাব যদি কাজে পরিণত হয় তবে তাহা অপেক্ষা আশা ও আহ্লাদের কথা আর কি থাকিতে পারে? কংগ্রেস এবার সমাজবাদী সমাজ গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মূল কথা সকলের জীবিকার সংস্থান ও সকলের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিধান। এক কথায় শিক্ষাব্যবস্থার সর্ব-প্রকারের বৈষম্য দূর করা, সহযোগিতা ও ত্যাগের মাধ্যমে এবং শ্রমের মর্যাদা স্বীকার করিয়া সকলকে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই দুয়েরই জন্য চাই সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা আর একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষা সহজ পথে ইহা দান করিতে সক্ষম। জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে জাতীয় সরকার অবশ্যই দেশের জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকিরণের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন যদি তাঁহারও এই মূল মন্ত্রটি গ্রহণ করেন। ইহার জন্য চাই দৃঢ় প্রত্যয়—প্রত্যয় থাকিলে অন্য বাধা বিঘ্ন দূর করিতে সময় লাগিবে না।

জুভেনাইল সিলেবাস

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ হাই স্কুলের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য ১৯৫৫ সাল হইতে যে নূতন সিলেবাস স্থির করিয়াছেন তাহাতে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাস অনুসারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবশ্য পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে: ১। বাঙলা এবং হিন্দী, উর্দু ও নেপালী ভাষার যে কোনটি একটি ভারতীয় ভাষা, ২। ইংরাজী, ৩। গণিত, ৪। ইতিহাস, ৫। ভূগোল, ৬। সাধারণ বিজ্ঞান। যাহারা হিন্দী ইত্যাদি কোন ভাষা গ্রহণ করিবে না তাহাদিগকে অতিরিক্ত বাংলা ভাষার একটি পেপার নিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরিচালক

পশ্চিম বঙ্গের বাতিল মধ্য শিক্ষার বোর্ড আগামী মার্চ মাসের পূর্বে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইতিমধ্যে রাজ্যসরকার বর্তমান পরিচালক ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র দাসের কার্যকাল আরও একবৎসর বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। মনে হয় মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের উপরই মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠিত হইবে। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক বোর্ডের অনুসন্ধানের জন্য যে অন্তর্ম কমিটি বসিল, তাহার ফলাফল জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিয়াছি।

কোন্নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী

বিদ্যালয়ের মত অনতিতরুণ কোন প্রতিষ্ঠান কর্মক্ষেত্রে একশত বৎসর পূর্ণ করিয়াছে শুনিলে লোকের মনে প্রশংসা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া ওঠে। আর সেই বিদ্যালয় যদি প্রাথমিক বিদ্যালয় হয় তবে তো উহা পরম বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে একনিষ্ঠ ভাবে খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্খা না রাখিয়া কোন কাজ করিয়া যাওয়া নিতান্ত সহজ নয় এবং সেরূপ দৃষ্টান্ত বেশি পাওয়া যায় না। তাই কোন্নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইল জানিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। ৺শিবচন্দ্র দেব, ৺কৃষ্ণধন ঘোষ ও অন্যান্য মনীষির স্মৃতির সঙ্গে এই বিদ্যালয় যুক্ত; বর্তমান বাঙলার ইতিহাসে ইহার স্থান, ইহার মর্যাদা রক্ষা হউক, বাঙলার হিতকামী সকলেরই মনে এই শুভ ভাবনা জাগিবে।

বিশেষ সংখ্যা

শিক্ষার আগামী সংখ্যা অর্থাৎ মাঘের সংখ্যায় আমরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিধিদের অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত করিব বলিয়া মনে করিয়াছি। অনেক মূল্যবান সুচিন্তিত ইঙ্গিতের কথা এখানে ওখানে উচ্চারিত হয়, সেগুলি একত্র লিপিবদ্ধ হইলে আমাদের দৃষ্টিপথে অবশ্য পড়িবে বলিয়া মনে হয়। আশা করি আমাদের পাঠকেরা চিন্তানায়কদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইয়া ভবিষ্যতের সংগঠনের জন্য প্রস্তুত হইবেন।

শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি কথা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় : বিদ্যালয়ের রূপ—এ বিষয়ে লিখতে গেলে বিস্তর লিখতে হয়। তাই সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলছি। এগারো বছর আগে একটা প্রয়োজনের তাগিদে এই সব বিদ্যালয় এক ধরনের রূপ নিয়েছিল। তার পর এনট্রান্স কমিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন হবার সময় নাকি একটা উদ্দেশ্য বিঘোষিত হয়েছিল, যত সহজে ছেলেরা বেশি পাশ করবে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ততই বেশি হবে ; ফলে অসন্তোষ, অশান্তি ও আন্দোলন ততই বাড়বে এবং তাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে। জানি না, এরকম একটা উদ্দেশ্য সত্যেনভাবে ছিল কি না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা মোটামুটি সেই ধরনেই ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ফল আর যাই হোক্, আমাদের জাতির মাথাটা খাওয়া গেছে, এমন কি রাজনীতির মাথাও। যে জাতে মাথা নেই, সে জাত কি সত্যি-সত্যি রাজনীতি করতে পারে? বলিষ্ঠ বাস্তব রাজনীতি? তারা একজন দাদোঠাকুরের ইশারায় মেষপালের মত ব্যাণ্ডা ধাক্কে রাস্তায় বেরোতে পারে, ঘরে আগুন দিতে পারে, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ চীৎকার করতেও পারে, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটি মানুষ সজ্ঞানে ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করবে, রাজনীতির ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে পারবে—এ প্রয়োজন মেটাবার মানুষ গড়েছে কৈ? যে বিচারবুদ্ধি ও মোহহীন দূরদর্শিতার ফলে ইংরেজ দুই দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকিনকে পর্যন্ত সরিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করেনি, সেইরকম বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিচারবুদ্ধি না থাকলে সত্যকারের রাজনীতি হয় না। কাজেই জাতির স্বার্থে তো বটেই, এমন কি রাজনীতির স্বার্থেও, এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার—বর্তমান ধারার মোড় ফেরা দরকার। কিন্তু সে কথা থাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে খুব দূরদর্শী ও গভীর কথা বলেছেন, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার" নামক গ্রন্থটিতে। সকলেরই সেই বইটি পড়া উচিত—সেজন্য তাঁর কথার পুনরুল্লেখ এখানে করব না। তাঁর বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ হতে অবশ্য কলেজ ইস্কুলগুলির রূপও খানিকটা বোঝা যায়। পাঠকেরা সে বই পড়ে নেবেন। সংক্ষেপে বলা যায়,—

এক, উপরে উক্ত নতুন আদর্শ ও পাঠতালিকার ভিত্তিতে ইস্কুল চালাতে হবে। তার মত ইস্কুলগুলি যথাসম্ভব আবাসিক হলে ভাল হয়, কলেজগুলিও। বাড়িতে যে ছেলে একরকম আবহাওয়ায় থাকে, ইস্কুল থেকেই ছোটে চা, চপ, সিনেমা, চণ্ডীদাসের সন্ধানে, তার জীবনকে ইস্কুল আর কলেজ কতটুকু প্রভাবান্বিত করবে? উইণ্ডসরের অদূরে ইটনের বিদ্যালয়, নিসর্গ শোভার মধ্যে পুরানো গম্ভীর চেহারার বাড়িগুলি অটল শান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে ছেলে চব্বিশ ঘণ্টা সেই আবহাওয়ায় থাকবে, সে তো লেখাপড়া শিখবেই, উপরন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার চরিত্র গঠিত হয়ে যায়। আর্মানিতে যে সব ছাত্র টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে পড়ে তাদের সকাল-বিকেল কাজ করতে হয় ফ্যাক্টরী ল্যাবরেটরীতে, দুপুরে

বিশ্বরীর ক্লাশ, যাকে লাইব্রেরী। গোটা জীবনটাই অধ্যয়ন নামক তপস্যার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং তারা স্বভাবতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করছে। আমাদের দেশে মানুষ গড়তে গেলে এইরকম গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও তো রাজারা ছেলেদের প্রাইভেট টিউটর রেখে পড়াতেন না, গুরুর কাছে তপোবনে পাঠিয়ে দিতেন।

দুই, বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা বদলাতে হবে। ছাত্র প্রতিদিন ক্লাশের খাতায় যে নম্বর পায়, পরীক্ষার সঙ্গে তাও সমানভাবে বিবেচিত হবে।

তিন, গৃহশিক্ষক পদ্ধতি সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে। পূর্বেই বলেছি, কিভাবে ইস্কুলেই টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে শিক্ষকদের জীবিকাও কমে না অথচ অন্য সব দিকে উন্নতি হয়।

চার, ছাত্রদের কিছু সমাজসেবামূলক কাজ করতে হবে। যেমন ফার্স্ট ক্লাশের ছাত্রেরা বা কলেজের ছাত্রেরা আশেপাশের শহরে বা গ্রামের বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার জন্য সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ক্লাশ নিতে পারে। দুজন আজ ক্লাশ নিল, আর দুজন পরের দিন পড়াল—এইভাবে ভাগ করে দিলে এদেরও পড়ার ক্ষতি হবে না।

পাঁচ, যেভাবে ইস্কুল কলেজের পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হন, তা বদলাতে হবে। আগে যে সব রাজারাজড়ারা অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থানীয় ইস্কুলের সভাপতি বা সম্পাদক হতেন, তাঁরা বড় জোর একটু মুরুব্বিয়ানা করতে চাইতেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী খুব সুদূরপ্রসারী হয়তো ছিল না, ইস্কুলে হয়তো তাঁরা ভক্তিভরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি টাঙিয়ে রাখতেন, আর চাপকান প'রে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়কে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করে আসতেন—কিন্তু তাছাড়া অন্যদিকেও হাল ধরে রাখবার মত বিদ্যাবুদ্ধি, দিকপ্রতা ও অবসর তাঁদের ছিল। আর এমন কি সে সব রাজারাজড়াদের হলও অদ্যন্ত। তার বদলে কমিটি "ক্যাপচার" করবার দলই গড়ে উঠছে। সস্তা পলিটিক্স-বুদ্ধি বহুদের মধ্যে ইস্কুল কলেজ নিয়ে হাইকোর্ট ও বিভিন্ন কোর্টে অজস্র মামলা হচ্ছে। আগে তা হত না। সুতরাং এর প্রতিকার দরকার, যাতে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষানুরাগীরাই ইস্কুল কলেজের কর্তা হন তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে এবিষয়ে নতুন পন্থা বাতলিয়েছেন। এবিষয়ে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা আগের গ্রাম্য দলাদলির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে কুৎসিত রাজনীতি। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর সম্পত্তি যাতে ম্যানেজিং কমিটির হাতে না থেকে ট্রাস্টীর হাতে থাকে। মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ছে। ম্যানেজিং কমিটি একবার কংগ্রেস, একবার পি-এস-পি দখল করছে আর আগের দল যে ঘরবাড়ী তৈরী করছে পরের দল সে ঘরবাড়ী ভাঙছে। এটা খুব চরম নিদর্শন হলেও ছোটখাটভাবে এ ধরণের গণ্ডগোল বহু জায়গার হতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং সম্পত্তির ভার এমন কয়েকটি লোকের হাতে দেওয়া উচিত যারা জনসাধারণের কাছে স্থায়ী সম্পত্তির জন্য আইনগত-ভাবে দায়ী থাকবেন এবং যাঁরা ম্যানেজিং কমিটির দলাদলির ধুলোয় ঘড়ে উড়ে যাবেন না।

ছয়, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলি যেমন পরিকল্পনা-বিহীনভাবে ছড়িয়ে আছে তা চলবে না। সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। খুব কাছাকাছি দুটি বিদ্যালয় যাতায়াতি করতে থাকবে, আর তারপর বহুদূর পর্যন্ত কোনও বিদ্যালয় থাকবে না, এ ব্যবস্থা অচল। সেখানে কাছাকাছি একটি বিদ্যালয়কে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষত আবাসিক বিদ্যালয় হলে এ ব্যবস্থা ছাড়া চলতেই পারে না।

একে শিক্ষার সংকোচ মনে করবার কোনও কারণ নেই। অবশ্য এতে কিছু ব্যক্তিস্বার্থ বা দলস্বার্থ বা বলাহলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু তা গ্রাহ্য করলে চলবে না। কলেজের বেলাতেও সেই কথা পাঁচহাজারী আর পঞ্চশতী কলেজে যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েট বিভেদ আছে তা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থ : শিক্ষা বিভাগের সংস্কার। এই সব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সার্থক করতে গেলে শিক্ষা বিভাগের হাতে অনেক ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা দেবার আগে শিক্ষা বিভাগের সংস্কার চাই। আজকাল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে রয়েছে। তার এক কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক কর্তা মাধ্যমিক বোর্ড। এই দুয়ের মধ্যে একটা সুসমন্বয় বিধান করতে হবে। বিশেষত আপাতত এরা পরস্পর মারামারি করতে ব্যস্ত। তা বিচিত্র নয়, কারণ এর প্রত্যেকটিই অন্নবিত্তের আইমনস্তার মত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তাতে শিক্ষা হয় না। বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন প্রস্তাব করেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে আরও সরকারী আওতায় আনতে। তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার আগে প্রয়োজন শিক্ষা বিভাগের সংস্কারের। যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন এবং যাঁরা সরকারী চাকরি করেন তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত হলেও শিক্ষাবিদ্ নন। বিশেষত আজকাল অশিক্ষিতেরাও মন্ত্রী হতে বাধা নেই। সুতরাং তাঁদের হাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ছাঁটু পরিচালনা না-ও হতে পারে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই প্রগতিশীল দেশে সরকারের মধ্যে বোর্ড ব্যবস্থা আজকাল খুব বেশি হয়ে উঠেছে। আগে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীরা প্রত্যক্ষভাবে যা পরিচালনা করতেন এখন তা বিভিন্ন বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সেইজন্য বিভিন্ন বোর্ড থাকা দরকার। শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে এই সব বোর্ড গঠিত হবে—অবশ্য সেখানেও দেখতে হবে তার গঠন এমন যেন না হয় যাতে তা অধুনালুপ্ত বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মত দলাদলির কুরুক্ষেত্রেই পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম : অর্থব্যবস্থা। এই সব করতে গেলেই টাকা চাই। বিনা পয়সার আর যাই হোক, শিক্ষা-ব্যবস্থা হয় না। ঘাটের তেলে মাছ ভাজা শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময় সম্ভব নয়, যা সম্ভব করতে গেলেই ঐ পাঁচ হাজারী কলেজের বিষবৃত্তে পড়তে হবে। সেইজন্য এই সব সংস্কার কাজে পরিণত করবার জন্য সরকারকে যথোচিত টাকার বরাদ্দ করতে হবে। সাধারণত অর্থাভাবের কৈফিয়ত দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এবারই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের বহু বহু লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। প্রাদেশিক সরকারেরও বহু বাজেট-বরাদ্দ টাকা বছরের শেষে খরচের অভাবে ফিরে যায়।

ষষ্ঠ : শিক্ষা ও রাজনীতি। পরিশেষে শিক্ষা ও রাজনীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেই শেষ করব। আমরা চলতি রাজনীতির আবর্তে শিক্ষক ও ছাত্রদের বহুদিন থেকে টেনে আসছি। ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সম্প্রতি নেহেরুও অনুরূপ দু-চারটি কথা বলেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে অবস্থা একরকম ছিল, এখন অবস্থা অন্যরকম হয়েছে। আগে দরকার ছিল সকলে মিলে কোনও রকমে ইংরেজকে দাগাপার করে দিয়ে আসা। সেই ব্যাপারটায় সবাই মিলে আমরা কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। যুক্তি ছিল এই যে, আমরা তো আর চিরকালের মত সব জিনিস বন্ধ করছি নে, দু-চার বছরের জন্য লেখাপড়া বন্ধ করলে ক্ষতি কি। ঘরে আগুন লাগলে তো সবাইকেই কলসী নিয়ে ছুটতে হয়। কথাটার মধ্যে খানিকটা যুক্তি আছে। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের

চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সঙ্কীর্ণ করতে চাইনে কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে? যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে কোপানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রস্বচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুল শক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে।" তখনকার যুগে যা-ই হোক, স্বাধীনতার পর তো আমরা সত্যকারের স্বরাজের সম্মুখীন হয়েছি। সেই অহর্নিশি বিরাট স্বরাজ সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদের উপর ভয়ঙ্করভাবে এসে পড়েছে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত নির্বাচিত হচ্ছেন, গ্রামের শাসনভার পঞ্চায়েতের হাতে, ভূমিব্যবস্থা সমবায়মূলক হতে চলেছে। কাজেই আমরা না চাইলেও আমরা কেউই আর পলিটিক্স্ এবং দেশ গড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাব না। তার উপরে আমরা সাবালক হয়েছি, আর ইংরেজের অভিভাবকত্ব নেই। সুতরাং সারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সেইজন্য রাজনীতিও আর ইংরেজ বিতাড়নের চক্রে ঘুরে মরছে না—এখন তা তার বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ রূপে উঠছে। কিন্তু সে রাজনীতি করতে হলে আমাদেরও তৈরী হতে হবে। নাবালকের পক্ষে যে হৈ চৈ শোভা পায়, সাবালকের তা সাজে না। সেইজন্য আমরা যদি নিজেদের মানুষ না করে তুলি, তাহলে এ পলিটিক্স্ করতে পারব না। সুতরাং অবিলম্বে ভাল করে রাজনীতি করব বলেই গোড়ায় চলতি রাজনীতির আবর্ত হতে দূরে মানুষ গড়ার কাজটা নিশ্চিন্তে ভালভাবে হওয়ার নিদারুণ প্রয়োজন ঘটেছে। যেমন পার্টিশনের আগে যা পার্টিশনের জন্যই ব্রহ্মাস্ত্র। খুব সঙ্কটমুহূর্তে এক আধবার পদস্খলন হয়তো মার্জনীয়, কিন্তু তা প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হলে শাস্তিরূপ অনিবার্য। আজ পলিটিক্স্ পলিটিক্স্ করে আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠি বটে, কিন্তু বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব হয়ে থাকাই কি ছাত্র রাজনীতির চরমার্থ? তারই নাম কি সত্যাগ্রহের মূল ছাত্র-আন্দোলন? কই, ছাত্রদের বাসস্থান, পাঠতালিকা, ক্লাসের ব্যবস্থা—এ নিয়ে তো ব্যাপক ও সুচিন্তিত ছাত্র-আন্দোলন হতে দেখি না? কেবল পরীক্ষার পাশমার্ক কমাবার আন্দোলন এবং প্রশ্নপত্র শক্ত হয়েছে বলে খবরের কাগজে চিঠি লিখে কাঁদুনি গাইলে ছাত্রেরা মানুষ হবে? এমন কি এই-এ পরীক্ষা—যা শেষ পরীক্ষা এবং যাতে সব-কিছুই আসতে পারে—তাতেও ছেলেরা হল ছেড়ে চলে যাবে এবং খবরের কাগজে চিঠি লিখবে? ভবিষ্যতে যে ভয়ঙ্কর দায়িত্ব তাদের উপর এসে পড়ছে তা গ্রহণ করার মত শক্তি তারা অর্জন করতে পারবে? সেই কারণে, মনে রাখা দরকার মানুষ গড়ার কারখানা মানুষ মারার কারখানা হলে দুই-ই নষ্ট হয়। খুব গুরুতর উপলক্ষে ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু সেটা বৈশদ্দিন ব্যাপার হবে ওটা দেশের পক্ষে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের পক্ষে হিতকর নয়।

৮-১-৫৫

মাষ্টার মশাই

শ্রীঅহিসারঞ্জন ভট্টাচার্য

মাষ্টার মশায়ের বাড়ী ছিল উত্তর কলিকাতার কোন এক অঞ্চলে। নিজের সম্বন্ধে মাষ্টার মশাই কখনও বেশি কিছু বলতেন না,—তবে কখনও কখনও কোন দুর্লভ মুহূর্তে একটু আধটু বলতেন। সেই সময় শুনেছি, তাঁদের গ্রাম বন কেটে কলকাতায় বাস করতে হয়। প্রথম জীবনটি মাষ্টার মশায়ের ভালই ছিল—সেকালে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়ে সওদাগরি আপিসে ঢুকেছিলেন; কলকাতায় নিজের বাড়ী, স্ত্রী, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এবং বিধবা দিদিকে নিয়ে সংসার সুখে দুঃখে মন্দ চলত না। ছেলে হাসল, পুঁই পত্ত হল। ছেলে মেয়ে দুটো তখন নেহাৎ বাচ্চা, একটি বছর পাঁচ ছয়, আর একটী মাস দুতিন; দিদি নেহাৎ অথর্ব হয়ে পড়েছেন, চোখেও ভাল দেখেন না। সকলের নির্বন্ধাতিশয্যে, বিশেষ দিদির আগ্রহে, মাষ্টার মশাই পুনরায় সংসার করলেন। সেইটাই তাঁর কাল হল। নূতন গৃহিণীর স্বরূপ বুঝতে কয়েকদিন মাত্র লেগেছিল। অচিরেই দিদি কাশী যাত্রা করলেন, নূতন মায়ের চক্রান্তে মেয়েটির বার বছর হতে না হতে কোথায় এক অজ পাড়াগাঁয়ে নূতন মায়েরই এক আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল, এবং বছর দুয়েকের মধ্যে মামেরিয়া, শাশুড়ী ও নন্দ ম্যাণ্ড ভা কোম্পানীর লাইনা ও নির্যাতনে ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে পরে মারাই গেল। বাপ খবর পেলেন মারা যাবার অনেক পরে। ছেলেটি আই-এস্-সি পাশ করে বি-এস্ সি পড়ছিল; পড়াশুনায় সে ভালই ছিল। কিন্তু মা-মরা ছেলে হলে যা হয়, একটু বেশি মাত্রায় অভিমানী ছিল। সংসার নিগ্রহটা সহ্য করতে পারত না, প্রায়ই খিটি মিটি লেগে থাকত। এর জন্য মাষ্টার মশায়ের অশান্তি কম ছিল না। এই রকম একটা অশান্তির মধ্যে মাষ্টার মশায়ের মনটা তিক্তবিরক্ত, ছেলেটা সে সময় একটি জিনিস চেয়ে বসে। হাতে টাকা নেই, মনটা বেজায়—ছেলের আবদারে তিনি একটু খেঁকিয়ে ওঠেন। ছেলে আর কোন কথা বলেনি; কলেজে গিয়ে ল্যাবরেটরী থেকে বিষের শুঁড়ো সংগ্রহ করে বিকেলের দিকে গড়ের মাঠে গিয়ে লেটাই খায়। মাষ্টার মশায় খবর পান পরের দিন বিকালে, পুলিশের কাছ থেকে।

এপক্ষে এদিকে একটি ছেলে হয়েছিল। এই বয়সেই তার রকম সকম দেখে মাষ্টার মহাশয় বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তার সাজপোষাক, চলন বলন, নষ্ট আচার ব্যবহারে যে কোন বাপেরই ভাবনার কথা। কিন্তু তার মায়ের আদরে মাষ্টার মহাশয়ের কোন কথা বলবার যো ছিলনা—এক কথা বললে একশো কথা শুনতে হত। একদিন ব্যাপার উঠল চরমে। তিনি সেদিন তার একটী গর্হিত আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। এবারে যে শুধু মায়ের পোয়ে তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করল তা নয়, মায়ের ইঙ্গিতে পুত্রের হাতে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যমও খেতে হল। তিনি 'ধুত্তোর' বলে গৃহ ত্যাগ করলেন;—সেই যে গৃহ ত্যাগ করলেন, মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য কে কেমন আছে দেখতে যাওয়া ছাড়া আর ওমুখো হননি।

মাস কয়েক তিনি এ তীর্থ সে তীর্থ ঘুরেছিলেন—ভাল লাগেনি। ঘুরতে ঘুরতে শেষে পশ্চিমে আমাদের এই সহরে এসে পৌঁছেছিলেন। স্থানীয় ধর্মশালায় এক নবাগত বাঙালী যাত্রী এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুনে এখানকার সহৃদয় চিকিৎসক ডাক্তার মুখুজ্যেকে সঙ্গে করে বাঙালী বাসিন্দাদের

নেতারা গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে। ভদ্রলোক অজানা বিদেশে পড়ে আছেন, চিকিৎসা ও সেবার যথোচিত নেই বলে মুখুজ্যে মশাইয়ের কথায় লাহিড়ী মশায়ের বাড়ীতে তাঁর থাকবার জায়গা করে দেওয়া গেল। লাহিড়ী মহাশয়ের দিদি সে সময় ভদ্রলোকের খুব যত্ন করেছিলেন। এই সেবা যত্নের কথা মাষ্টার মশায় ভুলতে পারেন নি এবং চিরদিনই নিজের দিদিকে যেমন ভক্তি দেখাতেন সেই রকমই ভক্তি মেখিয়ে এসেছেন।

অসুখে পড়লে, মানুষকে পরনির্ভরশীল হতে হয়, আর মানুষ সে সময় একটু দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়ে। মাষ্টার মশাই এমনিতে কথা, বিশেষ করে নিজের কথা কম বলতেন। কিন্তু এই অসুখে তিনি নিজের খবর অনেক দিয়েছিলেন, অবশ্য ঠিকানাটি ছাড়া। তাই এসব কথা আমরা জানতে পেরেছিলাম।

মাষ্টার মশাই সেরে উঠে এখানেই রয়ে গেলেন, দেশে ফিরতে চাইলেন না। তাঁর বয়স তখন চল্লিশের কিছু এদিক ওদিক। লাহিড়ী মশাই, মুখুজ্যে ডাক্তার ও আমার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তাঁর ভাবও হল বেশ। কি করবেন গ্রামে কিছু দিন তাই জল্পনা কল্পনা চলল। মনিহারী দোকান থেকে সুরু করে হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিস পর্যন্ত সব রকম উপায়ই ভেবে দেখা গেল। শেষে অপ্রত্যাশিতভাবে জিনিসটার সমাধান হয়ে গেল। ভদ্রলোক একদিন নিজের খেয়ালেই লাহিড়ী মশাইয়ের ছোট ছেলেকে টেনে নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। তাঁর পড়াবার ধরণ দেখে লাহিড়ী মশাইয়ের দিদির মনে হল, এ দেশে সব হিন্দুস্থানী স্কুল। ছোট বাচ্চাদের বাড়ীতে বাঙলা পড়াতে হয়। তাঁকে দিয়ে একটা বাচ্চাদের স্কুল খোলালে কি হয়? তখনও এদেশে বাঙালী স্কুল হয়নি। সে কালের গিন্নীরা লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, আর কর্তারা যে যার কাজে ব্যস্ত, কাজেই বাঙলা লেখানোর বড় হাঙ্গামা ছিল। যাঁরা বড়লোক, গৃহশিক্ষক রেখে যা হয় ব্যবস্থা করতেন। মধ্যবিত্ত যাঁরা, তাঁদের ছিল মুস্কিল। এই ছোট সহরটিতে তখন এখানে বড়লোক ও মধ্যবিত্ত, চাকুরে, উকীল, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় কলেজের প্রফেসার মিলে পঞ্চাশ ষাট ঘর বাঙালী ছিলেন, আর সংখ্যায় কম বলে দলাদলিটা ছিল না বললেই হয়। লাহিড়ী মশায়ের দিদিকে সকলেই মান্য গণ্য করতেন—এক কথায় তিনিই ছিলেন এখানকার বাঙালীদের মুকুটহীন সাম্রাজ্ঞী। তাঁর প্রস্তাবটা সকলেরই মনঃপূত হল। সস্তাও হবে, সুবিধাও হবে;—ছেলে মেয়েগুলো অ আ ক খ, দুই একে দুই, দুই দুগুণে চার;—এসবও শিখবে আর তাদের মাহেশেরও দিবানিদ্রা বা দুপুরের মহিলা মজলিসের ব্যাঘাত হবে না।

চন্দ্র লাহিড়ী মশায়ের বাড়ীতে তাঁর ছোট ছেলে, তাঁর নেজ ভায়ের বড় ছেলে, আমি ও আমার ছোট ভাই, মুখুজ্যে ডাক্তারের দুই ছেলে আর উকীল শরদা বাবুর নাতনী এই সাতটি ছাত্র নিয়ে মাষ্টার মশায়ের প্রথম পাঠশালা বসল। চন্দ্র লাহিড়ী মশায়ের দিদির উৎসাহে এই স্কুল বসেছিল বলে তাঁর নামে নয়া উল্লাসে স্কুলের নামকরণ হল, "চৈতন্যিনী স্কুল-হার বেঙ্গলী স্কুল।" লাহিড়ী মহাশয়ের দিদি সহরসুদ্ধ বাঙালী বাসিন্দাদের সকলেরই দিদি ছিলেন। এই কারণে কিন্তু বাইরে স্কুলটার নাম ছিল "দিদির পাঠশালা", আর লাহিড়ী মশায়ের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল বলে আড়ালে লোকে বলত "চন্দর লাহিড়ীর পোয়াল।" অবশ্য খুব চলতি নাম ছিল, "দিদির পাঠশালা।"

এই "দিদির পাঠশালা"র মাষ্টার মহাশয় সেই থেকে একাদিক্রমে ছত্রিশ বছর চালিয়েছেন। সাত থেকে বাড়তে বাড়তে এক সময় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বাষট্টি পর্যন্ত উঠেছিল, আবার কমতে কমতে শেষ বছর শুধু মেটড়ীর পুত্র রোয়াকে দাঁড়িয়েছিল। লাহিড়ী মহাশয় ঘরখানি ছাড়া দুটো পুরানো সতরঞ্চি,

একটা হাতলভাঙা চেয়ার, প্যাকিং বাক্সর কাঠের উপর কালো রঙ দিয়ে তৈরী ফোল্ডিং করা একটা বড়োসড়ো ব্ল্যাক বোর্ড, একটা বেঁটে জলের জালা, ও সেটা রাখবার একটা লোহার স্ট্যাণ্ড, এবং জল খেয়ে গ্লাস ধোয়া একটা পোড়া বটি (হিন্দুস্থানী মহল্লার দোকানে এ রকম বটি অনেকেই দেখেছেন) দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েদের মাইনে যা হত, মাষ্টার মশায়ের খরচ বলে কওয়া হত। ক্রমশ ক্রমশ ছাত্র-ছাত্রী বাড়তে বাড়তে স্কুলের যখন একটা বেশ, যাকে বলে "রেসপেক্টেবল্", আয় হল, তখন ঠিক হল ঘর ভাড়া এবং ঝাঁট-পাট দেওয়া, জালায় জল তোলা, লাল্ সুরকো করার জন্ত চাকর ও তেলের খরচের জন্ত মাষ্টার মশাই এক্সনে হয় টাকা সাড়ে পাঁচ আনা নেবেন, আর বাকিটা তাঁর। যদি কোন সময় আয় ত্রিশের টাকার কম হয় তো এই টাকাটা তাঁকে দিতে হবে না। বাবুরা সকলে টাকা তুলে ফুচারখানা তক্তপোষ কিনি, চেয়ার টেবিল, একটা ছোট আলমারী, একটা টেবিল, একটা গ্লোব ও কয়েকটা ম্যাপ কিনে দিলেন। স্কুল বেশ চলতে লাগল।

মাষ্টার মশায়ের পড়ানোর খ্যাতি ক্রমে সঙ্গে তাঁর অনেক "প্রাইভেট ট্যুইশনি"ও জুটে গেল। ছোট ছেলেপিলেদের পড়াবার তাঁর একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। কাজেই তিনি একটু প্রতিষ্ঠিত হতেই খুব পড়াবার তাক আসত। ভদ্রলোক খাটতেও পারতেন বেশ। এক এক সময়তো দিনে রাতে স্কুলের কাজ ছাড়া গুটি পাঁচেক ছাত্র পড়িয়েছেন। তাঁর এখানে খুব যখন ভাল আসা, তখন তাঁর আয় দাঁড়িয়েছিল বেশ্ টাকার মতন। স্কুল বাসের হবার পর তিনি কাছেই একটা বাসা ভাড়া করে বাসা ঠিক করেছিলেন। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতেন, পরে আর পেরে উঠতেন না, একজন "মহারাজ" বা পাচক ব্রাহ্মণ রেখেছিলেন। মাস মাসের বালাই ছিল না, —কারু বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হলে অবশ্য তিনি খেতেন —মহারাজ যা সিদ্ধ পোড়া করে দিত তাই আনন্দ মনে খেতেন। এই মহারাজটিও জুটেছিল ভাল, এক চক্ষু কানা, ভীষণ অভিব্যক্তিক গ্রস্ত ও পিটপিটে, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী। সংসারে এরও কোন বন্ধন ছিল না, এক ভাগ্নে ছিল, তাকে মানুষ করে দিয়েছিল। সে এখন নয়া দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে নোকরী করে।—স্বাবলম্বী হবার পর সে মাষ্টারজীকে ছোড়াই কেয়ার করত; মাষ্টারজীরও তাতে কোন দুঃখ ছিল না। তার কর্তব্য সে করেছে; তার ভাগ্নের কর্তব্য তার ভাগ্নে দেখবে। সে মাষ্টারজীর আশ্রয়ে ভালই আছে। মাষ্টার মশাইকে মহারাজ সত্যই বেশ সেবা যত্ন করত। অসুখ করলে পথ্য করে দেওয়া, দেখাশোনা, আমাদের ধরে দেওয়া মুখুজ্যে ডাক্তারের ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ আনা —সব কিছুই করত। মাষ্টার মশায়ের সামান্ত অসুখ বিসুখে সেই দেখত, বেশি কিছু হলে—এ রকম দুচারবার হয়েছিল—আমরাই দেখা শোনা করতাম। তখন কথায় কথায় হাসপাতাল ছিল না, আর মেয়েরও টানও তো কিছু ছিল।

মাষ্টার মশায় জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ, যদিও খুব বেশি গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। একটু বেশি নস্তিমে এলে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে—যদি খুব বেশি সংখ্যক বাঙালী সেখানে না থাকে—গোঁড়ামি পাবেন না, যদিও ধর্মপ্রাণতা পাবেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন, টুকি টাকি ষষ্ঠী পূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদিতে মাষ্টার মশায়ের আহ্বান আসত, আবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি আমার জন্ত ছেলে-পিলেদের ছোটখাট অসুখে-বিসুখে বিনামূল্যে চিকিৎসাও তিনি করতেন। তাঁরিফী চেহারা, সদাহাস্যময় এই মানুষটিকে সকলেই ভাল বাসত।

এই ছত্রিশ বছরের মধ্যে মাষ্টার মশাই খুব কমই বাড়ী গেছেন। সেই যে মনের দুঃখে বাড়ী ছেড়েছিলেন, কালক্রমে তার তীব্রতা হয়তো কমে

এসেছিল; কিন্তু নূতন আবেষ্টনের উপর তাঁর এমনই মায়া পড়ে গিয়েছিল যে তিনি এসব ছেড়ে যেতেও চাইতেন না, গিয়েও স্বস্তি পেতেন না। আমরা মাঝে তাঁর হাঁড়ির খবর রাখতাম, বাড়ীর কথা তাঁর কাছে উত্থাপন করতাম না; পরে যাঁরা এসেছিলেন ও ভিতরের খবর জানতেন না, তাঁরা মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ীতে কে কে আছে, দেশে যান না কেন ইত্যাদি কথা তুললে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসিটি হেসে কথা এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়তেন। তাঁর বুকের এই ঘায়ের ব্যথা কমে এলেও যা কোনও দিন শুকোয়নি।

আমরা পরে এদিক সেদিক থেকে শুনেছিলাম, মাষ্টার মশায়ের বাড়ীর জন্য খুব ভাবনার কারণ ছিল না। এপক্ষের ছেলেটি দুর্বিনীত, অবাধ্য, অশিক্ষিত ও গোঁয়ার ছিল, এমনকি বয়সে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলও হয়েছিল, কিন্তু একেবারে বয়ে যায়নি। শেষে কি একটা কলকারখানায় কাজ করেও রোজগার করেছিল। তার মা যতই মুখরা ও কলহপ্রিয়া হোন, শক্ত লোক ছিলেন। বাস করবার বাড়ীটাও ছিল। তার একতলার ঘর কয়েকখানা ভাড়া দিয়ে আর ছেলের আয়ে মোটামুটি সংসারটা চলে যেত। মাষ্টার মশাই যান আর না যান, নিজের আয়ের সুরাহা হতে এখান থেকে কিছু কিছু পাঠাতেন। ছেলেটা রোজগার করতে শিখলে তার মা তার বিয়েও দিয়েছিলেন। শুনেছিলাম, বৌটিও এসেছিল লক্ষ্মী শান্তশিষ্ট, কাজকর্মে পাকা, মুখ বুজে সব যন্ত্রণা সহ্য করে। মাষ্টার মশাইকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে দুচোখে দেখতে পারতো না, কিন্তু দেশে গেলে এই বউটি তাঁর সেবা যত্ন করতো খুব। আসবার সময় মাষ্টার মশাই তাঁকে শাড়ি টাড়ি কিনে দিয়ে আসতেন, হাতে কিছু পয়সাও দিতেন। দুর্বল মুহূর্তে এক-আধবার তাঁর মনে হোত তাকে দু'চার দিনের জন্য নিয়ে আসেন, কিন্তু স্ত্রীপুত্রের ভয়ে কোন দিন পারেন নি। এপক্ষের দুটিমাত্র সন্তানই মাতৃভক্তী হওয়ায় কখনও পেরেছিলাম, কিন্তু সাহস করে তা বলতে পারব না। মাষ্টার মশায়ের দেশে যাওয়ার খুব বেশি আকর্ষণ না থাকলেও কেন যেতেন তার একটা কারণ একদিন বলেছিলেন;—তাঁর শোবার ঘরের জানলার ধারে একটা অশ্বত্থ গাছ ছিল। গাছটা সরকারি জমিতে না হওয়ায় কর্পোরেশনের কুঠার তার উপর ওঠেনি। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গাছের পাতার ঝিকিমিকি ছায়া ওই জানলা দিয়ে তাঁর ঘরে পড়ত। এই ছায়ার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর ভয়ানক মন কেমন করত;—তিনি থাকতে পারতেন না,—দেশ ঘুরে আসতেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই ঘরে তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলেটি পড়াশুনা করত।

তাঁর দেশ থেকে ফিরে আসাটা স্মরণীয় ব্যাপার। ষ্টেশন থেকে একায় তিনি আসছেন দেখলেই বাঙালী ছেলে বুড়ো সকলে হুহাত তুলে নমস্কার করে কুশল জিজ্ঞাসা করত; বাড়ীতে পৌঁছতে না পৌঁছতে সাহিত্যী মহাশয়ের দিদি (যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন তার পর তাঁর স্ত্রী) লোক পাঠিয়ে তাঁদের বাড়ীতে আনাতেন স্নানাহার সারবার জন্য। স্কুল ঘরে গেলে ছেলেদের সে কি তোড়জোড়। কেউ নমস্কার করছে, প্রণাম করছে, কেউ হাত ধরে টানছে, কেউ কাঁধে উঠছে, কেউ বা হি হি করে অকারণ হাসছে, আবার কেউ বা বকবক করে পেটের ভিতর যত কথা ছিল খালি করছে। মাষ্টার মশাইকে ছেলেমেয়েরা অসম্ভব ভালবাসত। তাঁকে কোনদিন কাউকে মারতে ধরতে দেখিনি, বেতও এক গাছা বেত তাঁর হাতে থাকত সব সময়, এবং মাঝে মাঝে টেবিলের উপর তিনি সেটা আছড়াতেনও সশব্দে। খুব বিরক্ত হলে তিনি ব্যাট-ও-ও-ও বলে বিকট এক হাঁক পাড়তেন—তাতে কিছুক্ষণের জন্য ক্লাসঘর একটু চুপ করত। খানিক পরে আবার যে কে সেই। এরি মধ্যে তিনি পড়া নিতেন, পড়া দিতেন, লেখাতেন, অঙ্ক কষাতেন। তখনকার দিনে নিদেবাদের ঝঞ্ঝাট ছিলনা। মাষ্টার মশাই যে

কদিন কলকাতায় থাকতেন, ভাল ভাল স্কুল কলেজের ক্লাসে কি পড়ায়, কি তাদের পাঠক্রম, সে সব খোঁজ খবর নিতেন; আসবার সময় তাদের বুকলিষ্ট ও সেই অনুযায়ী কিছু কিছু বইও আনতেন। এতে আমাদের বইয়েরও অভাব মিটত, সিলেবাসের ভাবনাও চুকত।

মাষ্টার মশাই বেঁটে খাটো মোটা মানুষ ছিলেন, মাথায় কিছুটা টাক ও কাঁচা পাকা চুল, গাল দুটি তোলা তোলা, চোখ দুটি ভাসা ভাসা, মুখে সব সময়ই হাসি, শরীরের তুলনায় খাটো হাত পা—এই আমাদের মাষ্টার মশাই। ধুতি, গলাবন্ধ কোট ও চাদর, পায়ে চটি, হাতে ছাতা, মোটামুটি এই তাঁর পোষাক। পায়ে হেঁটেই যেতেন, দূর থেকে সাদা কালো তালিমারা ছাতা দেখলেই বুঝতে পারতাম মাষ্টার মশাই আসছেন। শীতকালে পায়ে মোজা পরতেন, আর চটির বদলে এনটি জুতো, চাদরের বদলে চৌখুপী তোয়ালে, ও মাথায় কানঢাকা টুপি। শীতে হাত পা তাঁর খুব কাটত, চিন্ময়েও খুশতেনও খুব, কিন্তু বসানো হাতে দিতে দেখিনি। খুব বেশি কিছু হলে ছাত্রের বাড়ীতে পড়াতে বসে একটু স্নিগ্ধাধিত চোখে হাতে মাখতেন। তাঁর চায়ের নেশা ছিল—পড়াতে এসে এক কাপ চা পেলে পরম আপ্যায়িত হতেন। সহধর্মিণী ছিল তাঁর অসাধারণ, মাষ্টারিক বেতন অল্পান বদনে সংসার পেছেন। তাঁর সংসারের খরচে তাঁর মানসিক সহ শক্তির তারিফ আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। ছেলে পিলেদের যে সব উৎপাত তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন, আমরা হলে তো পাগল হয়ে যেতাম।

ছত্রিশ বছরে তিনি অনেক ছেলেমেয়েকে মানুষ করে দিয়েছেন—এটাই ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় গৌরব। তাঁর ছাত্রদের সকলেই মানুষ হয়েছে, করে কর্মে খাচ্ছে, এতে তাঁর বড় আনন্দ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, অধ্যাপক, উকীল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী, আই-সি-এস্, বি-সি-এস্, ছোট বড় সরকারী চাকুরে, অনেক কিছু রয়েছে। তিনি সকলের খবর রাখতেন ও বলে নিতে পারতেন—এক কথায় তিনি তাঁর ছাত্রদের ছিলেন জীবন্ত Who's who বিশেষ। যেন মশায়ের ছেলে সেদিন বিলাত থেকে আই-সি-এস্ হয়ে ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পায়ের ধুলা নিতে এল, আনন্দের আতিশয্যে তাঁর চোখে জল এসেছিল। এই ছেলেটিই আবার ঘুরে ফিরে সময়ের অফিসার হয়ে এই সহরে কিছুদিন বদলী হয়েছিল। সে যে ছত্রিশ বছর ছিল, মাষ্টার মশাইয়ের নিয়মিত খোঁজ খবর নিত, স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করত, এমন কি, তার শিশুটিকেও এই স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। মাষ্টার মশাইয়ের জীবনের সেই এক মহা গৌরবময় অধ্যায়। এদের কথা উঠলে বলবার এই ব্রাহ্মণটিকে বাক্‌সংযম হারাতে দেখেছি। তাঁর ছাত্ররাও তাঁকে শুধু যে যথাযোগ্য সম্মান দিত, তা নয়, তাদের অভিভাবকেরাও দিতে কার্পণ্য করতেন না। বাংলা দেশ থেকে অনেকটা দূরে হওয়ায় শিক্ষকের মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়া বিদ্যাটা এদেশী বাঙালী ছাত্ররা তখনও রপ্ত করতে পারেনি।

চিরদিন কারো সমান যায় না, এই স্কুলে সহরেরও যায়নি। আস্তে আস্তে দূর বড় হয়েছে—লোকও বেড়েছে। সরকারি দপ্তরের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবাগত বাঙালীর সংখ্যাও বেড়েছে। প্রথম প্রথম এতে স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। তারপর যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল, তখন ঘটল বিপদ। কয়েকটা মিলিটারি আপিস এই সহরে বসল, আর বাঙালীর সংখ্যাও এক লাফে হাজার দশেক থেকে কয়েক হাজারে বেড়ে গেল। এখন যাঁরা এলেন, তাঁদের সঙ্গে আর আমাদের খাপ খায় না। আমাদের তাঁরা বলেন, এরা আবার বাঙালী! খোট্টার দেশে থেকে সব খোট্টা বনে গেছে, নাম জিজ্ঞাসা করুন, বলবে'খন, হাজার নাম মহীন্দর নাথ আছে, তাঁর পিছে চাটুয্যি

কী আছে। স্কুলের নিরীহ মাষ্টার মশাই প্রথম প্রথম তাঁদের অনুকম্পার পাত্র ছিলেন; অনুকম্পা বেঁচিয়ে যদি তাঁকে ছেড়ে দিতেন, মাষ্টার মশাই, স্কুল ও স্কুলের কয়েকটা ছেলেমেয়ে রক্ষা পেত। কিন্তু তাঁরা শুরু করলেন ক্ষতি করতে—নানাভাবে।

স্কুলের ক্ষতি প্রথম হল, চন্দ্র লাহিড়ী মারা যাবার পর। দিদি এর অনেক আগেই গত হয়েছিলেন, স্কুল যখিন আরম্ভের কাল সেই "দিদির পাঠশালা" নামেই খ্যাত ছিল। দিদি মারা যাবার পর মেজ বৌদি অর্থাৎ চন্দ্র লাহিড়ীর স্ত্রী তাঁর স্থান অধিকার করে সব দেখা শোনা করতেন। চন্দ্র লাহিড়ী মশায় মারা গেলে তাঁর আর কর্তৃত্ব রইল না। চন্দ্র লাহিড়ীর বড় ভাইয়ের ছেলে মীরাটে না কোথায় কাজ করতেন—তিনি এসে বিষয়ের ভাগ বাটোয়ারা দাবি করলেন। সুরু হল মামলা। এই মামলার ঘংযো স্কুল ও-বাড়ী থেকে ওঠাতে হল; কোথায় যায়! মুখুয্যে ডাক্তার তখন গত হয়েছেন; সেন মশাই পুত্রের কর্মস্থলে। পাড়ার মাতব্বরদের কেউ গত, কারো বাবার দশা, কারো বা এত বড় পরিবার যে জায়গা নেই। শেষে আমাদের পিছন মহলের একটা ঘর মাষ্টার মশাইকে ছেড়ে দেওয়া হল। সরু গলি দিয়ে অন্দর মহলে ঢুকে অনেকটা গেলে এই ঘর। পশ্চিমের পুরানো বাড়ী সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে, তাঁরা বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। ঘরটা লম্বা খুব, কিন্তু চওড়ায় কম, নীচু আর ঘুপচি ঘুপরি আলো। এই ঘরে বাবা হয়ে মাষ্টার মশাইকে অনেকদিন ক্লাস বসাতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ ছেলে আসত লাহিড়ী মহাশয়দের পাড়া থেকে—ও দিকটাই পুরানো বাঙালী পাড়া। এ জায়গাটা একটু দূর বলে ছাত্র সংখ্যা কমতে সুরু করল, তারপর ঘরটা সকলের পছন্দ নয়। আমাদের পক্ষেও ছেড়ে দেবার মত ভত্ত লম্বা ঘর একতলায় আর ছিল না। কি করব!

অনেক মামলা মোকর্দমার পর লাহিড়ী পরিবারের মামলা খামল, বাড়ী ভাগ হল—বার বাড়ীটা পড়ল লাহিড়ী মশায়ের বড় ভাইয়ের ছেলের ভাগে। তিনি টাকা পয়সা পুরো বোঝেন, বাকীর সুরাহা করে তাড়া দিয়ে চলে গেলেন। কাজেই বারবাড়ীর সে ঘর আর পাওয়া গেল না। মেজ-বৌদির অর্থাৎ চন্দ্র লাহিড়ী মশায়ের ভাগে বিরাট অন্দর মহলের একটা অংশ পড়ল। তাঁর অনেক কচিকাচা, দেখবার শোনবার অভিভাবকও নেই, কাজেই তাঁর আগের ঘরের অভাবসত্ত্বেও স্কুল তাঁর ওখানে আবার উঠে গেল। ভিতর বাড়ী ঢোকবার দরজার ডান দিকে বৈঠকখানা ভাঙা দেউড়িটাতে—প্রায় ঘরের মতই সেটা ছিল—ভাঙা তবল দেকি লাগিয়ে আবার "দিদির পাঠশালা"র কাজ চলতে লাগল। কিন্তু সেই যে স্কুলের ভাঙন লেগেছিল, তা আর জোড়া লাগল না, একটু একটু করে ছাত্র সংখ্যা কমতে কমতে শেষে শূন্য কোঠাকেই ধরে গেল।

এই সময়ের আগেও বাঙালী বাসিন্দাদের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সহরের নানা উন্নতিও পরিস্ফুট হতে লাগল। প্রথম হল একটা দুর্গাবাড়ী। সেখানে বারোয়ারী দুর্গাপূজা হবে, ক্লাবগুলোরও নিজস্ব আড্ডা হবে এবং থিয়েটারের রিহার্সাল দেওয়া ও তাস পেটানোর আস্তানা হবে। বাঙালীর কৃষ্টির চরম নিদর্শন দলাদলিও এই দুর্গাবাড়ী পরিচালনার ব্যাপারে বেশ প্রকট হল। সহরের মুরীদের কিছু পুরাতন অধিবাসী ও নূতন অধিবাসী মিলে একটা বেঙ্গলী হাইস্কুলের জন্য অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে শেষে দুর্গাবাড়ীতে একটা বেঙ্গলী প্রাইমারি স্কুল খুললেন এবং দু'চার বছর পরে সেটা চালু হলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে গ্র্যান্টও বেশ কিছু পাওয়া গেল। বন্দোবস্ত ভাল, বেতন নাম-মাত্র, প্রাইমারী শিক্ষাটা অবৈতনিক ছিল, কিন্তু খরচ চলত না বলে অভিভাবকদের কাছ থেকে চাঁদার ছদ্মবেশে বেতন সামান্য কিছু নেওয়া হত। অন্যান্য সুবিধাও অনেক, ছাত্রছাত্রীদের বাড়ী থেকে

নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে সর্বোপরি মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক "রেকগ্নাইজড্" (recognised), কাজেই "গিন্নির পাঠশালা" ছেড়ে সকলে ওখানেই ছেলে মেয়ে পাঠাতে লাগলেন।

এতেও টুকটাক্ স্কুল চলত, যদি না কয়েকজন প্রত্যক্ষ ভাবে স্কুলের পিছনে লাগতেন। নূতন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা এই স্কুলের ঐতিহ্য জানতেন না, সুতরাং এই স্কুলের পিছনে লাগাটা তাঁদের পক্ষে আশ্চর্যের কিছু নয়; কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহ-প্রবণ মনে খুব লেগেছিল, যখন তাঁরই কয়েকটি পুরাতন ছাত্র এসবে যোগ দিল। প্রথম প্রথম শুরু হল—ওটাকি একটা স্কুল? এরকমই মাষ্টার, পণ্ডিত, চাকর, সব কিছু; না কমিটি না কিছু; আবার প্রাইমারি স্কুল যদি তো বেতন লাগবে কেন? এই সব জানি স্কুল ফুলানি ক্রমশ উচ্চতর স্তরে উঠতে লাগল। মাষ্টার কি আর পড়াতে পারে? সেকালের এন্ট্রেন্স কেস, একেবারেই আন্-কোয়ালিফায়েড্ (Unqualified); অবিশ্যি অনেকদিন পড়িয়ে পড়িয়ে পড়ানটা সড়গড় হয়েছে বটে, আর লোকটা হার্মলেস (harmless)—কিন্তু এখুনে এসব মাষ্টার অচল। লোকটা না জানে বিজ্ঞান, না জানে হিন্দী, না জানে আধুনিক অনেক বিষয়। পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়েছে ভদ্রলোক তার কিছুরই খবর রাখেনা, পঞ্চাশ বছর আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, ওর কাছে পৃথিবী সেই অবস্থাতেই থেমে আছে। ওর কাছে ছেলেপিলেকে পড়তে দিলে শুধু যে শিখবে না তা নয়, যা শিখবে তাও ভুল শিখবে। হাতুড়ে বদ্যিদের মত এও একরকম কোয়াক্ (quack) শিক্ষক, এদের হাত থেকে তাড়াতাড়ি খলাস হয় ততই দেশের শিক্ষার পক্ষে মঙ্গল।

মাষ্টার মশাইয়ের কানে এসব কথা পৌঁছলে তিনি একটু বিষণ্ণ মৃদু হাসি হেসে বলেছিলেন, যাবার, আমার যুগ গেছে। পৃথিবী এখন যে বেগে অগ্রসর হচ্ছে তার সঙ্গে তাল রাখা আমার কর্ম নয়, আমি পারবও না। এখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবার আমায় ছুটি নিতে হবে। ছুটি তিনি অবশ্য নেন নি, যতদিন একটিও ছাত্র ছিল, তিনি ততদিনও খপ্‌খপে শরীর নিয়ে টুকটুক্ করে স্কুলে এসে কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থেকেছেন, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মেজবৌদিদের ঝুলগুড় নিয়ে বাসার দিকে পা বাড়িয়েছেন। তাঁর আমলের প্রায় সকলেই গত হয়েছিলেন, মুখুজ্যে ডাক্তার, চক্র লাহিড়ী, সবাই। আমার জ্যাঠামশাই অতিবৃদ্ধ, কাণে ভাল শোনেন না। কখনও সখনও তিনি তাঁর কাছে এসে চুপ্‌চাপ বসে থাকতেন, কখনও বা আমার ডাক্তারখানায় বা অন্য কোনও পুরাতন ছাত্রের বৈঠকখানায় এসে একটু বসতেন। বলতেন, এখানে বসলে বড় শান্তি পাই। বেশি কথা বলতেন না, খানিকক্ষণ বসে আবার লাঠি বাগিয়ে ধরে বাসায় চলে যেতেন।

মাষ্টার মশাই কিরকম স্নেহপ্রবণ ছিলেন তার একটা গল্প বলছি। আমি ডাক্তার হয়ে বসে প্রথম মাসের পসারের টাকা দিয়ে তাঁকে একটা গরম কোট করিয়ে দিয়েছিলাম। কোটটা পেয়ে তাঁর কি আনন্দ! এই কোটটি ছাড়া শীতকালে তিনি অন্য কোট গায়ে দিতেন না। বহুব্যবহৃত শত তালিমারা অসংখ্য বিপুলকায় এই কোটটি তাঁর ছাত্রদের মতই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা কোট করাবার মত তাঁর সঙ্গতি নিশ্চয়ই ছিল, আমিও কয়েকবার নূতন কোট করিয়ে দিতে চেয়েছি—তিনি রাজী হননি। তিনি বলতেন, ওরে, তোর প্রথম রোজগারের কোট এটা, আমার কাছে এর কি মূল্য তোরা কি বুঝবি? তাঁর মনে কৃতজ্ঞতা বোধ ছিল অসীম। লাহিড়ী বাড়ীর উপকারের কথা তিনি কোনও দিন ভোলেন নি, আর কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য সব সময়ে বাইরে জুতো খুলে সে বাড়ীর অন্দরমহলে ঢুকেছেন।

কাজেই তাঁরই কয়েকটি নিকর্মা ছাত্র যখন এসব আন্দোলন সুরু করল, তখন তাঁর মনে আঘাত লাগল খুব। সেইসঙ্গে ক্ষতিটাও হল অবশ্য যথেষ্ট। এখানকার একমাত্র হাইস্কুল, মিশনারী স্কুলের সাহেবেরা তাঁর স্কুলের কোন ছাত্র টান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আসলে তিনি যে ক্লাসের উপযুক্ত বলে লিখে দিতেন, সেই ক্লাসেই ছাত্রটিকে ভর্তি করে নিতেন। এর পরে এখানে আর একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক শেঠের বদান্যতায়। কানাঘুষায় আন্দোলন সরব হয়ে যাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লে আর কোন স্কুলই এই দাক্ষিণ্য দেখাত না, নূতন ছাত্র হিসাবে রীতিমত পরীক্ষা করে নিত। এই ফ্যাসাদ এড়াবার জন্য অনেকে আর "দিদির পাঠশালা"র ধার মাড়াতে চাইতেন না। তার উপর, সদ্য প্রবর্তিত শিক্ষাবিভাগ ও পৌর শাসন কর্তৃপক্ষ আইন কানুনের নানা শব্দভেদী অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন। মুমূর্ষু স্কুলটিকে আর কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা গেলনা।

স্কুলের শেষ ছাত্রটি চলে যাবার কয়েকদিন পরে মাষ্টার মশাই অসুখে পড়লেন। অসুখটা কয়েকদিনেই বেঁকে দাঁড়াল। আমরা বুঝতে পারলাম, এ যাত্রায় আর রক্ষা নেই। আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করলাম তাঁকে সুস্থ করে তুলতে। তাঁর সেই মহাযাত্রা—সে শেষের বছর কটি মাইনে না পেয়েও তাঁকে ত্যাগ করে যেতে পারেনি, এমন খুব সেবা করেছিল। "দিদির পাঠশালা"র মায়া ছেড়ে চলে গেলেন।

সেও বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেজ বৌদিও আপন আত্মীয়ের মত দেখাশোনা করেছিলেন। খবর পেয়ে পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই এসেছিল। অবস্থা যখন খারাপের দিকে যাচ্ছে, যেজ বৌদি প্রস্তাব করেছিলেন, মাষ্টার মশাইয়ের স্ত্রী-পুত্রকে খবর দেওয়া হোক। সেই অবস্থাতেও মাষ্টার মশাই প্রতিবাদ করে বলেছিলেন,—না, না, তাদের খবর দিতে হবে না।—তারপর আমাদের দিকে কম্পমান দুর্বল হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, এই তো আমার সব ছেলেরা এখানে রয়েছে! আমরা অন্ত অবস্থা ঘোরালো হতেই ঠিকানা খুঁজে খবর দিয়েছিলাম। দিন কয়েক পরে তিনি প্রলাপ বকতে সুরু করলেন। চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের দিদি ও নিজের দিদিকে মিশিয়ে ফেলে অনেক আবোল তাবোল বকতে লাগলেন। কখনও কখনও জ্ঞান হত, তিনি আমাদের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতেন। আবার খানিক পরেই ভুল বকতে সুরু করতেন। একবার আমাকে ডেকে বললেন, সখীকে বলিস, তার জন্য আলমারিটা কিনে নীচের ঘরে রেখেছি, পরে এক সময়ে যেন উপরে নিয়ে যায়। সখী তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে, একটা বুকখোলা আলমারির তার বড় সখ ছিল তার, আর সেইটা কিনে না পেয়ে সে আত্মহত্যা করে।

কয়েকদিন পরেই মাষ্টার মশাই আমাদের ও

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

৩

বৌদ্ধযুগের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি পরিত্যক্ত হয়। নব হিন্দুযুগে আমরা শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব দেখিতে পাই। প্রাচীন উদার নীতির স্থানে শৈব, বৈষ্ণব ও জৈন সম্প্রদায় পরস্পরের বিরোধী শিক্ষা প্রচারে এক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার সময়ে অন্য সম্প্রদায় হননের প্রমাণ উক্ত আলেখ্যের Some Contributions of South India to Indian Culture নামক পুস্তক হইতে পাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজ মতপ্রচার প্রমের প্রতিষ্ঠার দ্বারা কৃষির উন্নয়নের দ্বারা ঐ সকল গ্রামের বিদ্যালয়ের পরিচালনেও প্রমাণ পাওয়া যায়। Madras Epigraphic Records, (727 of 1922), Vijaynagar The Organ of the City and Empire 81, 41. 113, 114, 168) নামক পুস্তকদ্বয় রাজকীয় সাহায্যের প্রমাণ মিলেও রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের কোন প্রমাণ নাই।

শেষোক্ত পুস্তক হইতেও দেখা যায় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধাংশকাটে বিজয়নগর রাজ্য কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক ছিল না। উত্তর ও মধ্যভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের ও আশ্রমের কেন্দ্র হইল দুর্গম ও নগর হইতে সুদূর গ্রামে, কারণ তাহা না হইলে অন্য ধর্মবিরোধী ইসলাম হইতে তাহাদের নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইহার ফলে মুসলিম ভারতে বিদ্যালয়গুলির যোগসূত্র স্বভাবতই নষ্ট হইল এবং যে আশ্রমগুলি রহিল তাহারা হিন্দু সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ধর্মচর্চাকে তাহাদের মূল লক্ষ্য করিল। ইহারই ফলে ব্রাহ্মণ শতাব্দীতে যে ধর্ম আন্দোলন দেখা দিল তাহার লক্ষ্য ছিল পারলৌকিক মুক্তি। যদি কালোপযোগী শিক্ষার প্রবর্তনদ্বারা এই বিদ্যালয়গুলিতে ইহলৌকিক সমস্যার আলোচনার অবসর থাকিত তবে হয়ত এই অনুষ্ঠানের অনতিকাল পরেই বৈদেশিক অভিযানে আঘাতপ্রাপ্ত দুর্বল মৃতপ্রায় পাঠান রাজ্যের স্থানে একটা হিন্দু রাজ্যের অভ্যুত্থান অসম্ভব হইত না। কিন্তু কেবল পরলোকের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হিন্দু সমাজ সে সময়ে এই সুযোগ উপেক্ষা করিল।

মুসলিম শিক্ষাদের দুই প্রকারের ছিল। নিম্নশিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে মক্তব ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে মাদ্রাসা বলা হইত। অমীর মহম্মদ আফজ Lives and Conditions of the People of Hindustan. 1200–1550 B C) ও ইবিবুল্লা (Foundations of Moslem Rule in India) পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে দাসবংশের আভিজাত্য গৌরব না থাকায় মুসলিম ধর্মের তত্ত্ব উদ্ঘাটনের সরলে আনিবার জন্য কুতবুদ্দিন ঐবকুতবাস ও ইলবরী এই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যভার বিচারসচিব সাদার-উস্-সাহরের হাতে ছাড়িয়া দেন। তাবাকৎ-ই নাসিরী (১-৫৫৯) তারিখ-ই-ফিরোজ শাহ (১-১১০ হইতে (১১২ এবং ৫৭০) সিরাসৎনামা (৫৪) ফেরিস্তা (৩-৪৩, ৩-১৫৭, ৪-৫৮, ৪-১৫৭, ৪-২৭৩, ৪-৩৮৪ ও ৪-৪৩০) হইতে আমরা দেখিতে পাই যে দাস বংশের পর কেবল ফিরোজশাহ ব্যতিরেকে অন্য পাঠান সুলতান যা বঙ্গ, জৌনপুর, মুলতান, কাশ্মীর, মালওয়া বা খান্দেশের মুসলিম রাজবংশ সাধারণ ভাবে বিদ্যালয় স্থাপনের কোন চেষ্টাই করেন নাই।

অবশ্য ইহার অর্থ নয় যে বিদ্যানুরাগের প্রমাণ নাই বা বিদ্যালয় স্থাপনা কেহ করেন নাই। বাংলার হুসেন সাহ বা জৌনপুরের শার্কী বংশের কয়েকজন রাজা ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা অবশ্যই করেন। নিকিটিন নামক একজন রাশিয়ান পরিব্রাজক বাহমনী রাজ্যের মতো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিলেও পরবর্তী কালের বিজাপুর বা গোলকুণ্ডা, আহমদনগর বা বিদর রাজ্যে (ব্যক্তিগত দান বাদ দিয়া) শিক্ষাবিস্তারের কোন সুপরিচালিত পরিকল্পনা দেখা যায় না।

মোগল রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রমাণ আইন-ই-আকবরী, রিমনস্ট্রেটিক ফ্রান্সিস্, (Remonstratic Francis) বা সার্পী মুস্তাদির খাঁর বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে সদার-উস-সাদুরের নিয়োগ আকবর, জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেবের সময়েও হইত। মুতাক্ষরীন (১-৬৪) ফরুক শিয়ারের সময়েও ইহার নিদর্শন দেখাইয়াছেন। তবে তৎকালীন অন্য মুসলমান রাজ্য বঙ্গ বা অযোধ্যা, নিজামের রাজধানীতে বা হায়দরের মহীশূরে কোন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিকল্পনা ছিলনা, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে বাংলার মুর্শিদ কুলী খাঁ, অযোধ্যার মনসুর শাহ বা নিজাম আসফজা বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

মুসলিম যুগের অন্য ইতিহাস, যথা ইশ্বর প্রসাদের Central Structure of Mogul Empire, আশরফের Cultural Aspects of Muslim Rule in India, কুরেশীর Administration of Sultanate of Delhi, Elliot and Dawson এর History of India as told by Historians, Francis Gladwin এর History of Jahangir, শ্রীসরেন্দ্র সাহার Promotion of Learning in India during Mohammadan Rule ও সার যদুনাথ সরকারের Mogbul Administration ও বার্নীয়ারের আত্মজীবনী এই মতবাদই সমর্থন করে।

শিবাজীর সময় হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্যই করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা প্রণালী নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই করে নাই। সভাসদ্ আনন্দ ও চিৎনিস বেকারের শিবদিগ্বিজয় (২৪৩-২৪৫) ও শিবাজীর মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত English Records of Sivaji (৪-৩৭৬) হইতে আমরা শিবাজীর শিক্ষানিরপেক্ষ নীতি ও শিক্ষায় সাহায্যের প্রমাণ পাই। পরবর্তী যুগে যে এই নীতিই প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেনের Administrative System of the Marhattas নামক পুস্তকে আছে। পেশোয়াগণ দক্ষিণা বা বৃত্তি সাহায্যে বিদ্যায়তনগুলিকে সাহায্য মাত্র করিতেন কিন্তু কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। সর্বদা রণক্ষেত্রে থাকায় তাঁহাদের সময়ও ছিলনা। শ্রীযুক্ত ডি সি সারকার Transformation of Sikhism (১৩৮-২৩১ ও ৩০২) ও কানিংহাম History of Sikhs (পৃষ্ঠা ২২২) নামক পুস্তকদ্বয়ে দেখাইয়াছেন যে পূর্বযুগের বাধশাহীসভা ও পরবর্তী যুগের রণজিৎ সিংহের শিখ সাম্রাজ্যও কোন সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ রাজকোষের অর্থের অধিকাংশ সেনারক্ষায় ব্যয় করিতে হইত। মধ্যযুগের ইতিহাসের বিশদ আলোচনায় দুই কারণ।

প্রথমত প্রাচীন ভারতের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এস্ কে দের (Educational System of Ancient Hindus) উইন্টর বার্নিৎজের মুখোপাধ্যায় (Ancient Indian Education) বা আল্টেকার (Education in Ancient India) প্রভৃতি যেরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন সমগ্রভাবে মধ্যযুগের শিক্ষানীতির আলোচনা করিয়া সেরূপ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত এই যুগে রাষ্ট্রশক্তির পতন ও অভ্যুত্থান খুবই ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় দুএকজন মুসলিম সুলতান বা মোগল বাদশাহ

ব্যতিরেকে প্রত্যেকেই আপন আপন রাজ্যশাসন এত ব্যস্ত ছিলেন যে কোন সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতির পরিচালনা অসম্ভব ছিল। মুসলিম রাজা সাধারণত সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি উদাসীন ছিলেন ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-বিদ্যালয়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। কাশী বা মিথিলা, নবদ্বীপ বা কাঞ্চিভরম্ এক অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। কোন স্থানে হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থান হইলেও রাজারা এই নিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তন করেন নাই, শুধু রাজসাহায্যে কোন কোন বিশেষ বিদ্যালয়ের পুষ্টি সাধন করিয়া ছিলেন মাত্র। তবে প্রত্যেক বিদ্যালয় নিঃস্ব ও সাধারণত হিন্দুবিদ্যালয় আবাসিক ছিল। মুসলিম বিদ্যালয়গুলি আবাসিক ছিলনা।

এই পটভূমিকায় আমরা যদি ইংরাজি বিদ্যালয়ের অভ্যুত্থানকে দেখি তবে হয়ত তাহাদের ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা কারণ বুঝিতে পারিব।

(৪) বৃটিশ শিক্ষা প্রণালীর পূর্ব ইতিহাস

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী, বিশেষ করিয়া বৃটিশ শিক্ষাপ্রণালী যে জোর করিয়া ভারতের উপর চাপানো হইয়াছে তাহার পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই গ্রীকযুগে দুই বিপরীত-ধর্মী শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন ছিল। স্পার্টার শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ও এথেন্সের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিত ছিল। এথেন্সে প্লেটো (Republic ৪-৪১৮ হইতে ৪২০ ও Laws ৭৯৭, ৮০৩ ও ৮১০) যেমনভাবে এরিষ্টটল (Politics ৭) রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষানীতির সমর্থন করেন। Konye তাঁহার Discovering Plato, Livingstone তাঁহার Greek Ideals of Modern Life, Ebranburg তাঁহার Aspects of Ancient World নামক পুস্তকে স্পার্টার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষানীতির প্রভাব ক্রমশ প্রত্যেক গ্রীক রাজ্যে অনুসৃত হইবার প্রমাণ দিয়াছেন।

রোমান যুগের প্রথমভাগে শিক্ষার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও, প্রাথমিক শিক্ষার উপর কোন সময়েই নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, পরবর্তী যুগে অন্তত উচ্চতর শিক্ষায় যে কতকাংশে রাষ্ট্রহস্তক্ষেপ ছিল তাহার নিদর্শন Rostovtseff তাঁহার History of the Ancient World নামক পুস্তকে দিয়াছেন।

মধ্যযুগে খ্রিস্টিয়ান ধর্মসম্প্রদায় মঠের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ইংলণ্ডে চ্যান্টরী স্কুলের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাও ধর্মসম্প্রদায়ের হাতে আসে ও সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে দুএকটী রাজস্কুল (Court School) ছাড়া যে সকল শিক্ষায়তন ছিল তাহা ধর্মসম্প্রদায়ের অধীন ছিল। এ সময় শিক্ষাবিস্তার অনেকটা কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িবে তাহা স্বাভাবিক।

নব আগরণের অব্যবহিত পূর্বেই উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র প্যারিস, বলোনা, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ও তথায় অনেক শিক্ষাব্রতীর যোগদান আপাত দৃষ্টিতে পোপের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের একটা দুর্বল প্রতিক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। Boyed এর History of Western Education, Adams এর Civilization in Middle Ages ও Salazman এর English Life in Middle Ages কতকটা এইরূপ মতবাদই সমর্থন করে।

নবজাগরণের ফলস্বরূপ বিদ্যাচর্চার আগ্রহ একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুষ্টিসাধন করিল অন্য দিকে উত্তর ইউরোপে ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মসম্প্রদায় একদিকে গণসংযোগের জন্য যেমন ল্যাটিন ভাষার প্রাধান্য লোপ করিয়া দেশীয় ভাষায় উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিল, অন্যদিকে তেমনই শিক্ষায় নিয়ন্ত্রণের ভার

তাহারা ধর্ম সম্প্রদায়ের হাতে রাখিতে কুণ্ঠিত হইল। কারণ ধর্মসম্প্রদায় সাধারণতই রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিরোধী। উত্তর ইউরোপে তাই নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইল।

ফ্রান্সের ক্ষুব্ধাধিকারীসম্প্রদায়, স্পেনের মতাবলম্বী (Loyla) লয়লা প্রবর্তিত জেসুইট প্রণালীর দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেন। কারণ ক্ষুব্ধাধিকারীরা স্বভাবতই রক্ষণশীল ও একদিকে যেমন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পছন্দ করেন না, অন্য দিকে গণতান্ত্রিকতাও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। ফলে Lechalloie বা Rousseau ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিলেও ফ্রান্সে শিক্ষা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইল না। পরবর্তী কালে Rousseau সমাজের প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ দূরের কথা, শিক্ষার কোন নিয়ন্ত্রণেই বিরোধী হইয়া পড়েন। ফরাসী বিপ্লবের পর শিক্ষানীতি স্বভাবতই রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন হয় ও পরবর্তীকালে নেপোলিয়ান তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন।

ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কার জার্মানী প্রভৃতি উত্তর ইউরোপীয় দেশের ন্যায় গণআন্দোলনের ফলে উদ্ভূত হয় নাই। রাজার ব্যক্তিগত সুবিধা সাধনের জন্য জনসাধারণের উপর জোর করিয়া যে এ সংস্কার চাপান হয় তাহা Ramsay Muir এর ন্যায় ঐতিহাসিকও স্বীকার করিয়াছেন। এসময়ে গৃহযুদ্ধের (War of the Roses) কারণে ক্ষুব্ধাধিকারী সম্প্রদায় দুর্বল হইয়া পড়ায় রাজশক্তি যখন মঠগুলিকে ধ্বংস করিলেন ও তাহাদের স্থানে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন না, তখন বাধা দিবার কেহই ছিল না। Leach তাঁহার English Schools at Reformation এবং Curtis তাঁহার History of Education in Great Britain নামক পুস্তকদ্বয়ে টিউডর বংশের এই শিক্ষাবিরোধী নীতির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল তাহার মধ্যে কোন কোনটি মানবহিতৈষণার প্রমাণ ও কোন কোনটি প্রবর্তকের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সোপানরূপে স্থাপিত হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ব্যঙ্গচিত্র ডিকেন্স তাঁহার Nicholas Nickleby নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনিরপেক্ষতার দ্বারাই এরূপ বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দী অবধি (এমন কি ১৮৩২ সাল পর্যন্ত) শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র সাহায্যের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাহার চিত্র Bernard তাঁহার Short History of English Education এ দেখাইয়াছেন। পরবর্তীকালে Bell ও Lancaster ভাইদের মনিটর-পড়ুয়া-নীতি (Monitorial system) বা তাহার পর Pupil teacher নীতি প্রবর্তন করিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের শিক্ষায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের বা সাহায্যের কোন নিদর্শন নাই। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিত্তির মানের ছিল। যে সকল ছাত্রের অভিভাবক অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ তাহারা ভাল শিক্ষা পাইত ও তাহারা অল্প ব্যয়ে সমর্থ তাহাদের ছেলেদের শিক্ষা নামমাত্র হইত। শিক্ষাকে একটা পণ্যবস্তুরূপ গণ্য করিবার নীতি যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও কতকাংশে শেষ পর্যন্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মতবাদে বিশ্বাসী দেশবাসী ভারতে কিরূপ শিক্ষানীতি প্রবর্তন করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ব্যতিরেকে প্রত্যেকেই আপন আপন রাজ্যরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে কোন সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতির পরিচালনা অসম্ভব ছিল। মুসলিম রাজা সাধারণতঃ সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি উদাসীন ছিলেন ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-বিদ্যালয়গুলি সর্বদাই বিচ্ছিন্ন ছিল। কাশী বা মিথিলা, নবদ্বীপ বা কাঞ্চিপুরম্ এতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। কোন স্থানে হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থান হইলেও রাজারা এই নিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তন করেন নাই, শুধু রাজসাহায্যে কোন কোন বিশেষ বিদ্যালয়ের পুষ্টি সাধন করিয়া ছিলেন মাত্র। তবে প্রত্যেক বিদ্যালয় নিঃস্ব ও সাধারণতঃ হিন্দুবিদ্যালয় আবাসিক ছিল। মুসলিম বিদ্যালয়গুলি আবাসিক ছিলনা।

এই পটভূমিকায় আমরা যদি ইংরেজি বিদ্যালয়ের অভ্যুত্থানকে দেখি তবে হয়ত তাহাদের ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা কারণ বুঝিতে পারিব।

(৪) বৃটিশ শিক্ষা প্রণালীর পূর্ব ইতিহাস

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী, বিশেষ করিয়া বৃটিশ শিক্ষাপ্রণালী যে জোর করিয়া ভারতের উপর চাপানো হইয়াছে তাহার পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই গ্রীকযুগে দুই বিপরীত-ধর্মী শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন ছিল। স্পার্টার শিক্ষা প্রণালী সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ও এথেন্সের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে অনিয়ন্ত্রিত ছিল। এথেন্সে প্লেটো (Republic ৪·৪১৮ হইতে ৪২৪ ও Laws ৭৯৭, ৮০৯ ও ৮১৩) যেমনভাবে এরিষ্টটল (Politics ৭) রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষানীতির সমর্থন করেন। Konye তাঁহার Discovering Plato, Livingstone তাঁহার Greek Ideals of Modern Life, Ebranburg তাঁহার Aspects of Ancient World নামক পুস্তকে স্পার্টার নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষানীতির প্রভাব ক্রমশ প্রত্যেক গ্রীক রাষ্ট্রে অনুসৃত হইবার প্রমাণ দিয়াছেন।

রোমান যুগের প্রথমভাগে শিক্ষার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও, প্রাথমিক শিক্ষার উপর কোন সময়েই নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, পরবর্তী যুগে অন্ততঃ উচ্চতর শিক্ষায় যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ছিল তাহার নিদর্শন Rostovtzeff তাঁহার History of the Ancient World নামক পুস্তকে দিয়াছেন।

মধ্যযুগে কিছুদিনের ধর্মসম্প্রদায় মঠের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন করেন। ইংলণ্ডে ক্যাথিড্রাল স্কুলের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাও ধর্মসম্প্রদায়ের হাতে আসে ও সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে দুএকটী রাজপুর (Court School) ছাড়া যে সকল শিক্ষাবিদ্যালয় ছিল তাহা ধর্মসম্প্রদায়ের অধীন ছিল। এ সময় শিক্ষাবিস্তার অনেকটা কেন্দ্রীকৃত হইয়া পড়িবে তাহা স্বাভাবিক।

নব জাগরণের অব্যবহিত পূর্বেই উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র প্যারিস, বলোনা, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন ও তথায় অনেক শিক্ষার্থীর যোগদান আপাত দৃষ্টিতে পোপের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের একটা দুর্বল প্রতিক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। Boyed এর History of Western Education, Adams এর Civilization in Middle Ages ও Salazman এর English Life in Middle Ages কতকটা এইরূপ মতবাদই সমর্থন করে।

নবজাগরণের ফলস্বরূপ বিদ্যাচর্চার আগ্রহ একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুষ্টিসাধন করিল অপর দিকে উত্তর ইউরোপে ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। প্রোটেস্টান্ট ধর্মসম্প্রদায় একদিকে গণসংযোগের জন্য যেমন ল্যাটিন ভাষার প্রাধান্য লোপ করিয়া দেশীয় ভাষার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিল, অন্যদিকে তেমনই শিক্ষায় নিয়ন্ত্রণের ভার

তাহারা ধর্ম সম্প্রদায়ের হাতে রাখিতে কুণ্ঠিত হইল। কারণ ধর্মসম্প্রদায় সাধারণতই রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিরোধী। উত্তর ইউরোপে তাই নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইল।

স্পেনের ক্ষুন্নাবিকারীসম্প্রদায়, পোপের মতাবলম্বী (Loyla) লয়লা প্রবর্তিত জেসুইট্ প্রণালীর দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলেন। কারণ ক্ষুন্নাবিকারীরা স্বভাবতই রক্ষণশীল ও একদিকে যেমন রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পছন্দ করেন না, অপর দিকে পপত্যাগপণও তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। ফলে Lechaltois বা Rousseau ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করিলেও ফ্রান্সে শিক্ষা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইল না। পরবর্তী কালে Rousseau সমাজের প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ দূরের কথা, শিক্ষার কোন নিয়ন্ত্রণেরই বিরোধী হইয়া পড়েন। ফরাসী বিপ্লবের পর শিক্ষানীতি স্বভাবতই রাষ্ট্রকর্তৃত্বাধীন হয় ও পরবর্তীকালে নেপোলিয়ান তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন।

ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কার জার্মানী প্রভৃতি উত্তর ইউরোপীয় দেশের ন্যায় গণআন্দোলনের ফলে উদ্ভূত হয় নাই। রাজার ব্যক্তিগত সুবিধা সাধনের জন্য জনসাধারণের উপর জোর করিয়া যে এ সংস্কার চাপান হয় তাহা Ramsay Muir এর ন্যায় ঐতিহাসিকও স্বীকার করিয়াছেন। এদেশে গৃহযুদ্ধের (War of the Roses) ফলে ক্ষুন্নাবকারী সম্প্রদায় দুর্বল হইয়া পড়ায় রাজশক্তি যখন মঠগুলিকে ধ্বংস করিলেন ও তাহাদের স্থানে কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন না, তখন বাধা দিবার কেহই ছিল না। Leach তাঁহার English Schools at Reformation এবং Curtis তাঁহার History of Education in Great Britain নামক পুস্তকদ্বয়ে টিউডর বংশের এই শিক্ষাবিরোধী নীতির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল তাহার মধ্যে কোন কোনটি দানবহিতৈষণার প্রমাণ ও কোন কোনটি প্রবর্তকের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সোপানরূপে স্থাপিত হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বাস্তবচিত্র ডিকেন্স তাঁহার Nicholas Nickleby নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনিরপেক্ষতার দ্বারাই এরূপ বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়। ধর্মসম্প্রদায় অনেক বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠেন ও এ সম্প্রদায়ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের বিরোধী থাকায় ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি (এমন কি ১৮৩২ সাল পর্যন্ত) শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্র সাহায্যের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয় তাহার চিত্র Bernard তাঁহার Short History of English Education এ দেখাইয়াছেন। পরবর্তীকালে Boll ও Lancaster তাঁহাদের সর্দার-পড়ুয়া-নীতি (Monitorial system) বা তাহার পর Pupil teacher নীতি প্রবর্তন করিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের শিক্ষায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের বা সাহায্যের কোন নিদর্শন নাই। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিত্তির মানের ছিল। যে সকল ছাত্রের অভিভাবক অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ তাহারা ভাল শিক্ষা পাইত ও তাহারা অল্প ব্যয়ে সমর্থ তাহাদের ছেলেদের শিক্ষা নামমাত্র হইত। শিক্ষাকে একটা পণ্যবস্তুরূপ গণ্য করিবার নীতি যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও কতকাংশে শেষ পর্যন্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই মতবাদে বিশ্বাসী দেশবাসী ভারতে কিরূপ শিক্ষানীতি প্রবর্তন করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভূগোল শিক্ষা

। শ্রীবকুলবালা সেন

ভূমিকা

ছাত্রীদের মুখে বহুবার শোনা কথা—ভূগোল পড়তে ভাল লাগে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভূগোল পাঠনার নীরস পদ্ধতি এজন্য দায়ী বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। কারণ সরস উপস্থাপন যে তাহাদের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদের আগ্রহকে উজ্জীবিত করিতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা জানিয়াছি। ভূগোল পাঠনার প্রাথমিক স্তরে যদি বিষয়টির মনোরঞ্জক রূপ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই যে শুধু সহজ হইবে তাহা নয়, পরবর্তী কালের শিক্ষাতেও ভূগোল আর ভীতিপ্রদ মূর্তিতে দেখা দিবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস।

বালকবালিকারা চোর চোর খেলে, কুমীর কুমীর খেলে; অর্থাৎ নিজেদের চোর ও কুমীরের ভূমিকায় কল্পনা করিয়া আনন্দ পায়। আবার খেলার সঙ্গে ছড়া থাকিলে তাহাদের আনন্দ শতগুণ বাড়িয়া যায়।

হাত মুড় মুড় কালোজিরে
বহুন কুসুম পানের বিড়ে।

অথবা, এখান দিয়ে যাব,
মাসীকে বলে দেব।
এখান দিয়ে যাব,
মামাকে বলে দেব—

প্রভৃতি তারই নিদর্শন। হাডুডু খেলিবার সময় শুধু ধ্বনি-মাত্রের সাহায্যে দম রাখার চেয়ে নানাবিধ ছড়া বলিয়া খেলিতে তাহারা বেশী আনন্দ পায়। যেমন,

চু কপাটি যাব না,
পাতি লেবু খাব না।

অথবা, আমি যাব দিলে, বাঘ মারবো কিলে,
বাঘের তেলে প্রদীপ জ্বলে।

কিংবা, বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার ঘুঘু তব বধিব পরাণ। ইত্যাদি।

শিশুচিত্তের অনুকৃতিতে ছড়া ও অভিনয় খেলারই অঙ্গ। তাহা বাদ দিলে খেলা পঙ্গু হইয়া পড়ে। ছড়া ও অভিনয় বালকবালিকাদের মন বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মনের গভীরে এই সত্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় থাকায় ভূগোলের শিক্ষকরূপ দিতে গিয়া অনিবার্য ভাবেই ইহাতে ছড়ার মাধ্যমে কতকটা নাটারূপ আসিয়া গিয়াছে। প্রাথমিক শ্রেণীতে ভূগোল শিক্ষায় এবং উচ্চতর শ্রেণীতে ভূগোল শিক্ষায় সরস পটভূমিকা সৃজনে ইহা বাস্তবিক সুফলপ্রদ হইবে কি না, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত মত প্রকাশের পূর্বে বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ভাবে ইহার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভৌগোলিক বস্তুর রূপক ভূমিকায় সাহায্যে খেলার ছলে ভূগোল শিখাইবার প্রচেষ্টা করিয়া আমি বুঝিয়াছি, এমন কি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রীরাও—যাহাদের ভূগোলে বিতৃষ্ণা এত বেশী যে মানচিত্র, গ্লোব ও ভূগোলকের ব্যবহার ব্যর্থ হইয়া যায় তাহাদের মধ্যেও—অনেকে এই পন্থায় আনন্দের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে।

অল্পসংখ্যকের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে, অধিকাংশের মধ্যে তাহা সক্রিয় হয় কিনা,

তাহা পরীক্ষার বিস্তৃত সুযোগ সৃষ্টির আশায় ইহা প্রকাশ করিলাম।

প্রাথমিক ভূগোল

গ্রাম

বালকবালিকারা গ্রাম গঠন করবে। তাদের মধ্যে একদল হবে গাঁয়ের ধারের ছোট্ট নদী (নীল তাদের পোষাক, মাথায় নানা রুমাল বাঁধা)। খেলার মাঠের একধারে তারা এঁকেবেঁকে দাঁড়াবে। দুটি ছেলেমেয়ে হবে নদীর উপর বাঁশের পুল। তারা নদীর উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে, এক অপরের হাত ধরে দুই তীরের সংযোগ সৃষ্টি করবে। নদীর ধারে বাজার—তারই প্রতিভূ হয়ে বসবে চারটি ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে কেউ মাছ, কেউ দুধ, কেউ সবজি বিক্রি করবে। কেউবা হবে মুদি। বাজারের অনতিদূরে একটি বড় পুকুর। বার চৌদ্দটি ছেলেমেয়ে পুকুর রচনা করে বসবে। পুকুরের তিন পাশে তাকঘর, তাক্তার খানা ও ছেলেমেয়েদের স্কুল। প্রতিভূস্থানীয় ছেলেমেয়েদের বুকে পরিচয়-জ্ঞাপক টিকিট আঁটা থাকবে। পুকুরের পাশে গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে গাঁয়ের পথ। কয়েকজন ছেলেমেয়ে অর্ধবাহিত ভাবে (দলিল গতি) পথ রচনা করবে। তার ওপাশে গাঁয়ের বসতি। কয়েকটি ছেলে মেয়ে দরিদ্র ও অবস্থাপন্ন গৃহের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়াবে। তার আশে পাশে একটি নলকূপ, একটি ইস্কাবন, একটি মসজিদ। বসতির ওপাশে ক্ষেত। একদল ছেলেমেয়ে শস্যক্ষেত রচনা করে বসবে।

আঙ্গিক অভিব্যক্তি সহ

ছড়া গান

নদী— আমরা নদী,
নাম না জানা গাঁয়ের পাশে নাম না জানা নদী।
মোদের ঢেউয়ের বাহার নাই,
নাই পাগল মাতামাতি,
গাঁয়ের মেয়ের মতই মোরা শান্ত-মিষ্ট অতি।
মোদের বুকে মেশ বিদেশের নৌকা কত চলে,
মোদের জলে মোদের কূলে সোনার শস্য ফলে।
মোরা আপন মনে যাই,
পাই সবার প্রাণের প্রীতি,
কূল কূল কূল সুর তবে গাহি মধুর গীতি।
আমরা নদী,
নাম না জানা গাঁয়ের পাশে নাম না জানা নদী।

পুল— আমরা সেতু,
মেলাই দুটো বাঁশে গড়া
এপার ওপার হেতু।
সুকৌশলী গাঁয়ের লোকে, গাঁয়ের ছেলেমেয়ে,
আমার পরেই চলছে সবাই আনন্দে গান গেয়ে।

মেছুনি, গয়লা, সবজিওলা ও মুদি—
আমরা বাজার।
ছোট্ট গাঁয়ের সকল ঘরে জোগাই মোরা আহার।

মেছুনি— রুই কাতলা পোলসা,
চুনোপুঁটি পোলসা,
কৈ মাগুর চান্দা,
বাজার বড়ই মন্দা,
পাবদা বাটার চচ্চরি, পালং শাকে ঘুড়ো,
ফুরিয়ে গেলে আর পাবেনা, তখন মাথা খুঁড়ো।
সকলে— টাটকা সবই ঠিক যেনো,
সস্তা দামে ছাড়ছি, কেনো বেটুক লাগে যাহার।
আমরা গাঁয়ের বাজার, ওরে আমরা গাঁয়ের বাজার।
গয়লা— গয়লা আমি দুধ বেচি গো,
ভিন্ গাঁয়েতে বাড়ি।
হেতু পথে সকাল-সাঁঝে এপার ওপার করি।
আমার লক্ষ চিকণ-কায়।
সবুজ মাঠের কাঁচা ঘাস পেট-পুরে সে খায়।

ঘরের কথাকবি কহি, পাবে নাকো জুত।
জল পাবেনা জল পাবেনা, ঘটের আঠা দুধ।
সকলে— তেজাল দিই না ঠিক জেনো,
সত্য দামে ছাড়ছি কেনো, যেটুক লাগে যাহার।
আমরা গাঁয়ের বাজার, ওরে আমরা গাঁয়ের বাজার।
সংবিওয়ালা—
আলু পটল কুমড়ো ঢ্যাঁড়স কলমী শালং নটে,
মূলো কিনতে দুপটি ধরে গিন্নি যাবেন চটে।
যেগুন সস্তা পাঁজ কলি
টাটকা ভাজা মোজ তুলি।
কে নেবে গো এগিয়ে এস,
তাড়া কিসের, একটু বস।
সস্তা দেখ বাজার যেনো,
সকলে—
সত্য দামে ছাড়ছি কেনো সেটুক লাগে যাহার।
আমরা গাঁয়ের বাজার, ওরে আমরা গাঁয়ের বাজার।
মুদি— দেখো পাবে চাল ডাল তেল চিনি নুন,
ঘরের তৈরী লঙ্কা গুঁড়ো হলুদ;
ঘনে ভীরে তেজপাত
বলি নাকো ঝুট বাত,
মুড়ি চিঁড়ে খৈ মোয়া
আনা আনা সের পোয়া।
বাতাসা মিছরি গুড়,
সাবু গঠি আমচুর,
সব চীজ সেরা, দর যাহা মন চায়।
এনেছি শহর হতে ব্যাপারীর স্থায়।
সকলে— খাঁটি জিনিস ঠিক জেনো,
সত্য দামে ছাড়ছি কেনো সেটুক লাগে যাহার।
আমরা গাঁয়ের বাজার, ওরে আমরা গাঁয়ের বাজার।
ছোট গাঁয়ের সকল ঘরে মোদাই মোরা আহার।
পুষ্করিণী— আমি পুষ্করিণী।
চার পাড়ে মোর দাঁড়িয়ে যারা গাঁয়ের সেরা মানী।
পূবের পাড়ে বনস্পতি,
কে তুমি গো বীর?
বিভালয়— আমি গাঁয়ের প্রাণ,
মন্ত্র আমার মান,
সবার ঘরে ঘরে আমি বিদ্যা করি দান।
পুষ্করিণী— পশ্চিমেতে অবিরাম
চলছে কাজ, এ কোন ধাম?
ডাকঘর— যোগাযোগের পন্থা আমি
ডাকঘর মোর নাম।
পুষ্করিণী— দখিন খোলা উত্তুরে
পাকা বাড়ি মাঠ জুড়ে,
সেবাব্রতী কে তুমি গো ভাই?
ডাক্তারখানা—
গাঁয়ের বন্ধু আমার মতন আর তো কেহ নাই।
ডাক্তার খানা আমি,
সারা দিবস রাতি
করছি কাজ লোকের হিতে,
সকল লোকেই আসছে মিতে,
ধনী গরীব নাইরে ভেদ,
কারো মনেই হয়না খেদ।
গাঁয়ের পথ—
(১ম ও ২য় সারি) আমরা গাঁয়ের পথ,
পাড়াগাঁয়ের মধ্যিখানে পাবেনা এক পথ।
(৩য় ও ৪র্থ সারি)
আমরা গরমি কালে ধুলো উড়াই বেদার।
কবি যখন দিলে কাদায় লুটোপুটি,
আমায় নিয়ে যা তাঁর করে ইচ্ছা মত যে যায়।
সকাল থেকে পহর-রাতে নাইকো আমার ছুটি।
(৫ম ও ৬ষ্ঠ সারি)
গাঁয়ের যত কারবার ভুমোর মোদাই বাঁধা যাবে
যখন হাটের পথে যায়।
পরিচয় হয় তখন তাদের চলে পাতের সাথে,
তারা মেঠো সুরে গায়।
সকলে—
আমার বুকেই চাষা চলে লাঙল নিয়ে কাঁধে,
তাতী তাইরেরা টানা পোড়েন আমায় ঘিরে বাঁধে।

সাঁঝ সকালে গাঁয়ের বধূ কলস নিয়ে কাঁখে,
জলকে যেতে গল্প করে আমার বাঁকে বাঁকে।
ইস্কুলে যাই দই বগলে ছেলে মেয়ের দল,
কচি প্রাণের ছোঁয়ায় তারা আলোয় ঝলোমল।

বালগৃহ—
চিনি আমরা চিনি তোমায়, ওগো গাঁয়ের পথ।
পরম বন্ধু তুমি মোদের, তোমায় দণ্ডবৎ।
আমরা গাঁয়ের লোকের বাড়ি,
তোমার পাশেই ঠাঁই নিয়েছি এই তো সারি সারি।

নলকূপ—
আমায় তুমি চেন নাকি, ওগো বালের গেঁও।

বালগৃহ—
চিনি তোমায়, তোমার 'পরে অপার মোদের স্নেহ।
নলকূপের জল নৈলে জীবন বাঁচে কিসে?
তাই তো তুমি আছ মোদের হিয়ার সাথে মিশে।

ইস্কাবন— ওগো বসতবাড়ি।
আমার সাথে তোমার বুঝি চিরকালের আড়ি?

বালগৃহ—
চিরকালের তরসা মোদের ইস্কাবন এই জন।
তোমার কথা ভুলবো মোরা এমন বুঝি মন?

মস্কাই— ওগো লোকের বসতি।
বুঝি নাকো কি মতি।
আমায় এত হেলনা।
ভবিষ্যতের ভাবনা
আমায় বুকেই রয়নি কি?
আমায় তোলা সহজ কি?

বালগৃহ— তুমি গাঁয়ের লক্ষ্মী,
সকল লোকে সাক্ষী।
অবহেলা। তাই কি হয়?
তোমার তরেই সবার ভয়।
তোমার মোদেই সকল সই,
তোমার পায়ে প্রণাম রই।

শস্যক্ষেত— আমরা গাঁয়ের শোভা।
ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত কবির মনোলোভা।
স্বর্ণ-ভরল রোদ্দুরে
সকল অঙ্গ রই ভরি।
আনন্দেতে প্রাণ পুরে
শাওন মাসে গান করি।
সমীরণের তরঙ্গে
হিল্লোলিয়া ভুবনে
জীবন-রসে সঞ্জীবি
সবার ক্ষুধা দূর করি।
আমরা চাষীর আনন্দ
স্পন্দিয়াতি দিগন্ত,
বাংলা মায়ের আঁচল পূর্ণ করি ফসলে।

সকলে—
তোমায় পায়ে প্রণাম করি, প্রণাম করি সকলে।
তুমি দেশজননীর স্পর্শ গো,
কবির মনের হর্ষ গো,
পল্লী-মায়ের আঁচল পূর্ণ কর ফসলে।
তোমায় পায়ে প্রণাম করি, প্রণাম করি সকলে।

———

অশান

তেজস্কর ও বলবর্ধক

দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন

অশানের নিয়মিত সেবনে
মৈমন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া
দেহ ও মন তেজোদৃপ্ত হয়

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অসম্পাদিত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। সিহনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | মাঘ ১৩৬১ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনা

বর্তমান সংখ্যা

আমরা গত পৌষ সংখ্যায় জানাইয়াছিলাম যে পরবর্তী সংখ্যায় বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণ পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিব। বর্তমান সংখ্যায় আমরা কলিকাতা, বিশ্বভারতী ও অন্যান্য স্থানের সমাবর্তন অভিভাষণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করিলাম। আমাদের বিদ্যাবিদ্‌গণ কি ভাবিতেছেন, ইহা হইতে তাহার একটা আভাষ পাওয়া যাইবে মনে করি। আজি বড় দুঃখ তাহার শিক্ষা দ্বারা, শিক্ষা অগ্রসর হয় পরিবর্তনের ভিত্তিতে, খাম-খেয়ালি ভাবে নয়। এই দিক দিয়া সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত অভিভাষণগুলি প্রকাশের একটা উপযোগিতা আছে।

কিন্তু এই সামান্য আয়োজন করিতেও আমাদের বিস্তর বিলম্ব হইয়া গেল। কর্মীদের অসাধ্য তাহার মধ্যে এক প্রধান কারণ। এজন্য আমরা গ্রাহক ও পাঠকদের নিকট ত্রুটিস্বীকার করিতেছি।

হেলেন কেলারের ভারতাগমন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে হেলেন কেলার ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। এই মহিলাটির পরিচয় জানা একান্ত আবশ্যক বোধে তাহা এখানে সংক্ষেপে দিলাম। ইঁহার জন্ম ২৭ জুন্‌ডারি, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, সংযুক্ত রাষ্ট্রের আলাবামা নামক রাষ্ট্রে। তাঁহার পিতা সামরিক বিভাগে 'ক্যাপ্টেন' ছিলেন, পরে সাংবাদিক হন। হেলেন কেলার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। ছয় মাসে কথা বলিয়াছিলেন, আর যেদিন তাঁহার এক বৎসর পূর্ণ হয় সেই দিন তিনি হাঁটিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই অতি শৈশবেই তাঁহার এমন এক প্রচণ্ড অসুখ হয় যে তিনি দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি হারান।

ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে অন্ধদের এক বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়, এখানে মিস সালিভ্যানের সাহায্যে তিনি পড়িতে ও লিখিতে শেখেন। অল্প কয় মাসের মধ্যেই তিনি আটশত শব্দ শিখিয়া ফেলেন এবং প্রচলিত অক্ষরে ও ব্রেইল নামক অন্ধদের জন্য উদ্ভাবিত লিপিতে লিখিতে শেখেন।

তাঁহার কৃতিত্বে আমেরিকা বেন, সমগ্র জগৎ স্তব্ধ হইয়া যায়। বহু লোক, শিশু, অতিথি, ভৃত্য, বহু শ্রেণীর বহু লোকের মাঝখানে পড়িয়া তিনি শিক্ষণীয় বিষয় সহজে আয়ত্ত করেন; যতক্ষণ থাকিতেন ততক্ষণই মিস সালিভানের নিকটে শব্দ শিখিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই শব্দ লইয়া পড়িয়া আছেন, আজ কথা চাই। কথা কহিতে শিখিলেন। বক্তৃতা দিতেও শিখিলেন। যে স্বর কখনও ক্ষীণ অস্পষ্ট হইয়া যায়, আবার পরক্ষণেই খুব বেশি চড়া হইয়া যায়, তাহাকে আয়ত্তে আনিতে শিখিলেন। ইংরেজি ছাড়িয়া শেষে লাটিন, গ্রীক ও জার্মান ভাষা শেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি গ্রহণান্তে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক "আমার জীবনের কাহিনী"—The story of my life—তাঁহাকে বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসন দিল। তাহার পরে তিনি আরও অনেক বই লিখিয়াছেন—'অন্ধকার হইতে', 'আনোর ধর্ম', 'আজ ঘটিয়াছে', 'সন্ধ্যার শান্তি' ইত্যাদি। কাব্য সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলা—সকল শাস্ত্রে তাঁহার বিচক্ষণতা আছে। ছায়াচিত্র তিনি অন্ধ হইয়াও দেখেন, ভাস্কর্যের গুণ তিনি চোখে না দেখিয়াও বিচার করেন। যাহারা মূক, যাহারা অন্ধ, তাহাদের সেবায় আজ তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। সারা জগৎ তিনি ঘুরিয়াছেন তাহাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়াছেন, চার মাসে চল্লিশ হাজার মাইল ঘুরিয়া যাইবেন সংকল্প লইয়া। তাঁহার অদম্য সাহস ও সংকল্প, তাঁহার অন্ধদের ও বধিরদের শিক্ষার প্রতি গভীর দৃষ্টি জগতের শিক্ষিত সমাজে, বিশেষ করিয়া অন্ধ ও বধিরদের শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহাকে এক অভিনব প্রতিষ্ঠা আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার আগমন তাজমহলীকে অন্তরে আরও আলো দিতে প্রেরণা দান করুক। কলিকাতায় তিনি ২৮ মার্চ তারিখে আসিবেন; তাঁহার উপস্থিতি কলিকাতাকে উদ্বুদ্ধ করুক।

সংস্কৃত পড়াইবার অভিনব পদ্ধতি

ভারতের ভূতপূর্ব বিচারপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী গাটনায় বিহার সংস্কৃত সমিতির বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে অভিভাষণ দিতে গিয়া মাদ্রাজে সংস্কৃত পড়াইবার এক অভিনব পদ্ধতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ইহাকে পাণিনীয় নিয়ম বলিয়া থাকেন। তিনি সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়সের ছেলেদের লইয়া আরম্ভ করেন, এবং তাহাদিগকে সর্বপ্রথমই শব্দরূপ শিখা দেন। শব্দরূপের তালিকা মুখস্থ করাইয়া নয়, শব্দগুলির অর্থের সাহায্যে এবং বাক্যে তাহাদের নিজ নিজ উপযোগিতার পরিচয় দিয়া। তিনি বলেন যে প্রত্যহ চল্লিশ মিনিট শিক্ষা দিয়া শব্দরূপ ও ধাতুরূপের প্রয়োজনীয় অংশ সবই শিখাইতে পারিয়াছেন। প্রথম দুই মাসের পর ছাত্রেরা পাণিনীর সূত্রের কতকগুলি নির্দিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করে। যে সমস্ত বৃত্তি জটিল তাহা লইয়া তিনি ছাত্রদের মাথা খারাইতে দেন না। তিনি ছাত্রদের এমন সব ব্যাখ্যা শেখান যাহা তাহাদের কাজে লাগে এবং যাহা ছাত্রকে সে যাহা পড়িয়াছে তাহা মনে রাখিতে ও প্রয়োগ করিতে সাহায্য করে। সূত্রগুলির মধ্যে ৬০০টি বৈদিক শব্দ গঠন ও তাহাদের আরোহ অবরোহ প্রভৃতি লইয়া, ১১০০টি তদ্ধিত সংক্রান্ত। বাকি রহিল ৭০০টি সূত্র। এই সূত্রগুলি আগে বুঝিতে হয়, পরে কণ্ঠস্থ করিতে হয়—সুতরাং স্মৃতিশক্তির উপর ভার চাপানো হয় না। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ত্রিবান্দ্রমে পদ্ধতিটি কার্যত প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার পর মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়াছেন। প্রতি পাঠে চল্লিশ মিনিট লাগে, এইরূপ নিয়মিত দৈনিক ১৮০টি পাঠের ফলে দেখা গিয়াছে যে শততম পাঠের পর

হইতেই ছাত্র সংস্কৃতে কথা বলিতে পারে। অবশ্য শিক্ষার মাধ্যম সংস্কৃত ভাষাই। কুপ্পুস্বামী গবেষণাগারে (Kuppuswami Research Institute) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা কতখানি অবলম্বন করা যায় তাহা দেখা উচিৎ।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শিক্ষা সপ্তাহ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষা সমিতি এবার তাঁহাদের শিক্ষা সপ্তাহ ফেব্রুয়ারী ১৩ হইতে ১৯ তারিখ পর্যন্ত বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত করিলেন। পোস্তাবাজার রাজবাটী তাঁহারা এজন্য পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয়ের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত ও প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা, শিশুস্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করিয়া ইহার উপযোগিতা কর্তৃপক্ষ বর্ধিত করিয়াছেন। এই আয়োজন হইতে আমরা সুফল আশা করি।

শারীরিক কাজ আর বুনিয়াদী শিক্ষা

জওহরলাল নেহেরু

[আবাদি কংগ্রেসের অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাবের সমর্থনে প্রদত্ত ভাষণ]

শুধু শিক্ষাতত্ত্ব দৃষ্টিতে দেখিলে যে কোন শিক্ষা-বিদ্‌কেই বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতিকে মানিতে হইবে। তবু আমার আশ্চর্য লাগে যে আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতিকে আতিকালের পদ্ধতি বলিয়াছেন। তাঁহাদের কাছে কি বলা যায়? এই কথা মাত্র বলিতে পারি যে এই পদ্ধতিকে বুঝিবার জন্য তাঁহারা কষ্ট স্বীকার করেন নাই; এমন কি ভারতবর্ষ আজ কি উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহাকে একটু হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টাও করেন নাই। ইংরেজ সরকার প্রায় একশ বৎসর ধরিয়া নিজেদের এক মতলবে পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী চালু রাখিয়াছিল—তাহাদের মতলব ছিল শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এমন কিছু লোক তৈয়ারি করা যাহারা শাসনযন্ত্রের নীচের স্তরে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। অবশ্য একথা সত্য যে প্রথম অবস্থা হইতে এই প্রণালীর অনেক পরিশোধন ও পরিবর্তন হইয়াছে, আর ইহাও সত্য যে এই পুরাতন প্রণালী হইতেও অনেকগুলি এমন উঁচু স্তরের লোক বাহির হইয়াছেন যাঁহারা সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে কাহারও অপেক্ষা কম নহেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে পারি না যে এই প্রণালী ভাল।

রাষ্ট্রের কর্তব্য দেশের প্রতিটি মানবের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আর আমি তো বলি অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমরা সমাজের যে ব্যবস্থা কায়েম করিতে চাই তাহাতে সমাজে এমন শিক্ষিত লোক তৈয়ারি করিতে হইবে যাহারা শুধু লিখিতে পড়িতেই জানিবে না, যাহাদের চরিত্র উন্নত, যাহাদের হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বর্তমান, আর যাহারা নিজের হাতে কিছু কাজ করিতে পারিবে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে শরীরের শ্রমকে যেন আজ অপমানজনক বলিয়া ধরাই রেওয়াজ হইয়াছে, আমরা মনে করি ইহা নিম্নশ্রেণীর কাজ। আমাদের বাসনা যে, নিম্নশ্রেণীর লোকে

কায়িক পরিশ্রমের কাজ করিবে আর উচ্চশ্রেণীর লোকের নিজের হাতে কিছু কাজ করিতে নাই, তাহারা শুধু মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তির কাজই করিবে। এই ধারণার জন্যই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এখনও এই ধারণা বিদ্যমান। আমি এই ধারণাকে শুধু ভুল বলিব না, ক্ষতিকারকও বলিব। আমার মনে হয় না, এই রকম ভাবধারা লইয়া কোন রাষ্ট্র সভ্যতার উন্নতি সাধন করিতে পারে। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবল শরীরের বিকাশের দিকে দেখিলেও শারীরিক শ্রম অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমার নিজের শরীর বেশ সুস্থ সবল বলিয়া আমার ধারণা, আর আমি যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার বয়সী যে কোন লোকের সঙ্গে পাল্লা দিতে রাজী, কারণ এই যে, আমি সর্বদাই শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছি। আমি রোগ অথবা দুর্বলতাকে ঘৃণা করি, আমি চাই যে আমার দেশের সকল লোক, বালক বৃদ্ধ সকলে, শক্ত সমর্থ হয়। রাষ্ট্রকে পরলা নম্বরের রাষ্ট্রে পরিণত করে। কেন না, শরীর ভাল না থাকিলে মানসিক বিকাশও সুষ্ঠু হয় না।

যে শিক্ষা কেবল বই পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহাকে আমি অপূর্ণ শিক্ষা বলিব। এই শিক্ষার আপনি হয়তো খুব বড় গণিতজ্ঞ হইতে পারেন কিন্তু দেখিবেন, যদি আপনার শরীর মজবুত থাকে, যদি আপনি নিজের হাতে কাজ করিতে পারেন তবে গণিতেই আরও বেশি দক্ষতা জন্মিবে।

তাই বলি, আমাদের দেশে এখন শারীরিক উৎকর্ষের দিকে দিন দিন বেশি জোর দেওয়া দরকার। সেজন্য হাতের কাজের প্রতি দৃষ্টি সমধিক হওয়া চাই। আমি বিশ্বাসভরে বলিতে পারি, আপনার হাত যদি কাজে পটু হয়, তবে আপনার মনও বেশি কাজ করিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মহত্ত্ব অনেক বেশি। বলা হইয়াছে যে আমাদের এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহাতে মানুষ তৈয়ারি হইবে—যে মানুষ আমাদের জাতীয় কার্যভার, স্বাধীন ভারতের সমাজের দক্ষা সিদ্ধ করিতে পারিবে। আমি চাই, আপনাদের প্রত্যেকে কিছু না কিছু উৎপাদন করেন। আপনারা প্রত্যেকেই আহার করেন, কাপড় পরেন, ঘরের মধ্যে বাস করেন। আপনি যে সমস্ত জিনিস ক্রয় করিতেছেন অন্তত তাহার কিছুটা যদি উৎপন্ন করিতে না পারেন তাহা হইলে আপনি তো সমাজের গলগ্রহ হইবেন। অন্যের তৈয়ারি জিনিস আপনি চুরি করিতেছেন। আমরা তো এমন সমাজ চাই, যেখানে প্রত্যেকে কিছু না কিছু উৎপন্ন করে। আর যদি প্রত্যেক লোক উৎপাদনশীল হইতে চায়, তবে তাহাকে নিজের কাজ ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া লইতে হইবে। আমাদের সমস্ত শিক্ষার আদর্শ ই এই জন্য—তাহা বুদ্ধিগতই হউক, আর শরীরগতই হউক। আমি তো বুনিয়াদী শিক্ষাকে এই ভাবেই বুঝিয়াছি।

আমি চাই যে সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের প্রত্যেক বালকবালিকা বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করে, যাহাতে সে সে কোন কাজ করিবার উপযুক্ত ভিত্তি যা আহরণ করে; তাহার পরে যদি সে বিশেষজ্ঞ হইতে চায় এবং সেজন্য আরও উচ্চ শিক্ষা পাইতে চায় তাহা হইলে কোন টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে যাইতে পারে। কিন্তু সাত বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষা সকলের পক্ষেই চাই যাহার অন্তর্গত সংস্কৃতি ও চরিত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের হাতে-পায়ে কাজ করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে, বুদ্ধি খরচ করিয়া শরীরশ্রমও করিতে পারিবে। এই প্রকারের সকলের পক্ষে উপযোগী এক বুনিয়াদী শিক্ষা আমরা চাই। কিন্তু আমি ইহারও পূর্বে তাহাকে পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি; এই শিক্ষা শিশুর প্রায় জন্মের সঙ্গেই আরম্ভ হয় এবং প্রতিদিন কাজকর্মের শিক্ষা ইহাতে দেওয়া হয়। ইহা হইতে বুনিয়াদী শিক্ষার বিকাশ

হওক এবং তাহার পর যে উপযুক্ত হইবে তাহাকে বৈজ্ঞানিক, ব্যাঙ্কবিষয়ক, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

পরিশেষে এই কথাই বলিব যে, শারীরিক শ্রমের কাজের অপেক্ষা বড় কাজ কিছু নাই। ইহাতে শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে। আমি আশা করি রাষ্ট্রসরকার পূর্ণ উৎসাহ লইয়া পূর্ণ-শক্তিতে এই কাজে লাগিয়া যাইবেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারকেও নিজের অংশটুকু লইতে হইবে, কিন্তু প্রধানতঃ ইহা রাজ্যসরকারেরই করিবার কথা।

আচার্যের ভাষণ

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় আচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র গবেষণা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছাড়া প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের জন্যও সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে দেশের তরুণদের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মূল্যবান অবদানরূপে স্বীকৃত হইবে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভ্যসমাজ-সম্মত জীবন যাপনের উপযোগী কাজে উপযুক্ত ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে সরকারী কর্মচারী, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত হন তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, উকিল এবং ডাক্তারগণের জন্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে ইহা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে। শিক্ষক-শিক্ষণ এবং মেডিকেল শিক্ষার ব্যবস্থার বহুবিধ উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

সাধারণ শিক্ষাদান ছাড়াও ছাত্রগণ যাহাতে সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ইহাতে তাহাদের বিভিন্নদিকে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বাড়িবে। আর্থিক তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ সম্পর্কে ছাত্রগণ যাহাতে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে তজ্জন্য বক্তৃতামালা অথবা ঐ উদ্দেশ্যে মোটামুটি কোর্সের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বহিঃশিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বয়স্কদের শিক্ষাদান, বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীত, লোক-সাহিত্য এবং জনপ্রিয় সাহিত্য রচনা ও প্রচার, শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের জন্য রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করাই হইবে এই বিভাগের কাজ। আর্থিক ও সামাজিক কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেককেই দুর্ভাগ্যবশতঃ অসময়ে শিক্ষাকাল শেষ করিতে হয়। এই কারণে বর্তমান যুগের চিন্তাধারা হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উপরোক্ত বিভাগ স্থাপন করিলে পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণ নিজের জীবন গঠন এবং এতদ্বারা মানবজীবন গঠনে সহায়তা করিতে পারিবে।

মানবিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয় ছাড়া অন্যান্য বহু চিন্তাকর্ষক বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে এবং এই বিভাগ এই নূতন কার্যভার গ্রহণ করিলে খুব বড় কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই বিভাগ স্থাপনের জন্য ব্যয় খুব বেশি হইবে না। উপরন্তু যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহার পরিবর্তে লাভের অঙ্ক হইবে বিস্তর। এতদ্ব্যতীত স্নাতকদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের উত্তম নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা যায়।

সমস্যার সৃষ্টি এবং উহা সমাধানের সমুদয় দায়িত্ব সরকারের উপর আরোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা সমীচীন নহে। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে শুধু ভোটদান এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমালোচনা করিলেই লোকেদের দায়িত্ব শেষ হইবে না। দেশ তাহাদের নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করে। গণতন্ত্র যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব, ১৯৫৩]

উপাচার্যের ভাষণ

ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"....এক সময় ছিল যখন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত স্তরের গবেষণায় একচেটে অধিকার ছিল। এখন অন্যান্য গবেষণা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, অনেকগুলি হয়তো আমাদের চেয়ে উপযুক্ত পরিমাণে অনেক বেশি কর্মী ও গবেষণার উপকরণে পূর্ণ। চারদিকে আদর্শকে অনুকরণ করার সাড়া দেখা দিয়েছে। আমরা আরও বহুদিন পূর্ব হতে এ পথে যাত্রা করেছি, যেন পিছিয়ে না পড়ি। ১৯২১ সালে বার্লিনে অধ্যাপক নার্নস্টের গবেষণাগার দর্শনের কথা আমার স্মরণ আছে। নার্নস্ট জার্মানির ফিজিক্যাল কেমিস্টদের অগ্রণী ছিলেন, তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন এবং তাঁকে 'হে মহান' বলে তাঁর সাথে কথা বলতে হত। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হে মহান, চালর্হেমে হেবেরের গবেষণাগারের থেকে আপনার গবেষণাগার হীন কেন? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে জার্মানী প্রাচ্য হতে যে যুবক আসছে, সে এই প্রশ্নের উত্তর ভাল জানবে। বহু খাঁচার মধ্যে পাখী গান গাইতে অস্বীকার করে যান্ত্রিক উপকরণের সাহায্য ছাড়া মস্তিষ্ক খাটিয়ে সমস্যার সমাধান অনেক বেশি বুদ্ধিমান লোকে করে থাকে।

গবেষণার উন্নতি সাধন করা কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলিত দায়িত্ব। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়-সাহায্য-মঞ্জুরি-কমিশন আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করেছেন:

কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওলজি, ফিজিওলজি, বোটানি, জুলজি, এপ্লায়েড্ ম্যাথম্যাটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ও আনথ্রপলজি বিভাগে বই ও উপকরণ কেনবার জন্য ৪'৮৯ লক্ষ টাকা।

এপ্লায়েড্ ফিজিক্স বিভাগকে আধুনিকতম উপকরণে সজ্জিত করার জন্য ৮০,০০০ টাকা অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

আর্টস বিভাগের প্রয়োজনের প্রতি কমিশন উদাসীন থাকেন নি। আর্টস বিভাগের গ্রন্থাগারের

অন্ত ৭০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আশা করা যায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সমপরিমাণ সাহায্য নিয়ে এমন একটি প্রস্তাবের সঙ্গে তোলা যাবে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত হবে।.....

.....কয়েক বছর আগে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, ভারতের বিরাট সমস্যাগুলির সমাধান শুধু রাজনৈতিকদের দ্বারা হতে পারে না, তাঁদের সেই কল্পনা ও বিশেষ জ্ঞান থাকতে পারে না। আবার এই সমস্যাগুলির সমাধান শুধু বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হতে পারে না। কারণ তা করবার মত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাদের থাকে না। সুস্পষ্ট সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে উভয়ের সহযোগিতার দ্বারা এই সব সমস্যার সমর্থন করা যায় ও করতে হবে। এই কারণে প্রগতিশীল ও সম্ভাবনাময়ী ভারতবর্ষ দ্রুত গড়ে তুলবার জন্য সরকারের নীতি হল যে, বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনে তাদের গড়ে তোলার জন্য যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এরাই ভবিষ্যতের "গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। (key men) আমার মনে হয়, যদি এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ (key men) গড়ে তুলতে সহযোগিতা করতে রাজী হয়, তবে এই সামাজিক লক্ষ্য সাধন করতে অর্থের অভাব হবে না।.....

.....স্নাতক বিভাগের ছবি মোটেই উজ্জ্বল নয়। আমি বরং বলতে চাই বেশ অন্ধকার, কেবলএখানে সেখানে কয়েকটি উজ্জ্বল পোঁচ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এইদিকে এখন পর্যন্ত উপযুক্ত নজর দিতে পারে নি।

শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ গৃহ হতে আসে। তাদের জ্ঞানার্জনের স্পৃহা প্রবল এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক সামাজিক উন্নতির জন্য তারা ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত। যুদ্ধের ফলে এবং স্বাধীনতার পর যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী দুইটুকরো রুটির মাঝখানে মাখনের মত, যা জীবনরূপ রুটিকে সুস্বাদময় করে তোলে। কিন্তু বর্তমানে তারা সংগঠিত শ্রমিক ও সংগঠিত মালিক শ্রেণীর পরস্পরের সংঘর্ষের মধ্যে পিষ্ট হয়ে যাবার বিপদের মধ্যে রয়েছে। জনসাধারণের তহবিলের দ্বারা মালিক তাঁরা যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ উপশমের দাবি অবহেলা করেন তবে তা দুর্ভাগ্যের হবে। যে দুঃখ লাঘব করার কথা তাঁরা আশু বলে মনে করেন তা হচ্ছে, যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলের গণ্ডি পার হবার পর বিদ্যালাভের উপযুক্ত সুযোগ পায়।.....

বারো হাজার গরীব ছাত্রের জন্য 'হোম' স্থাপন করবার একটি পরিকল্পনা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে এই ধরণের কয়েকটি হোম স্থাপন করবার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা শীঘ্রই পাওয়া যাবে। আমি আশা করি, এই পরীক্ষা সফল হবে এবং ভবিষ্যতে এর সুবিধা প্রত্যেকটি গরীব ও উপযুক্ত ছাত্র যারই প্রয়োজন হবে, তার জন্য ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের জাতীয় সরকারের লক্ষ্য হল একটি মহান রাষ্ট্র গঠন করা। দেশের যাবতীয় সম্পদ—মানুষ ও উপকরণ—এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নিয়োজিত হবে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে শিক্ষার সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছবার জন্য প্রতিভাশালী ছাত্রের পক্ষে দারিদ্র বাধা হয়ে উঠবে না.....

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বলেছে স্নাতক শিক্ষার্থীর প্রতি অধ্যাপকের ভাল শিক্ষাদান ও ব্যক্তিগত যত্ন নেওয়া সাধারণ নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র। কলিকাতার অপকৃষ্ট কলেজগুলিতে যে গুলি আবার সংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম, পাশের শতকরা হার ত্রিশের কম। এই বিরাট ক্ষতি

ও তজ্জনিত হতাশাকে রোধ করার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণ ও সরকারের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেওয়া উচিত।

এই ক্ষতি রোধ করার একটি উপায় হচ্ছে, কলেজগুলি আকারে ছোট করা যেখানে ছাত্রদের বিদ্যাচর্চা ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠবে। আমি সম্প্রতি একটি কলেজ দেখতে গিয়েছিলাম যেখানে তারা শতকরা একশতটি ছাত্র পাশ করার অদ্বিতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে। এর থেকে দেখা যায়, আমাদের ছাত্রেরা শিক্ষায় যোগ্য নয় বলে যে শিক্ষক সমালোচকেরা মনে করে থাকেন, তা ঠিক নয়। এইজন্য আমরা সরকারকে চাপ দিচ্ছি যে বর্তমানে কলিকাতার অধিবাসী, উদ্বাস্তু পরিবারের ১৪০০০ জাতক ছাত্রেরা উপস্থিত কলেজগুলিতে, যেগুলি এখনই যেন বড়, যেন ভিড় না করে। পুনর্বসতি মন্ত্রীবিভাগের সাহায্যে কলিকাতার উপকণ্ঠে পনেরটি নূতন আর্টস ও সায়েন্স কলেজ স্থাপন করা হোক।.....

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন যে শিক্ষকের গুণগত ও মর্যাদাগত উন্নতির মধ্যে শিক্ষার মূল কথা নিহিত রয়েছে। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আজকার দিনে সকল সামাজিক সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এই কারণে শিক্ষাবৃত্তিতে কোন ধরণের লোক আসবেন প্রধানত নির্ভর করছে এই বৃত্তিতে কত মাহিনা পাওয়া যাবে তার উপর। সন্দেহ নাই যে দেশ সরল জীবনযাত্রা, ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত সে দেশে এর ব্যতিক্রম ঘটবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে তিন বছরের ভিত্তি কোর্সের ভিত্তিতে কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছে। আমরা আশা করতে চাই যে, যখন এই সব পরিকল্পনা-গুলি কার্যকরী করা হবে, তখন তাতে আমাদের কলেজগুলিতে বর্তমানে যে সব শিক্ষকেরা আছেন তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং যথার্থ কৃতী ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে এইক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

তারপর, এদেশে বেকার সমস্যা হ্রাস করতে হলে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে সমষ্টির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমষ্টির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারলে জীবনযাত্রার অনুকূল বাস্তব ভিত্তি গড়ে তোলা যাবে।

...দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কলিকাতার শিল্পাঞ্চলকে অনুন্নত অঞ্চল গণ্য না করলে আর বেকার সমস্যার হ্রাসের জন্য আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা না করলে এই এলাকাগুলি সমাজ-বিরোধী শক্তি সমূহের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হবার আশঙ্কা আছে। এই সঙ্কটের কথা বিবেচনা করে কারখানা গুলিকে ক্রমশঃ বৃত্তিমূলক সংস্থায় পরিণত করা যেতে পারে।

...স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য মেয়েদের উপযোগী গৃহস্থালী বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিশুপালন এবং সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হেষ্টিংস ভবনে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কলেজ স্থাপিত হবে, এই কলেজে মেয়েদের এই সব বিষয়ে শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

...সমাজসেবামূলক কাজের সম্প্রসারণের জন্য গ্রামাঞ্চলে যুব-শিবির স্থাপনের আমাদের এক পরিকল্পনা আছে, এই শিবিরে ছাত্ররা স্থানীয় লোকের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য দুই লক্ষেরও উপর টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব ১৯৫৫]

বিশ্বভারতী সমাবর্তন উৎসব

২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

আচার্য জওহর লাল নেহেরু তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বিশ্বভারতীর সঙ্গে ভারতের সমস্যার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এটা যন্ত্র যুগ, যন্ত্রযুগের সঙ্গে যুদ্ধের খুব নিকট সম্পর্ক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগ হিসাবে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে দেশের কল্যাণকর্মেও প্রয়োগ করিতে পারা যায়। দেশকে রক্ষা করিতে হইবে, আক্রান্ত হইলে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত বিদ্যা শেখা চাই; দেশের লোকদের খাওয়াইতে হইবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর না হইলে তাহাও সম্ভব হইবে না। ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলেও বিজ্ঞানেরই সাহায্য অবলম্বন করিতে হইবে। তাই যে দিক দিয়াই দেখি, বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য।

কিন্তু যন্ত্রের পূজা করা অর্থে মানুষকে, আত্মাকে দুর্বল করা। যন্ত্রকে আয়ত্ত করিতে হইবে, না হইলে আমরা নীচে পড়িয়া যাইব, মাঝামাঝি পথ কই? উভয়ের সমন্বয় আনা চাই, যাহা অতীত ভারত জানিত।

রাজনীতিতে আমরা দুইটি ব্লক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে চাই। বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিলেও আমরা এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে অন্য দিকেও জোর দেওয়া যায়। বিশ্বভারতীর স্থান সেইখানে, নিখিল ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে। অনুকরণ নয়, স্বাধীকরণই শিক্ষার আসল জিনিস—সুতরাং এ বিষয় যথেষ্ট চেষ্টা হওয়া উচিত—বিশ্বভারতীর কার্য অপ্রতিহতভাবে অগ্রসর হউক।

উপাচার্য ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচি বলেন, —আমাদের আচার্য শ্রীজওহরলাল নেহরু, প্রধান অতিথি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইয়া আমি গর্ব অনুভব করিতেছি। দুঃখের বিষয়, পার্লামেন্টের আইন অনুসারে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হইতে আমাদের সময় স্বাভাবিক ভাবে কাটে নাই। আমাদের প্রথম উপাচার্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনবরত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার জন্য আমাদের ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিক এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, প্রথমত ছাত্র হিসাবে, পরে তাঁহার পিতৃদেবের সহকারী হিসাবে, এবং পরিশেষে ইহার প্রধান কর্মাধিকারী হিসাবে। তিনি এখানকার কাজকর্ম, আদর্শ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গূঢ় ভাবে জানিতেন। নিঃসন্দেহ, প্রতিষ্ঠাতার মূল পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার যোগ্যতা তাঁহারই ছিল সর্বাধিক, কিন্তু তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান না হইয়া আমরা বঞ্চিত হইয়া রহিলাম। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁহার প্রবীণ বয়স ও ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও এই মধ্যবর্তী সময়ে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্কটকালের বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁহারা কার্যনির্বাহ করিবার জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আমাদের বন্ধুদের মন হইতে কতকগুলি আশঙ্কা

দূর করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। বিশ্ব ভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করায় অনেকে অনেক কিছু ভাবিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সে মন্তোভাব এখনও চলিতেছে। আশঙ্কা করা হয় যে ইহার ফলে কবি যে প্রতিষ্ঠান রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবে, এবং ইহা হইয়া থাকিবে অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুকৃতি মাত্র। কিন্তু আমরা কবীরা জিনিসটাকে দেখি অন্যভাবে। যে শোচনীয় অচল অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ফলে তাহার অবসান ঘটিয়াছে, আমাদের নিজেদের মত কাজ করিবার স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছে। কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল আমরা আমাদের শিক্ষা-বিভাগগুলি আমাদের প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমাদের আদর্শকে বিসর্জন করিয়া তুলিয়াছিলাম। এই সংযোগের ফলে আমাদের আদর্শের সহিত সংগতি রাখিয়া পাঠ্যবিষয় প্রবর্তনের স্বাধীনতা আমরা হারাইয়াছিলাম, প্রবেশিকা ও স্নাতক-পূর্ব স্তরে আমাদের পাঠদান প্রণালীও গৌণত ব্যাহত হইয়াছিল। আমরা শুধু বই পড়া বিদ্যাই শিখাইতেছিলাম, মূল পরিকল্পনার ক্ষতি করিয়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তির ফলে এই অবস্থার অবসান ঘটিয়াছে।

এই নবলব্ধ স্বাধীনতার সুযোগে কি করিয়া আমাদের আদর্শানুযায়ী বিশ্বভারতীকে পুনরায় সংগঠিত করিতে পারি, তাহা অন্য কথা।

কবির মনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ সম্বন্ধে পরিকল্পনা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে ইহার গোড়াপত্তন হইতে সুরু করিয়া বর্তমান পরিণতির বিভিন্ন স্তরের কথা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়রূপে ইহার প্রতিষ্ঠা। তখন ইহা ছিল ভারতের প্রাচীন আশ্রমগুলির মত ছোট একটি বিদ্যালয়, যদিও পাঠ্য ও পাঠনার রীতি আধুনিক কালোপযোগী। ১৯০৫ হইতে কবির মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়, আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে যার যার এমন এক জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। জাতির জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে নীরবে গঠনমূলক কাজ করা প্রয়োজন—এই ধারণার বশে তিনি গ্রাম সংগঠনের কাজে নানাবিধ পরীক্ষা চালাইতে লাগিলেন। ১৯২১ সালে বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিভাগ ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ইহার দুইটি অঙ্গ। আর এই বিশ্ববিদ্যালয় তখন প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হইল। কবির মানস চক্ষুতে যে ছবি ছিল, তাহা হইল অতীতের বৃহৎ ভারত ও ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারতের সমন্বয়। তিনি জানিতেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ ও সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির এক অখণ্ড যোগ আছে, তাই তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বভারতী এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আদান প্রদান ও মিলনের ক্ষেত্র হয়। পশ্চিমের সংস্কৃতির চর্চা করিয়া উহাকে পাশাপাশি রাখিয়া পরীক্ষার পর বিশ্বভারতী দেওয়ার ও নেওয়ার সাধনায় ভুবিয়া যায়।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এই দুইয়ের শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক। শুধু জ্ঞানের চর্চা করিলে হয় না, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠার বিকাশের দ্বারা শিক্ষার পূর্ণতা সাধন আবশ্যক। তাই বিশ্বভারতীর শিক্ষা প্রাণকেন্দ্রিক, শুধু পাঠদান ইহার রীতি নয়। অধ্যাপক, ছাত্র, গ্রামবাসী, সকলের সঙ্গে সকলের মেলামেশায় প্রাণের স্পর্শ জীবনের স্পন্দন নিয়ত অনুভূত হয়।

আমরা তাই ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এই ভাবটি জাগাইতে চাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ডিগ্রি লাভ নয়, স্বাধীন উন্নতির জন্য শিক্ষা, ডিগ্রি শুধু তার একটা

যাপকাঠি। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের তাই এখানে নিজের মতে নিজের প্রণালীতে শিক্ষা দিবার স্বাধীনতা আছে।

আমাদের শিক্ষাবিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে। এখানে ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ স্কুলের সঙ্গে যুক্ত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের অনুমোদন অনুযায়ী তিন বৎসরের বি. এ অনার্স কোর্স। আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে সর্বত্র কবির প্রাচ্যভারতী আদর্শকে বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের গবেষণা বিভাগে এখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ, জৈন, হিব্রুতী, জাপানী, চৈনিক সব রকম সংস্কৃতিমূলক গবেষণারই কাজের সুবিধা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা, হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও লোক সাহিত্য সংগ্রহের বিভাগে কাজ বেশ ভালই চলিতেছে।

বিনয়ভবনের অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্র শ্রীনিকেতনে বিনয়ভবনে স্থানান্তরিত করায় বুনিয়াদী-শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। হাতের কাজ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের এক স্নাতকোত্তর বিভাগ আমাদের শিক্ষণ কলেজে খোলা হইয়াছে।

শ্রীনিকেতনে আমরা প্রাথমিক হইতে কলেজী স্তর পর্যন্ত ব্যাপক এক পল্লী-শিক্ষা-বিভাগ ধীরে ধীরে বিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার ভিত্তি হইল আমাদের পুরানো শিক্ষাসত্র ও তাহার বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্তর। আগামী বছর হইতে চার বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী বিভাগ খোলা হইবে, তাহার সঙ্গে থাকিবে এক বহুমুখীনাবিকা পরিকল্পনা। আগামী বর্ষ হইতে তিন বৎসর কলেজী বিভাগ খোলা হইবে—তাহাতে প্রধান প্রধান কাজ শিখানো যাইবে। সমাজ-কল্যাণ পরিকল্পনায় যে সমাজশিক্ষার কেন্দ্রের সূচনা হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক ভাবে কাজ করিতেছে এবং প্রতি বৎসর ৮০ জনের পরিবর্তে ১৬০ জনের শিক্ষা দান করিতেছে।

শ্রীনিকেতনে আমাদের পরিকল্পনা লইয়া যদি অগ্রসর হইতে হয় তবে আমাদের কৃষিবিদ্যার চর্চা যাহাতে আরও বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করার উপায় চাই। বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের মুরগী পালনের, গো পালনের এবং পরীক্ষামূলক ভাবে চাষ বাস করিবার ব্যবস্থা আছে। এখন চাই এসব বিষয়ে তত্ত্বমূলক শিক্ষা দিবার আয়োজন, যাহাতে কৃষি ও পশুপালনের একটা ভাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবি যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তদনুযায়ী আমরা পল্লীসংগঠন কার্য চালাইয়া আসিতেছি। প্রায় ৫০টি গ্রামে বিশেষভাবে কাজ করা হইতেছে, আরও ৫০টি গ্রামেও তাহার দ্বারা অল্প বিস্তর চলিতেছে। শ্রীনিকেতনে যে সব পরীক্ষা হইতেছে তাহার ফল গ্রামবাসীদের সামনে দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে। যাহাতে আমাদের অভিজ্ঞতা দেশবাসীদের কাজে লাগে সেজন্য আমাদের হাতে জাতীয় গঠন ব্রত একটা দেওয়া চাই।

আমাদের আর্থিক অবস্থা কোনও ক্রমেই অচল নয়। যেখানে যেখানে সম্ভব আমরা ব্যয় সংকোচ করিয়াছি। কর্মখালি হইলে তাহা পূরণ করি নাই, নূতন পরিকল্পনা কাজে পরিণত করি নাই। কিন্তু বিশ্বভারতীর রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন দায়িত্ব আসিয়াছে। স্নাতকোত্তর বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছে, সেজন্য আমাদের উপযুক্ত শিক্ষক নাই। প্রধান প্রধান বিষয়ে আমরা তিন বৎসরে অনার্স পড়াইতে

আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের কর্মীদের উপর বড়ই চাপ পড়িয়াছে। প্রতিবৎসর বিদেশাগত ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। তাহাদের প্রতি আমাদের কর্মীদের বিশেষ মন দিতে হয়। সুতরাং আমাদের কাজকর্ম নানাদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে। থাকিবার জায়গা আরও চাই। পড়িবার জন্য লাইব্রেরীতে আরও জায়গা চাই।

বিশ্বভারতী কবি আমাদের নিকটে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান আয়তনে বড় নয়, কিন্তু ইহার গুরুত্ব আছে। এই গুরুত্ব সাধারণ ভাবে সংখ্যার হিসাবে মাপা যায় না, আশ্রমের অধিবাসী হিসাবে ইহার পরিমাপ করিতে হইবে। এখানে ভারতের যে প্রাণশক্তি আছে তাহা চাক পিটিয়া বুঝাইতে হয় না। অনুভূতি দিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। সহানুভূতি দিয়া, সাহায্য করিবার মনোবৃত্তি লইয়া এই উদার উত্তরাধিকার বুঝিয়া লইতে হইবে। কবি শিক্ষাকে আপন ঘরে আসিবার দৃষ্টিতে দেখিতেন, যাহারা এখানে লেখা পড়া করিতে আসে তাহাদের 'নীড়' যাহাতে হইয়া হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল; যাহারা অনেক বৎসর পূর্বে এখানকার লেখাপড়া শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ইহা এখনও তাহাদের 'নীড়' হইয়া রহিয়াছে, ইহা বড় সামান্য কৃতিত্ব নয়।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসবে সকলে সমবেত হইয়া সর্বাগ্রে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতীর পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ ও প্রণাম করি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে কবির মনের আকাঙ্ক্ষা কি ছিল তাহা তিনি নিজেই এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"যাতে যাতে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। ... আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সকল করিয়া মনের মধ্যে নীড় করাইতেছি, সে তপোবন সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় দিতে পারে না—ত্রিশ কোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। একথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শকেই সে দেশের তপস্বীরা বল রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্মে লিপ্ত। অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে নিষ্ঠিদান করে। ভারতবর্ষও

আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে—কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্ব-রজ্জু মোচন করিয়া দিবে।"

এই কল্পনাকে ভিত্তি করিয়া ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মনে এ ধারণাও নিশ্চয়ই ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রচলিত শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে সর্বাংশে শুভ নয়। তাঁহার তৎকালীন রচনা ও বক্তৃতা হইতে আমরা একথাও জানিতে পারি, সেই শিক্ষা যে ছাত্রদের মনকে স্ট্যাটিক বা স্থাণু করিয়া দেয়, নূতন সত্য বা তথ্য আবিষ্কারের মৌলিক শক্তি হ্রাস করে এবং আত্মনির্ভরতা নষ্ট করে—এই উপলব্ধিও তাঁহার হইয়াছিল। ইহারই প্রতিকারের জন্য তিনি নগর কলিকাতার কর্মকোলাহল হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে বোলপুরের এই উন্মুক্ত অবাধ প্রান্তরে প্রকৃতির কল্যাণকর পরিবেশে সঙ্গীত শিল্প কারু ও সাহিত্যকলার মধ্য দিয়া দেশের তরুণেরা যাহাতে আত্মস্থ হইয়া ভারতের পূর্বগৌরব ফিরিয়া পায় সেই মহৎ উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আয়োজন করিলেন।

সুখের বিষয়, তিনি তখন একক ছিলেন না। বঙ্গমাতার অনেক কৃতবিদ্য গুণীজ্ঞানী সুসন্তানও বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া লোককল্যাণকর একটা কিছু করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। আমি ১৯০৫ সনে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণের কথা আপনাদের স্মরণ করাইতেছি। আন্দোলন আরম্ভ হইল এই ব্যবচ্ছেদের উদ্দাম প্রতিবাদে। কিন্তু অচিরাৎ এই বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। লোকে বুঝিল, এই প্রাণহীন গতানুগতিক শিক্ষাই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে, শহরে শহরে আলাপ-আলোচনা-বক্তৃতা-আন্দোলন চলিতে লাগিল। দেশের তরুণেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলামখানা" আখ্যা দিয়া তাহা হইতে বাহির হইতে চাহিল। আমি নিজে যদিও এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগ দিই নাই, তথাপি এ কথা অস্বীকার করিতে পারি নাই এবং এখনও পারি না যে, প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে দুর্বল এবং মনুষ্যত্বকে খর্ব করে। যে শিক্ষায় সর্বতোভাবে মনের বিকাশ হয় না, সেই শিক্ষায় মানুষকে যন্ত্র-চালিত নির্জীব পুত্তলিকাবাহে পরিণত করে, সেটুকু তাহারা মুখস্থ করে, সেইটুকুই উদ্‌গিরণ করে মাত্র, আয়ত্ত ও জীর্ণ করিয়া সেই শিক্ষাকে নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না।

স্বদেশী আন্দোলনের আনুষঙ্গিক এই শিক্ষা-আন্দোলনের মধ্যে এই কথাটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, ছাত্রেরা কোনও প্রকারে একটা ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া অর্থোপার্জনের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, অর্থাৎ ডিগ্রীটাই লক্ষ্য, শিক্ষাটা নয়। ক্রমে ক্রমে দেশের বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নেতারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতার কথা উপলব্ধি ও স্বীকার করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তারিখে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ঠিক ৪১ বৎসর পূর্বে কলিকাতার টাউন হলে বাংলাদেশে একটি আদর্শ জাতীয় বিদ্যা-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আহ্বানে, সর্বজনমান্য ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হইল। বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দেশপূজ্য ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় "বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিবৃতি" শীর্ষক দীর্ঘলিখিত ইংরেজী ভাষণ পাঠ করেন।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ উহারও ঠিক চৌদ্দ বৎসর পূর্বে, এমন কি

তাঁহার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও নয় বৎসর আগে, তাঁহার সুবিখ্যাত "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনিও সেই ১৫ই আগস্টের (১৯০৬) মহতী সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার "জাতীয় বিদ্যালয়" নামক প্রসিদ্ধ ভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াও তাঁহার মনে নূতনতর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্যা শিক্ষার সহায়তায় ভারতীয় ছাত্রদের জীবনযুদ্ধে জয়ী দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল এবং ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মনেপ্রাণে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে যোগদান করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় প্রথম পর্ব, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ দ্বিতীয় পর্ব, ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে তৃতীয় বা শেষ পর্ব বিশ্বভারতী। কবির উক্ত ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের তারিখের মধ্যেই বীজাকারে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাটি এইভাবে ছিল—

"আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ-দেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোক-তরঙ্গ আমাদের চিত্তকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, তাহার পসরা বোঝাই হইয়া উঠিল—এমন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না—সময় আসিয়াছে, যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানাস্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাধনের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থার পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।"

এই দীর্ঘ মাটি খুঁড়িয়া বাহির হইতে আমার দীর্ঘ তেরো বৎসর সময় লাগিল। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১৩২৬) কবি সর্বপ্রথম এইভাবে নাম-প্রস্তাব করিলেন—

"আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই। তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয়, উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"

৩রা জুলাই ১৯১৯ (১৮ই আষাঢ় ১৩২৬) আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার দিন আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

"বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে আপ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল। জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে···বিশ্বভারতী

একটা মস্ত ভার, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠুক।"

ইহার প্রায় আড়াই বৎসর পরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ ১৩২৮, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে এবং দেশ বিদেশের বহু মনীষীর উপস্থিতিতে কবি সর্বসাধারণের হস্তে তাঁহার বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন, "এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হ'লেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।" পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, "উপনিষদের একটি বাক্য আমরা গ্রহণ করেছি, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্—যেখানে বিশ্ব এক নীড়ে বাস করে। বিশ্বভারতীর প্রধান কথা এই যে বাহিরের বিশ্ব সেখানে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে।" আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা…"

এইটুকু ইতিহাস। ইতিহাসের মধ্যেই আমরা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য বীজাকারে পাইলাম এবং তাহার ক্রমপরিণতিও দেখিলাম। জনসাধারণের হাতে বিশ্বভারতীকে সমর্পণের পর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ আরও প্রায় ছুটি বৎসর ইহার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতির গুণে, বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যের উদারতায় কবির জীবদ্দশায় ও তাঁহার তিরোধানের পরও এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তবুও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব কি? এই সভায় এমন অনেকে উপস্থিত আছেন যাঁহারা ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন অথবা এখনও যুক্ত আছেন; যাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও অনেকে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের কাছে আমার এই প্রশ্ন—এখানকার শিক্ষা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় কোনও তারতম্য কি তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন? অন্যত্র অবলম্বিত শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা এখানকার প্রণালী যে উচ্চতর সে ধারণা কি তাঁহাদের মনে বদ্ধ? বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রেরা কি এমন কিছু পাইয়াছেন যাহা অন্যত্র দুর্লভ? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্বকবি, তাঁহার ভাব-দৃষ্টিতে যাহা উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এই প্রতিষ্ঠানের যে ভাবী পরিণতরূপ তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা হয়তো আমাদের ধারণার অতীত। যে আবেগ এবং উদ্দেশ্য এই বিশ্বভারতী স্থাপনে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল তাহা আজ আমাদের বিচারের বিষয় নয়, যাঁহারা এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনে ইহা কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—সেই সাক্ষ্যই বিশ্বভারতীর সার্থকতার প্রমাণ দিবে।

বিশ্বভারতীর কর্মসূচীর মধ্যে দেখিতেছি ইহার দুইটি দিক। এক দিকে, এখানে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞানের পরস্পর-বিনিময়ের চেষ্টা হয়; অন্য দিকে ছাত্রেরা মুক্ত আকাশের তলে প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্ব-স্ব স্বভাবানুযায়ী যাহাতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে তাহারও চেষ্টা করা হয়। এই দুই ধারার যথার্থ তাৎপর্য আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে। ১৯০৬ সনের আট বৎসর পরেই জগৎব্যাপী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কবি বুঝিতে পারিলেন, এই আত্মনাশী সংগ্রামের মূল কারণ জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে পরস্পর অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসও পরস্পরকে না চেনার ফলে হয়। কবি তাই

সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিনিময়ের দ্বারা জাতিতে জাতিতে পরস্পর পরিচয়ের ব্যবস্থা করিলেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী অনুভব করিলেন প্রচলিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলিই আমাদের দাসমনোভাব বৃদ্ধি করে। তাহাই সেগুলিকে বর্জন করিবার উদাত্ত আহ্বান তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন, এই বর্জনের ফলে আমাদের মন পঙ্গু হইবে, আমরা বাহিরকে ঠেকাইতে গিয়া নিতান্ত কূপমণ্ডূক হইয়া পড়িব, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার অসার্থকতা-বিষয়ে উভয়ে একমত হইয়াও ভিন্ন পথ ধরিলেন। কবি তাঁহার বিশ্বভারতীকে সমগ্র বিশ্বের মিলনক্ষেত্র করিতে চাহিলেন।

বিশ্বভারতী যেমন আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র হইল তেমনি ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনক্ষেত্রও হইল। কবি বিশ্বভারতীতে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজীয়, ইসলাম, শিখ প্রভৃতি যাবতীয় সাম্প্রদায়িক মতামত উহাদের সহিত আলোচনার সুযোগ দিয়া ভারতের ঐক্য স্থাপনের ও সকল সম্প্রদায়ের পরস্পর পরিচয়ের মধ্য দিয়া ভারতের স্থায়ী শান্তিবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। এই মিলন, সৌহার্দ্য ও শান্তি যে অলীক কথার কথা নহে ভারতের অতীত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বভারতীতে পূর্বতন প্রীতির বন্ধন পুনঃস্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

কবি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে সংগ্রাম ও সংঘর্ষে কণ্টকিত পৃথিবীতে প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সাধনের ও আদর্শ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের উপর পড়িয়াছে। বিশ্বের মানুষের চিত্ত এখনও অস্থির, পথ এখনও সঙ্কটময়। আরও একটি মহাযুদ্ধ ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। অল্প ব্যবধানে পর পর দুইটি বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ ভয় বা সন্দেহ প্রভৃতি ব্যবধান বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহারা পরস্পর আস্থা ও বিশ্বাস হারাইতেছে। পাশ্চিম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতিসমূহের সুকুমার মনোবৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া যেন স্বার্থবুদ্ধি প্রবলতর হইতেছে, নৈতিক বুদ্ধি হ্রাস পাইতেছে। ইহার পরিণাম শুভ নহে। আমরা পৃথিবীর বহু জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস জানি। কোথায় গেল রোমের বিরাট সাম্রাজ্য, বাইজেনটাইন সভ্যতার অজস্র দীপমালা নির্বাপিত হইয়া কোন অন্ধকারে বিলুপ্ত হইল। মিশর, অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন, চাল্ডিয়া—দুর্জ্ঞেয় প্রস্তরলিপি ও ইষ্টকপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ছাড়া এই সব মহান্ সভ্যতার চিহ্ন কোথায়! কিন্তু সেই সুদূর অতীতকাল হইতে বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া ভারত এখনও সজীব আছে; মহাকালকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, হয়তো তিনি এখনও ভারতকে দিয়া জগতের হিতসাধন করিতে চান। ভারতের এখনও কিছু দেয় আছে। ইহার জন্য ভারতকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা দুইশত বৎসরের ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু এই বিশ্বহিতসাধন-ব্রত পালন করিতে হইলে আরও সাধনা, আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন। আজ এই বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আমাদের মনে এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া জাগিতেছে, সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের প্রকৃষ্ট পন্থা কি? কবি বলিয়াছেন, আদান-প্রদান-অধ্যাপনা জ্ঞান-সংস্কৃতি সাধনাই সেই পন্থা। একদা তক্ষশীলা নালন্দা হইতে যেমন প্রেম ও মৈত্রীর বাণী সারা বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল বিশ্বভারতীও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। শুধু শাস্ত্রানুগতিক ইতিহাস-বিজ্ঞান-সাহিত্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-অলঙ্কার-মনোবিজ্ঞান চর্চাই এখানে হইবে, ইহা তিনি চাহেন নাই। তিনি ইহাও জানিতেন, মুখে ও লেখায় কথা বলাই মানুষের চরম-

বিকাশের একমাত্র পথ নহে, শুষ্ক জ্ঞানালোচনা মানুষকে সম্পূর্ণতা দান করে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৃজনের যে প্রেরণা বর্তমান তাহার প্রয়োগ ও ক্রমোৎকর্ষ বিধানই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কলা-কৌশলের সঙ্গে কর্মকুশলতা যুক্ত হইলেই তবে জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের কথায় এবং কাজে সমন্বয় ঘটিলেই তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। কবির উদ্দেশ্যের কথা স্মরণে রাখিয়া সঙ্গীত-চিত্র-সাহিত্যের সহিত কারুশিল্প, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া চলিতে হইবে, জ্ঞানের সহিত কর্মের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ইহাই বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য, এবং এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইবে।

আমি জানি শ্রোতাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগিবে। উচ্চপ্রকার শিক্ষার সামঞ্জস্য যদি হিতকর হয় তাহা হইলে সর্বত্র সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না কেন? ইহার জবাব এই যে, বাংলা দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এখানে পাঁচ ছয় শত ছাত্রের জন্য যাহা করা সম্ভব, দশ লক্ষের জন্য হঠাৎ তাহা করা সম্ভব নয়। তাহার উপযুক্ত শিক্ষকও নাই, সাজসরঞ্জামেরও অভাব আছে। সকল ছাত্র এবং সকল অভিভাবক এই শিক্ষাব্যবস্থা না মানিতেও পারেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ-পরিচালিত বিদ্যামন্দিরের যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তাহা হইতে জানি যে, যন্ত্রবিদ্যা ও কারু-শিল্পবিদ্যায় ছাত্রদের যেমন আগ্রহ, সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের শিক্ষায় তাহারা মোটেই তেমন উৎসাহী নহে।

আর একটি প্রশ্নও উঠিতে পারে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের স্থান কোথায়? আমি বলি, স্থান আছে দৃষ্টান্তমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতিষ্ঠাতা-কবির সঙ্কল্প অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং ভারতীয় প্রদেশসমূহের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সাহিত্যবিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য। এই বিভাগের আরও প্রসার হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গীত চিত্রকলা কারুশিল্প ও অন্যান্য ব্যাবহারিক বিজ্ঞান-বিভাগের আরও উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে সমগ্র দেশের মধ্যে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে এখানে গড়িয়া উঠিবে কবি ইহাও চাহিয়াছিলেন, সেই সুমধুর সম্বন্ধ আশা করি এখানে এখনও আছে। তাহাও আদর্শ হিসাবে সমগ্র দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুপ্রাণিত করিবে। ইহা প্রকৃত শিক্ষকদের শিক্ষানবিশীর ক্ষেত্র হউক। শিক্ষকের কাজ প্রদীপের মত, সে নিজে না জ্বলিলে অন্য দীপশিখায় আগুন ধরাইতে পারে না। শিক্ষকের শিক্ষায় ও ব্যবহারে ছাত্রেরা মহত্তর জীবনের প্রেরণা না পাইলে তাঁহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হইবে, প্রাণহীন শিক্ষা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাথরের মত তাহাদের বুকে বোঝাস্বরূপ চাপিয়া বসিবে, তাহারা তাহা প্রয়োগ করিতে পারিবে না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেমের ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ঘটিলেই তবে তাহারা পরস্পরকে অনুপ্রেরণা জোগাইবে, উদ্বুদ্ধ করিবে। এখানে বিশ্বভারতীতে গুরুদেবের গুরুতর শিক্ষার আদর্শ অব্যাহত থাকুক, আমাদের অন্ধকার দেশের দীপশিখা জ্বালাইবার ভার ইহারা গ্রহণ করুন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় কবিও বলিয়াছিলেন, "সকল দেশের আদর্শকেই সে দেশের তপস্বীরা বল রক্ষা করিয়া থাকেন।" এখানে সেই তপস্বীর দলই গঠিত হউক।

কবির ভাষায় আমার বক্তব্য শেষ করি—

"এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা

নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে—তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়—বিশ্বাসবিশিষ্ট হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে—তাহারা যেন অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করে,

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং।

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে,

ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।"

২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৪

সমাবর্তন অভিভাষণ

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিগত ৩১শে জানুয়ারি তারিখে গৌহাটি হইতে সাত মাইল দূরে কামরূপবাড়ীতে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণে ডাঃ রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের অসন্তোষ ও হতাশা সমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সমস্যা দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

তবে তাঁহার মতে, সম্প্রতি একটু আশার আলো দেখা যাইতেছে। দেশের শাসকগণ এই সমস্যা সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠিতেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সরকারী ও বেসরকারী উভয়ত দেশের শিল্পোন্নতির উপর যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়, তাহার প্রতি মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিক্ষিত যুবকেরা কায়িক পরিশ্রম করিতে চাহেন না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, কায়িক পরিশ্রমের অর্থ যদি এই হয় যে, শিক্ষিত যুবকদের জমি চাষ বা পরিখা খনন করা উচিত, তাহা হইলে আমি বলিব যে, তাহা সঙ্গত নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। দেশে সাধারণ শ্রমিকের অভাব নাই। শিক্ষিত যুবকদের ঐ সব কাজে নিয়োগ করা হইলে সাধারণ শ্রমিকেরা উহা হইতে বঞ্চিত হইবে ও সেই পথে বেকার সমস্যার সমাধান আসিবে না।

ডাঃ রামস্বামী আর একটি দিকে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা এক এবং অখণ্ড। ইহাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেও শিক্ষা দানের কাজটি অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিগত ২০শে জানুয়ারি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যে ভাষণ দান করেন তাহাতে তিনি ছুটির সময়ে, শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রদের সকলকে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রায় বাহির হইতে আহ্বান করেন। ছাত্ররা পুঁথিপুস্তকে কত জায়গার কথা পড়িয়াছে, কত স্থানের

যাহাদের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু যে সকল স্থানের বিষয়ে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই ঐ সব স্থান তাহাদের পরিদর্শন করা কর্তব্য, তবে না তাহাদের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট হইবে।

বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগ স্থাপন করিলে সমগ্র ভারতের জনগণের সংস্কৃতি ও চরিত্রের যাহা ভিন্ন ভাল তাহা ছাত্রগণ আয়ত্ত করিতে পারিবে ও তাহার ফলে এই শ্রমণ শিক্ষার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইয়া উঠিবে।

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে। ডাঃ ঘোষ বলেন, খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বনের মতই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা এই পরিকল্পনায় উচিত। বহুসংখ্যক ছাত্র স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য বিদেশে যায়, ডাঃ ঘোষ তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতের সর্বত্র যুবনিবাস গড়িয়া তোলার প্রয়োজনের প্রতি আজ সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাঁহার মতে, প্রাক্তন শিক্ষকগণ এই সব যুবনিবাস পরিচালনা করিলে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের তীর্থযাত্রী ছাত্রেরা এই সকল যুবনিবাসে মিলিত হইয়া পরস্পর মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করিবে। ইহাতে যে শিক্ষা লাভ হইবে, তাহার মূল্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

পরিশেষে তিনি যুবকদিগকে সঙ্কল্পে দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন। পূর্বগামীরা বহুবিধ ত্যাগ ও ক্লেশের মধ্য দিয়া যে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন তাহা রক্ষা করার দায়িত্ব যে যুবকদিগেরই হাতে, একথা তাহারা যেন না ভোলে।

সগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

বিগত ১৬ই জানুয়ারি সগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম বার্ষিক সংবর্তন উৎসবে শ্রী ডি. কে. রুক যেমন বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কার্যকলাপ পরিচালিত হয় বিশ্ব হইতে আতঙ্ক ও বিদ্বেষের ভাব দূর করার উদ্দেশ্য লইয়া। কোন রাষ্ট্র যখন ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে, তাহার আতঙ্কের ভাবও তখন বৃদ্ধি পায়। ভারত নির্ভীক ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে।

তবের পরেই অকল্যাণকর, মানুষের দলগত বিরোধ। শক্তি বৃদ্ধির মাপকাঠি নয় ইহাই ভারতের বিশ্বাস। কোনও দেশেই পররাষ্ট্র নীতি বলিয়া কিছু নাই, জাতীয় নীতিকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোন অঞ্চলে নেতৃত্ব দাবী করে নাই। ভারত সর্বদাই শান্তির অনুকূলে কাজ করিয়াছে। দেশে ও বিদেশে সহনশীল ও আপোষের মনোভাব দ্বারাই ভারত সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। তিনি বলেন, ছাত্রদেরও ভয় ও দলগত প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা উচিত। পৃথিবীর সর্বত্র পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের যে অভাব লক্ষিত হইতেছে, ছাত্রগণ যেন তাহা হইতে মুক্ত থাকে। আদর্শের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি যেন তাহাদের আনুগত্য থাকে।

তিনি বলেন, ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতির উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সমাজের ও মূলের বিষয়ে সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে কাজ করা ভিন্ন ছাত্রগণ সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রচারেও সাহায্য করিতে পারে।

———

ভূগোল শিক্ষা

(২)

গ্রামবাসী

শ্রীমতী বকুলমালা সেন

গ্রামবাসী কারা ? প্রধানত চাষী, কামার, কুমার তাঁতী, জেলে, ধোপা, নাপিত। বালক বালিকাদের এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে খেলার ছলে।

খেলার মাঠে বালক বালিকারা সংখ্যানুপাতে একজন করে অথবা এক এক দল বিভিন্ন গ্রামবাসীর প্রতীকরূপে কল্পিত হবে। তারা অর্ধচন্দ্রাকারে পৃথক পৃথক গোষ্ঠী রচনা করে বসবে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে দুটি বালক বালিকা। তাদের হাতেরা, তাদের শিক্ষক ও চৌকিদার পরে আসবে।

আঙ্গিক অভিব্যক্তি সহ

ছড়া গান বা আবৃত্তি

বালক— বাংলা মোদের দেশ,
তার রূপের নাহি শেষ।
তার গুণ বলবো কত,
তারে প্রণাম শত শত।

বালিকা— আমি আমি বাংলা মায়ের
আমরা ছেলে মেয়ে,
বাংলা দেশে জীবন কাটে
আনন্দে গান গেয়ে।
চাষী ভাইরা শস্য বোনে,
কেটে আনে ধান,
ঐ যে শোন, তাদের মুখের
প্রাণ মাতানো গান।

চাষী— আমরা সবাই চাষী।
দেশের লোকের মুখের আলা কারিক শ্রমে নাশি।
আমরা মাঠে যাই,
মোদের মিথ্যা গরব নাই।
লাঙল নিয়ে চষতে মাটি আমরা ভালবাসি
দেশের লোকের মুখের আলা কায়িক শ্রমে নাশি।
আমরা আনন্দে ধান বুনি,
আমরা আশার দিবস গুনি,
সমর হলে ঘরে তুলি পাকা ধানের রাশি।
আমরা চাষী,
দেশের লোকের মুখের আলা কায়িক শ্রমে নাশি।

কামার— আমি কর্মকার।

কুমার— আমি কুম্ভকার।

কামার— আমরা গড়ি হালের ফলা।

কুমার— গড়ি হাঁড়ি কলস আলা।

কামার— ঠনঠনাঠন পিটছি লোহা
আমি দিবস রাত।

কুমার— ঘর ঘর ঘর ঘোরাই চাকা
নিপুণ আমার হাত।

কামার— গড়ছি কুড়ুল খন্তা কোদাল,

কুমার— গড়ছি পুতুল সন্ধ্যা সকাল,

কামার— আগুন তাতে লাল করি
ছুরি কাঁচি সব গড়ি।

কুমার— খুরি, সরা, মালসা ঘটে
সাজাই নানা চিত্র পটে।

কামার— আমি নৈলে অচল হতো সকল শিল্পকার।

কুমার— আমার হাঁড়ি কলস ছাড়া জুটতো না আহার।

বালক ও বালিকা—
চাষী ভাই, কামার ভাই, কুমার ভাই শোন,
তোমরা মোদের বন্ধু তাতে সন্দেহ নাই কোন।

তাঁতী— ঠক্‌ঠকাঠক্ চালাই তাঁত,
তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।

বুনছি রেশম, বুনছি সুতি,
রকম রকম পাখছা ধুতি।
বুনছি শাড়ি কত্তা পাড়,
কিনছে লাগে যেমন যার।

জেলে— আমি জেলে মাছ ধরি।
ধোপা— আমি কাপড় সাফ করি।
নাপিত— ক্ষৌরকর্ম করি আমি গাঁয়ের ঘরে ঘরে।
জেলে— আমার মাছে সবাই খুশী।
ধোপা— কাপড় ধুয়ে সবায় তুষি।
নাপিত— ভদ্রবেশে সাজাই আমি সবার ধরে পরে।

বালক ও বালিকা—
জেলে ভাই, নাপিত ভাই, ধোপা ভাই শোন,
তোমরা মোদের বন্ধু তাতে সন্দেহ নাই কোন।

বালক— কে ঐ আসে ঘরিত পায়?
বালিকা— 'ধানার' ছোটে দূরের গাঁয়ে।

ডাক হরকরা—আমি যে ডাক হরকরা,
ব্যাগে আমার রয় ভরা
চিঠিপত্র পার্সেল মনিঅর্ডার।
ডাকঘরে যা কিছু যে
নিয়েছি, নিয়েছি নিজে,
চলেছি যেথায় ট্রেন অথবা স্টীমার।
বাষ্পীয় যানের মত
চলে কী বা এত দ্রুত,
যাবে চিঠি পার্সেল দূরের দেশে।
প্রবাসী স্বজন যারা
চিঠি শুনে হয় সারা,
সাদরে ধরিয়া লবে মধুর হেসে।

বালক— কে আসে ঐ ব্যাগ নিয়ে?
বালিকা— পোষ্টম্যান ও দেখ চেয়ে।

ডাক পিওন—দেশ বিদেশের খবর, আমি
বিলাই ঘরে ঘরে।
আত্মজনের বার্তা আনি
পত্র-লেখার ভরে।
আলাই কত আশার শিখা,
ঝরাই চোখের জল,
আমার ভরে গাঁয়ের লোকে
উন্মুখ চঞ্চল।

চৌকিদার—কে আমি তা বলতে কি গো পারো?
সোনার গাঁয়ের সোনার খোকা-খুকু।
আবেক রাতে হাঁক শুনেছ কারো?
চমকে জেগে কুঁকড়ে এতটুকু!
আমি চৌকিদার,
রাত্তি বিয়েতে চোর ছ্যাঁচোড়ে করবে কি বা আর?
আমার গা কাঁপানো হাঁকে
ছুঁচো লোকের নষ্টামিতে সাধ্যি কি আর থাকে?

বালক ও বালিকা—
ডাকপিওন আর চৌকিদার, ও ভাই ডাক হরকরা,
পরম বন্ধু তোমরা গাঁয়ের, প্রীতি সহ মনভরা।

গ্রামবাসী সকলে—
আমরা গাঁয়ের লোক,
মোদের হাত ব্যবসায় জোঁক।
আমরা জানি না আলস্য,
কারও করি নাকো ক্ষতি।
সকাল সাঁঝে বিরাম নাহি, আপন কাজেই মত্ত।
জানি না তোমাদের মত নানান মতের তত্ত্ব।

চাষী— দুঃখ শুধু এই,
কল-কারখানার নূতনতর জ্ঞানে যে কিছু নেই।

তাঁতী— সেদিন কি আর আছে?
সারা জগৎ ক্রেতা হয়ে আসতো আমার কাছে।

কামার— যন্ত্র-যুগের চাপে
কামার-শালার কারিগরি মুমূর্ষু পাপে।

সুতার— সাগর পারের শিল্প চটকদার
ভরলো হাট বাজার।
সুতার আশা রই সবে,
দিনগত পাপ যায় কয়ে।

বালক ও বালিকা—

চাষী, তাঁতী, মালিক, ধোপা,
তোমরা গাঁয়ের অস্থি।
কামার কুমোর ছেলে জোলা
পল্লী মায়ের পুত্তি।
গাঁয়ের জল আর হাওয়ার সাথে
মিশে গেছ এক হয়ে,
গৌরবে তাই মোদের বুকে
খুসীর বন্যা যায় বয়ে।

গ্রামবাসী সকলে—

সোনার খোকা, সোনার খুকু, আমরা গাঁয়ের লোক,
মোদের শুচাকাঙ্ক্ষা সদাই কুশল তোমার হোক।
মোদের প্রতি প্রীতি তোমার জাগায় প্রাণে আশ,
তোমাদেরই সাধন-বলে আঁধার হবে নাশ।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে শিক্ষানীতি: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ হইতে ১৭৮১ সালের পূর্বে শিক্ষায় যে চেষ্টা হয় তাহা নগণ্য মাত্র। পোর্টুগীজ ও ডাচ্ খ্রিষ্টানী সম্প্রদায় শিক্ষাপ্রচারের যে চেষ্টা করেন তাহার কারণ শুধু ভারতে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধর্মপ্রচারীদের খ্রিষ্টিনী সন্তানদের শিক্ষা ছাড়া, বিদেশী বিচারককে সহায়তা করিবার জন্য দেশী পণ্ডিত ও মৌলবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন, কারণ, তাহা নহিলে বিচার কার্য অচল হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতায় মাদ্রাসা ও ১৭৯৩ সালে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৩ সালে বিশপ উইলবারফোর্স ও প্রাচ্যের চেষ্টায় ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ের বন্দোবস্ত হইলেও বাস্তব পক্ষে প্রথম দশ বৎসরে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা নগণ্য। ১৮২৩ সাল হইতে এই অর্থ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে ব্যয় হইবে, কি দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইবে কি, ইহাতে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে তাহা স্থির করিতে আরও ১২ বৎসর লাগিল। ১৮৩৫ সালে Lord Macauley-র মতানুযায়ী ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের নীতিই সরকারী নীতি হইল। ইংরেজী স্কুলগুলিকে সাহায্য প্রদান করার প্রথা ইহার পূর্ব হইতে পাওয়া গেলেও (Sharp : Selections of Educational Records, Part I) এবং এই নীতি অনুযায়ী প্রচলিত দেশীয় ভাষা বা সংস্কৃত অথবা ফারসী ভাষার শিক্ষা সরকারী সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইলেও ক্রমে তাহাদের অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা মাত্রে পরিণত হইল। ইংরেজী বিদ্যালয়-গুলি কেবল মুষ্টিমেয় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে লাগিল এবং এই নীতির সমর্থনে লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে Downward Filtration Policy অর্থাৎ নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি প্রচারিত হইল, যাহাতে বলা হইল, অল্প সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াই অশিক্ষিত জনসাধারণ শিক্ষার সুফল লাভ করিবে। এই নীতির ফল কিন্তু বিপরীত হইল, ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অন্য জন-সাধারণের মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি হইল। Treveleyan লিখিত Education of the People of India-র শেষ অধ্যায় পড়িলে মনে হয়, এরূপ যে হইবে তাহা ১৮৩৪ সালেই কেহ কেহ বুঝিয়া-ছিলেন এবং জানিয়া শুনিয়াই ডেম্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ১৮৩৪ হইতে ১৮৪৪ সাল অবধি একদিকে যেমন ইংরেজীর প্রসার দ্রুত বাড়িতে লাগিল অন্য দিকে দেশের প্রতিষ্ঠাবান লোকের পৃষ্ঠপোষকতা হারাইয়া সাহায্যবঞ্চিত দেশীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের চেয়ারম্যান উড্ সাহেবের নির্দেশ অনুসারে কোম্পানীর দেয় অর্থের দেশীয় ভাগ সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্য দিবার জন্য ব্যয় হইবে স্থির হয়। Mr. Richney তাঁহার Selections of Educational Records, Part II পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৭৫, ২২০, ২৭৭) দেখাইয়াছেন যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির একটা সর্ত ইহা ছিল

যে এ সাহায্যের পরিমাণ অনসাধারণের প্রদত্ত অর্থের অধিক হইবে না, ছাত্রবেতনও লইতে হইবে। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮২ সাল অবধি কেবল বঙ্গদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশে অধিকাংশ সাহায্য মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিই পাইত।

১৮৮২ সালে হাণ্টার সাহেবের অধিনায়কত্বে যে কমিশন নিযুক্ত হয় তাহার ২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন ইউরোপীয়। কমিশনকে পূর্বেই ভারত গভর্নমেণ্ট জানান যে কমিশন যেন এরূপ কোন সুপারিশ না প্রদান করেন যাহার ফলে সরকারকে অধিক ব্যয় করিতে হইবে (Report of Indian Secondary Education Commission পৃঃ ২, ৩)। সেই কারণে সরকারী বিদ্যালয়ে পাশের হার অধিক হওয়া সত্ত্বেও (প্যারা ২২৪) কমিশন সুপারিশ করিলেন যে সরকারী বিদ্যালয় খোলার পরিবর্তে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দান করিয়া শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টা করা হউক (প্যারা ৩৫৪)। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল, যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষার ফলে লোকে চাকুরী পাইতেছে, সেই কারণে ইহার ছাত্রবেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত (প্যারা ৫০৪)। একজন শিক্ষাবিদ্ দেখাইয়াছেন যে একটি বেসরকারী স্কুলকে সরকার যতটা সাহায্য প্রদান করেন একটি সরকারী বিদ্যালয় পরিচালনায় ন্যূনপক্ষে তাহার সাড়ে তিন গুণ ব্যয় পড়িবে।

হাণ্টার কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যালয়ে অধিক সাহায্য দানের প্রস্তাব উক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল ও বিদ্যালয়গুলি সাহায্য দানের দ্বারা পুষ্ট হইয়া অধিক সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু যে পরিমাণ সাহায্য বৃদ্ধি পাইল, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায় ছাত্র ভর্তি হওয়ায়, শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই অধিকসংখ্যক শিক্ষকের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় শিক্ষায় গুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও ক্রমে অনেক অভিভাবকের পক্ষে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া কষ্টকর হইল। অপর পক্ষে ইহাতেও শিক্ষায় ব্যয়ভার নির্বাহ না হওয়ায় শিক্ষকের বেতন হ্রাস করিয়া খরচ কম করিতে হইল। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন-মানের প্রভেদ এই সময় হইতেই সুরু হইল। ইহার পূর্বে সরকারী সাহায্য যে সকল বিদ্যালয়ে ছিল না, তাহাতে শিক্ষকের বেতন কম হইলেও মোটামুটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে সরকারী বিদ্যালয়ের অনুরূপ বেতন প্রচলিত হইত। অল্প বেতনের স্কুলে যাহারা শিক্ষালয়ে কর্ম গ্রহণ করিতে আসিলেন তাঁহাদের যোগ্যতা পূর্বাপেক্ষা কম হইতে লাগিল। শিক্ষাক্ষেত্রে এই কুফলের প্রতি Browne পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে (Quinquennial Review, 1902-1907) দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও ফল কিছুই হইল না।

হাণ্টার কমিশনের দ্বিতীয় সুপারিশ অর্থাৎ অর্থকরী বিভাগের স্থাপন কার্যকরী হইল না। কাজেই এই কমিশনের দ্বারা তিনটি কুফল ফলিল :—

(১) বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাগুণের বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে তথায় অল্প বেতনে শিক্ষকের নিয়োগ।

(২) বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার বৃদ্ধি ও অন্য কোন অর্থকরী পন্থার অভাবে, সকলেই সেস্তাবী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হওয়ায় শিক্ষিত বেকার সমস্যার সূত্রপাত।

(৩) শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী দুই বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৬১ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা সম্বন্ধে আগেকার নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন পরীক্ষার পর যত শীঘ্র সম্ভব উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের বিভাগ, তাহাদের রোল নম্বরের ক্রম ও কলেজের নাম অনুসারে একটি তালিকা সিণ্ডিকেট প্রকাশ করিবেন। বর্তমান নিয়মে প্রথম বিভাগের তালিকা কৃতিত্ব অনুসারে, এবং অন্য দুই বিভাগের নাম বর্ণানুক্রমে প্রকাশ করা হইত। তাহাতে ফল প্রকাশে অনেক সময় লাগিত। নূতন নিয়মে কেবল প্রথম বিভাগের প্রথম দুই শত পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব অনুসারে একটি পৃথক তালিকা প্রকাশ করা হইবে। তাহাতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ফল বাহির করিতে পারা যাইবে। আর, এই পৃথক তালিকা ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে বিশেষ উৎসাহজনক হইবে।

নূতন ব্যবস্থার ফলে কলেজে ভর্তি হইবার শেষ দিনের আগেই সেকেণ্ডেও ফল প্রকাশ করা সম্ভব হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের দাবি

নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ রাষ্ট্রপতির নিকট এক স্মারকলিপিতে জানাইয়াছিলেন যে কেবল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা সফল হয় নাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংঘ যেন এদিকে অধিক মনোযোগ দেন। তাঁহাদের মতে প্রাথমিক শিক্ষকগণই সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ—তাহাদিগকে অভাব ও উদ্বেগ হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইল, সম্প্রতি শুনিতেছি বুনিয়াদী শিক্ষার জন্যও কমিশন নিয়োগ করা হইবে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, শিক্ষা এক ও অখণ্ড। এরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্ব অনুসন্ধান করা হইবে?

বিহারের প্রাথমিক শিক্ষকগণ

বিহারের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের মাধ্যমিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের বেতনের হার ৩০৲—৪০৲ টাকার স্থলে ৩৫৲—৪৫৲ টাকা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাসিক ২৲ টাকা হিসাবে ভাতা দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, রাজ্যসরকার শিক্ষিত বেকারগণের সাহায্যকল্পে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সম্বন্ধে যে কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে ৬,২৫০ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে আরও ৬,২৫০টি পদ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা আছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা

আমরা প্রথমে শুনিয়াছিলাম ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি অর্থনৈতিক গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠা হইবে। সম্প্রতি এক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন, শ্যামাপ্রসাদ বাবুর স্মৃতি-রক্ষার জন্য তাঁহার নামে একটি সমাজবিজ্ঞান ও মানব মৈত্রী পরিষদ প্রতিষ্ঠা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় আজীবন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বহুভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং বহুবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিয়া সরকার নিজেদের কর্তব্য করিতেছেন। এই সঙ্গে জনসাধারণের যাহা করণীয় তাহাতে যেন জনসাধারণ ঔদাসীন্য না দেখান; বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি, মুখের কথায় যেন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষ না হয়।

বিশেষ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গত ডিসেম্বর মাসে যে স্পেশাল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ফল বাহির হইয়াছে। প্রায় সাড়ে ষোল হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। শতকরা ৪৫·০২ জন পাশ করিয়াছে। মোট দুইজন প্রথম বিভাগে, ৬৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে, আর বাকি সকলে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্তমান বর্ষ হইতে সিলেবাস অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং এই বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণে অনেকে উপকৃত হইল। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের সংখ্যা দেখিয়া মনে অনেক রকম আশঙ্কার উদয় হয়। ইহারা উচ্চ শিক্ষার অন্য কলেজে প্রবেশ করিয়া লাভবান হইবে কি? ইহাদের মেধা ও সম্ভাব্যতা বিচার করিয়া অন্যত্র তাহার ফুরণের সুবিধা করিয়া দেওয়াই কি রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়?

শিক্ষকদের সুবিধার জন্য

আমাদের দেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থা কাহারও অবিদিত নয়। তাঁহাদের সামান্য আয় হইতে জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়া ও শিক্ষার জন্য উপযুক্ত খরচ করা একরকম অসম্ভব। শিক্ষকগণের পুত্রকন্যার বিনা বেতনে পড়িবার ও বিনা খরচে চিকিৎসা ও ঔষধাদির ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই রকমই সুপারিশ করিয়াছেন। মাহিনা বৃদ্ধি কতটা করা সম্ভব তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু এই সব সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কাজে তাহার কোন প্রমাণ আমরা পাইতেছি না।

শিক্ষা-নিকেতন

গ্রাম-সংগঠনের, বিশেষ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করার উদ্দেশ্য লইয়া একদল কংগ্রেসকর্মী বর্ধমান জেলার কলানবগ্রামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সে প্রায় কুড়ি বৎসরের কথা। তাহার পর, রাজনৈতিক কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে এবং

কর্মীরা প্রথমে একক ও পরে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন পরিবেশে কর্মীদের অন্যতম শ্রীবিজনকুমার ভট্টাচার্য সস্ত্রীক এই শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় কাজ আরম্ভ করেন। নূতন প্রতিষ্ঠানের নাম হইল শিক্ষা-নিকেতন। এখানে নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী, নিম্ন-শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবার অন্য চেষ্টা চলিতেছে। একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৮টি শাখা গ্রন্থাগারও করা হইয়াছে। সকল দিক দিয়া যাহাতে শিক্ষায় সাড়া গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায় তাহার আয়োজন হইয়াছে।

• সম্প্রতি প্রতিষ্ঠাদিবসে উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। মহামান্য রাজ্যপাল মহাশয় উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শিক্ষানিকেতনের সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে গিয়া বলেন :

কর্মের মধ্যে উৎসবের প্রয়োজন আছে—উৎসব প্রেরণা দেয়, কাজে আনন্দ দেয়। আপনার কাছ থেকে আমরা সর্বপ্রথম সেই প্রেরণা পাব, আনন্দের উৎস খুঁজে পাব। আপনি শিক্ষকতা করে জীবনের অধিক ভাগ কাটিয়েছেন, এখনও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোভাগে আপনার স্থান। পল্লী-জীবনের সবল, যারা আপনার চিরদিনই অন্তরের বস্তু, তাই আপনাকে আমরা ডেকেছি—এই গ্রামের কাজের মধ্যে। গান্ধীজির চিন্তাপ্রবাহ ও কর্মপদ্ধতি দুই-ই আপনার প্রিয়বস্তু সে কারণেও আমরা কর্মব্যস্ত অবসরবিরল আপনার দিনচর্যায় ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস করেছি।

শিক্ষা-নিকেতনের কাজের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, খেলার মধ্য দিয়ে নয়, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে দেশের ছেলেমেয়েরা কি ভাবে শিক্ষাকে নিজের করে নিতে পারে, কি ভাবে তারা হাসিমুখে কাজকে গ্রহণ করে, কাজে অভ্যস্ত হতে পারে, তার পরিচয় এখানে পাবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষা নয়। গান্ধীজি বলেছিলেন, এটা সারা জীবনব্যাপী শিক্ষা, এখানে নিম্ন প্রাথমিকের গণ্ডী ছাড়িয়ে সে শিক্ষাকে কি প্রকার রূপ দেওয়া যেতে পারে সেদিকে চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও এর প্রভাব আশা করি গৌণভাবে পড়ছে।

শিক্ষা-নিকেতনের কর্ম পরিচয়ের সঙ্গে ও হরিজন পত্রিকায় সুপরিচিত সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় বুনিয়াদি শিক্ষার প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রচলিত চেষ্টার মধ্যে যে সব অসঙ্গতি বা ত্রুটি আছে তাহাও দেখান। মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে সন্তোষ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় সকলকে আবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় মহাশয়া প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজের প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

বিশিষ্ট অভ্যাগতদের পাইয়া গ্রামের চারিদিকে প্রাণের চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল।

———

আমার শিক্ষক

১

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

যাঁহাদের কাছে একদিন জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের কথা মাঝে মাঝে বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিজের পরিপ্রেক্ষিতে অপর কাহারও কথা, বিশেষ নিজের শিক্ষকের কথা বলিতে হইলে, নিজের কথাও খানিকটা আসিয়া যায়; ভয় হয়, তাহা পাঠকসমাজের বিরক্তিকর হইতে পারে। এজন্য আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া রাখিতেছি।

আজ যেমন, আমাদের সেই অতীত যুগেও তেমন, এমনকি ভালছেলেদের তীর্থস্থান প্রেসিডেন্সী কলেজেও, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাল ছেলে ছাড়া, বাকি সকলেই ফাঁকি দিবার নানারূপ কৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকিত। সত্য কথা বলা ভাল, ক্লাসে মন দিয়া পড়া শোনা কথা আমার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। কলেজে ভর্তি হইয়াই চট্ করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলাম যে, সামনের বেঞ্চিগুলিতে বসিলে 'ভাল ছেলে'র দলে এবং পিছনের বেঞ্চিতে বসিলে 'খারাপ ছেলে'র দলে পড়িতে হয়, এবং এই উভয় দলের উপরই অধ্যাপক মহাশয়দের, বিশেষ করিয়া অনার্স ক্লাসে—অনুগ্রহ ছিল, অর্থাৎ পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু তানদিকের বেঞ্চিগুলিতে তাঁহাদের সুনজর বিশেষ যাইত না। তাই আমি সে যাত্রার বেঞ্চিতে চুপ্ চাপ বসিয়াছি। এদিকের বেঞ্চিতে বসার আর একটা সুবিধা ছিল। জানালার সম্মুখে কলেজের প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত মাঠ,—সেদিকে তাকাইয়া থাকিয়া কল্পনাকে ঘোড়দৌড় করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া চলিত।

এই কারণে আমার মত কোন ছাত্রের পক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় কেমন পড়াইতেন তাহা বলা শক্ত। তবে তিনি নিশ্চয়ই পড়াইতেন। তাঁহার বহু ছাত্র তাঁহার অধ্যাপিত বিষয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তিনি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন, ইংরেজীর দুইটি বিভাগেই এম্, এ পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পঠন আলিয়া, মেজের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া, পুরু পরকলাযুক্ত চশমার সাহায্যে যাহার নাম লেজেটে প্রকাশিত উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকা হইতে একদা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল, সে যদি তাঁহার বিদ্যার পরিমাপ ও বিদ্যাদান প্রণালীর সমালোচনা করিতে যায়, আপনাদের মুখ টিপিয়া হাসিবার অধিকার নিশ্চয়ই থাকিবে। আমি আপনাদের সেই অধিকার দিতে একেবারেই নারাজ। অধ্যাপনার বাহিরেও কি ভাবে আমরা তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি এবং আজও তাঁহার পুণ্য প্রভাব কি ভাবে অনুভব করি সেটুকুই কেবল জানাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয়ের একটা আশ্চর্য স্বভাব ছিল যে শুধু পড়াইয়াই তিনি ছুটি লইতেন না। তিনি পড়াইতেন, যাহারা পড়া শুনিত ও পরীক্ষাতে ভাল ফল দেখাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত তাহাদের উৎসাহ দিতেন, নানাভাবে পড়াশোনার সাহায্য করিতেন, পড়াশোনার ফলিত দেখাইলে খুশী হইতেন, উত্তরজীবনে তাহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার স্বপ্ন দেখিতেন এবং সেই স্বপ্ন সফল হইলে তাঁহার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। এদিক দিয়া মেকলের আদর্শ শিক্ষকের মত তিনিও একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার অন্যদের সঙ্গে পার্থক্য ছিল।

তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে কি সম্ভাবনা (expectations) আছে সেইটা খুঁজিয়া বাহির করা ও তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে সাহায্য করা ছিল তাঁহার একটা নেশা, আর, তাঁহার অপরাধগুলও এইখানে। কাহারও মধ্যে একটু কিছু প্রতিভার ইঙ্গিত পাইলে তিনি তাহাকে ইস্কুলের সাহায্যে বাঁচাইবার ও বাড়াইবার প্রয়াস পাইতেন। কেন জানি না, তিনি আমারও মধ্যে এইরূপ কিছু হয়তো দেখিয়া থাকিবেন; এই কারণে আমি তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

বুঝিতে পারিতেছি, আপনারা আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। বৈনন্দিন কর্মান্তে মুক্তপৃষ্ঠে ছাত্রদেহে মাথার কাঁচাপাকা চুলে (যে কয় গাছা অবশিষ্ট আছে) হাত বুলাইতে বুলাইতে ক্লান্ত-পদে প্রবাসের গৃহকোনে ফিরিতে ফিরিতে অবসর গ্রহণের আর কয়টা দিন বাকী আছে যখন হিসাব করিতে থাকি, তখন আমার নিজেরই মনে সন্দেহ হয়, সত্যই আমার মধ্যে কোনকালে কোনও বিষয়ে কোনও রূপ সৃষ্টির ইঙ্গিত ছিল কিনা, তা আপনাদের আর অপরাধ কি? তাহা হইলেও সাহস করিয়া ঘটনাটা বলিয়া ফেলি। বহুকাল আগেকার কথা, কিন্তু আজও পরিষ্কার মনে আছে।

গরমের ছুটি সবে শেষ হইয়াছে। গরম কলিকেও ভয়ট কাটে নাই। কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার ফল তখনও বাহির হয় নাই। আমরা ক্লাস দিয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে অধ্যাপক মহাশয়দের বিশ্রাম-কক্ষের সামনে আনাগোনা করিতেছি ও ভিতরে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছি, যদি কিছু নজর আসিতে পারা যায়। এমন সময় কলেজের চাপরাসী ফুলন মিশ্র পাখা হাতিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে আসিয়া বলিল, মৈত্র সাব আপকো বোলায় দিয়া। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া এই অধ্যাপক মহাশয়ের যে খাতা-খানি পরীক্ষা করার কথা, তাহাতেই এক কাণ্ড করিয়াছি। তাঁহার উপর তিনি স্বল্পভাষী সাবধান-বাক্য মানুষ,—ছাত্রদের সহিত কোনদিন কোন কারণে কোন বিষয়ে এতটুকু মেজাজ গরম করিতে, এতটুকু কটুবাক্য বলিতে শুনি নাই। আমাদের ভয় ছিল আরও বেশী এইজন্য যে অধ্যাপক মহাশয় রাগারাগি করিলে না হয় বুঝিতে পারিতাম কিসে তাঁহার রাগ হয় বা কি তাঁহার অপছন্দ, কিন্তু যিনি কিছুতেই রাগেন না, তাঁহার মনোভাব ছাত্রদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। যাই হোক, শঙ্কিতচিত্তে একতলার লাইব্রেরী হলের পাশে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। তিনি তখন চাদরটি গুছাইয়া লইয়া হাজিরার খাতা হাতে কোনও ক্লাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি যাইতেই স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমারই নাম অমুক? তুমি তো এক কোনে চুপচাপ বসে থাক হে! তোমার ভিতর এত কাণ্ড? তা বেশ, এখন তো আমি উপরে যাচ্ছি, এই শনিবারে বৈকালের দিকে আমার বাসায় এসো, কথা হবে। আসবে তো? আমার ঠিকানা জান তো?....."

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন; বিস্মিত চিত্তে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমিও চলিয়া আসিলাম।

ব্যাপারটা এই; বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজীর অনার্সের প্রবন্ধের প্রশ্নপত্র তিনি করিয়াছিলেন এবং উত্তর পত্রের পরীক্ষাও তিনিই করিয়াছিলেন। দেখিতে তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ, পোষাক পরিচ্ছদেও অতিশয় পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি—সামান্য খুঁটিনাটিতেও এমনভাবে পরেন যে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য আরও বর্ধিত হয়। তাঁহার উপর অন্যটি কাব্য-রসে পূর্ণ, কাব্য-সাহিত্য সঙ্গীত-কলাতেই সর্বদা ভরা। এহেন লোকের রচিত প্রশ্নপত্র একটু অসাধারণ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? সাধারণ মামুলী বিষয়, যেমন সেক্সপীয়রের নাটক ডিক্টোরিয়

যুগের গল্প-সাহিত্য ইত্যাদি গোছের কয়েকটি বিষয়ের সহিত দুইটি নূতন বিষয় দিয়াছিলেন—পুরাতন পুস্তকের দোকান, এবং গাহা হইলেও হইতে পারিত। ছাত্রদের যে কোনও একটি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। সেবার দুইটি বিষয়ের উপর কেহই প্রবন্ধ লিখে নাই, সকলেই সোজা পথ বাছিয়া লইয়া অন্যান্য বিষয় হইতে একটা পছন্দ করিয়া লইয়াছিল। কেবল আমি লিখিয়াছিলাম 'পুরাতন পুস্তকের দোকান' সম্বন্ধে, এবং আমার এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন 'যাহা হইলেও হইতে পারিত' বিষয়টির উপর। বলা-বাহুল্য, এই ধরনের প্রবন্ধ মৌলিক রচনা হইতে বাধ্য। সুতরাং আমাদের দুজনের রচনা প্রবন্ধ না হইয়া রসরচনা হইয়াছিল। সত্য বলিতে কি, আমার প্রবন্ধটির ভিতর কৌতুকসৃষ্টির প্রয়াসই ছিল প্রায় সবটা, এবং গম্ভীর বস্তু ছিল না কিছুই। সমপাঠীরা এজন্য কিছু বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে নাই—তাহা দেখাইয়াছিল যে পরীক্ষার খাতায় এ ধরনের রচনা কোন পরীক্ষকই বরদাস্ত করিতে পারেন না, সুতরাং.....। পরে দেখা গেল, এই পেপারে আমার এই বন্ধুটি প্রথম হইয়াছিলেন ও আমি বোধ হয় ব্যাকরণঘটিত ভুলের জন্য এক নম্বর কম পাইয়া দ্বিতীয় হইয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য, শনিবারে গেলাম। তাহার পরের মাসে আবার নিমন্ত্রণ হইল; ক্রমশঃ প্রতিমাস হইতে দিনিষটা প্রতি সপ্তাহে হইল। আমার যাওয়া যত ঘন ঘন হইতে লাগিল, আমাদের দুজনের মধ্যে শিক্ষক ছাত্রের ব্যবধানও তত কমিয়া আসিতে লাগিল এবং প্রীতির সম্পর্ক ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল, সেই প্রীতির সম্পর্ক আজও তেমনই অক্ষুণ্ণ ও অটুট আছে।

আগে বলিয়াছি, তিনি সংযতবাক্, স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু নিজের গণ্ডীর ভিতর, যাহাদের তিনি আপনার বলিয়া মনে করেন তাহাদের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেন। তাহার ফলে আমাদের যে আলোচনা সভা চলিত তাহার তুলনা আজকাল আর দেখি না। সেইসব গল্পগুজব যে কি বস্তু, তাহার প্রকৃত বিশ্লেষণ হাতের কাছে খুঁজিয়া না পাইয়া বলিতে বাধ্য হইলাম,—অনবদ্য। স্বচ্ছ, নির্মল, কখনও কখনও পরিহাসলঘু কথার স্রোতের মধ্যে কত কি আলোচনা হইত—সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, কলা, রাজনীতি, মাষ্টারি-বিদ্যা,—এমন কি ফটোগ্রাফি পর্যন্ত। আর সেই সঙ্গে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারও বেশ কিঞ্চিৎ চলিত। বাঙালী নাকি 'আড্ডা'ধারী জীব, আড্ডা তাহার পক্ষে ভাতের মত একটি প্রধান উপজীব্য। সেই আড্ডা যে কতদূর sublime হইতে পারে তাহা সে সময় তাঁহার এই পড়ার ঘরে আসিলে বুঝিতে পারা যাইত। বহুদিন প্রবাসী আমি, আমিনা, তাঁহার একান্ত বন্ধে এই আলোচনা-সভা আজিও বসে কিনা।

এই 'আড্ডা'র গুণে একটা জিনিস আমাদের লাভ হইয়াছিল, আমরা নিজেদের চিনিতে শিখিয়াছিলাম। না, না, ভয় পাইবেন না, দর্শন বা তত্ত্বকথার অবতারণা করিতেছি না। পৃথিবীতে চোখ খুলিয়া চলিলে আনন্দ সংগ্রহ করিবার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়। যে লোক নিজের সত্তাকে নিজের সুখদুঃখ বোধকে শুধু বড় করিয়া দেখে, তাহার চক্ষু থাকে বন্ধ, এই আনন্দ সংগ্রহ করার আনন্দ পর্যন্ত সে হারাইয়াছে। মাষ্টার মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এই শক্তিটি অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম। জীবনে অনেকবার অনেক দুঃখের সহিত লড়াই করিতে হইয়াছে, অনেক জ্বালা সহিতে হইয়াছে। তবুও জীবনের পাত্রে যে আনন্দরস সঞ্চিত আছে তাহার আস্বাদ হইতে কখনও বঞ্চিত হই নাই। মাষ্টার মহাশয়ের নিজের জীবনেও অনেকবার দুঃখশোকের ঝাপ্টা

আসিয়াছে, তথাপি তাঁহাকে কখনও তাহা নিরানন্দ দেখি নাই, এই বলিষ্ঠ আশাবাদ, ইংরাজীতে যাহাকে robust optimism বলে, তাঁহাকে কখনও হারাইতে দেখি নাই। আমাকে লেখা তাঁর এক পুরাতন পত্র হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি, —ইহাতে জীবনাদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কিছুটা বোঝা যাইবে। "নিজের চারিদিকে যে বিচিত্র জীবন নাটকের অভিনয় সদাই চলছে তার থেকে রসগ্রহণ করতে তোমার মতন যে পারে, তার জীবন কোনদিন নীরস বা বিস্বাদ হতে পারে না। এমনি আনন্দে দিন কাটিয়ে যাওয়ার চেয়ে মানুষ আর কি সার্থকতা চাইতে পারে?"

বাড়ীতে আর একটি জিনিস ছিল, এবং বোধ হয় আমাদের মত ছাত্রবন্ধুদের উৎপাত সত্ত্বেও এখনও আছে, প্রচুর পুস্তকের সংগ্রহ। প্রাণ ভরিয়া পড়, লইয়া আইস, শুধু হারাইও না— ফেরৎটা যথা সময়ে দিও। তাহা হইলেই হইল। তবুও তাঁহার কত বই অনেকে লইয়া গিয়া আর প্রত্যর্পণ করে নাই। আর সে কত রকমের বই! তাঁহার এই অনুগ্রহে আমি ইংরেজী বাংলা উভয় সাহিত্যের প্রাচীনতম হইতে শুরু করিয়া আধুনিকতম (তখনকার দিনের তুলনায় অবশ্য,— এখন সেই সব লেখা দেখিলে অনেকে হয়তো নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন 'সেকেলে'!) লেখার সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

অবসর বিনোদনের জন্য অধ্যাপক মহাশয় আজকাল মাঝে মাঝে কোন কোন প্রসিদ্ধ বাঙালী লেখকের লেখা ইংরেজীতে তর্জমা করিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেন। সেই সব অনুবাদ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার রসানুভূতি কত গভীর! তিনি শুধু সাহিত্যরসিক নন, সাহিত্যিক, কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা কখনও কামনা করেন নাই বলিয়া অতি অল্প রসবেত্তা এই সন্ধান রাখেন। মনে আছে, একবার ছেলেরা জোর জবরদস্তি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ আদায় করে, এই প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ যে সভায় পড়া হয়, সে সভায় শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধটি পঠিত হইবার পর তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'আমার সন্দেহ হয়, অধ্যাপক মশাই লিখে ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখেন। অনুরোধ করি, তা না করে তিনি সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করুন।' অধ্যাপক মহাশয় নিজের লেখা লুকাইয়া রাখিলেও ছাত্রদের লেখা ড্রয়ার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে ছিলেন নিশ্চয়ই। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, আমার প্রথম লেখাগুলি বাহির হইয়াছিল তাঁহারই উৎসাহে। বস্তুত, তিনি ছিলেন আমার লেখার কষ্টিপাথর—কোন কিছু লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইতে বসিতাম, তিনি ভাল না বলিলে তাহা বিনা দ্বিধায় ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। সব সময়ে যে প্রকাশের জন্য লিখিতাম তাহা নহে; লিখিতে ভাল লাগিত বলিয়া লিখিতাম, আর তাঁহাকে শুনাইয়া আনন্দ পাইতাম। তিনি ছিলেন পাঠক ও সমালোচক। তিনি ভাল বলিলে আমার চূড়ান্ত পুরস্কার পাওয়া হইত।

শুনিয়াছি বাদশাহ্ আকবর একবার হাতীতে চড়িয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার সিপাহী সান্ত্রী রাহী লোক সরাইয়া পথ সাফ্ করিয়া দিতেছিল। পথে এক পাগল দাঁড়াইয়াছিল। সিপাহীরা তাহাকে তাড়াইবার জন্য বলিল, 'এই যাওয়া (পাগল), হুঁশ হইয়া যা!' পাগল উত্তর দিল, 'আমি যাওয়া, না এই হাতীর মালিক যাওয়া?' কথাটা আকবরের কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাকে পাগল বলিলে কেন?' পাগল কহিল, 'হাতীর দুই কানে দুই ঘণ্টা ঝুলাইয়াছ, দুইটির আওয়াজ দুই রকম। তুমি পাগল নওতো কি?' এই ঘণ্টা দুইটির আওয়াজের এত সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল যে স্বয়ং তানসেনও নাকি তাহা ধরিতে

পারেন নাই। আকবর বুঝিতে পারিলেন, এই সাধারণ সাধারণ ব্যক্তি নহেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, ইনিই সেই প্রসিদ্ধ বৈদ্য বাওয়া—প্রাণের ভিতর ভগবানকে পাইয়া বাওয়া হইয়া গিয়াছিলেন। তুলনাটা একটু বাড়াবাড়ি হইবে। হইলেও বলি, বৈদ্য মহাশয়ের চোখ ও কান এইরূপ সূক্ষ্ম। গন্ধে, গানে, সঙ্গীতে, কলায়, কোথাও বিন্দু মাত্র অসঙ্গতি তাঁহার মনকে পীড়া দেয়। অধ্যাপক মহাশয় বাক্যে, কার্যে, মনোবৃত্তিতে সকল সময়ই সংযত;—উচ্ছ্বাস তিনি কোনদিনই পছন্দ করেন নাই, না জীবনে, না সাহিত্যে। তাঁহার নিজের অন্তর ও বাহির উভয়ই একান্ত ভাবে পরিচ্ছন্ন, নির্মুক্ত শুদ্ধে বেষাগ্র। তাঁহার হাত দিয়া যাহা বাহির হইত, তাহা হইত এইরূপ পরিচ্ছন্ন, আর তিনি চাহিতেন তাঁহার কাছে যাহা আসিবে তাহাও হইবে এইরূপ পরিচ্ছন্ন। কাজেই তাঁহার বিচারে যাহা উৎরাইয়া যাইত তাহা রসোত্তীর্ণ হইতে বাধ্য।

বুঝিতে পারিতেছেন নিশ্চয়ই, অধ্যাপক মহাশয়ের পড়ানোর বিশেষত্ব কোথায় ও পার্থক্য কি ছিল। অধ্যাপক মহাশয় শুধু সাহিত্য পড়াইতেন তাহা নহে, সাহিত্যের একেবারে অন্তরের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতেন, সাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগকে সজাগ করাইয়া দিতেন এবং আমাদের চিত্তের সাহিত্যিক প্রতিভার সামান্যতম ইঙ্গিতও দেখিলে তাহার জন্য উৎসমুখ খুলিয়া দিতে সাহায্য করিতেন।

তাঁহার স্নেহপরায়ণতার একটি উদাহরণ এখানে না দিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে। ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে একটি সৌখীন জাপানী বাক্সের আসন্ন উপহার দিয়াছিলাম। মূল্য তাহার তখনকার দিনে বড়জোর দুইচারি আনার মত ছিল। তাঁহার ঘরে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরেও দেখিয়াছি তাহা তখনও রহিয়াছে—'ওটা যে তুমি উপহার দিয়েছিলে।'

অধ্যাপক মহাশয় বাঙলার এক সুপ্রাচীন বুনিয়াদী ও কৃতী বংশের সন্তান, সেই বুনিয়াদী বংশের বৈশিষ্ট্য যে শিষ্টাচার, তাহা তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি কাহাকেও কটুবাক্য বলিয়াছেন বা কাহারও প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছেন—ইহা কল্পনার অতীত। তথাপি, তাঁহার মনের অপূর্ব দৃঢ়তা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অন্যায়কে অশুচিতাকে তিনি সহ্য করেন নাই—দূরে পরিহার করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অশুচিতা, তাহা সে দেহের হউক, বাক্যের হউক, চিন্তার হউক, মনের হউক, ভাবের হউক, তাঁহাকে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছে ইহা দেখিয়াছি।

বাল্মীকি বর্ণিত ভ্রমরার নীরের ন্যায় যাঁহার অন্তর, অপরের মনের অপরিচ্ছন্নতা তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইবে ইহা বিচিত্র কি?

কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নীতিবাগীশ নন, জীবনের পূর্ণতা অপূর্ণতা উভয়ই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিবার মনের বল তাঁহার আছে। আছে বলিলে সবটা বলা হয় না, আলো ও ছায়া, ভাল ও মন্দ জীবনের দুইটি দিককেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সমান ভাবে গভীর সহানুভূতির সহিত। তাই তাঁহার জীবনদর্শন সম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ। তাহার উপর তাঁহার আছে অসীম রস (humour) বোধ। কাজেই জীবন তাঁহার কাছে কোন দিনই নিরর্থক হয় নাই। সংবেদনশীল মন লইয়া তিনি দেখিয়া গিয়াছেন, আনন্দ আহরণ করিয়া নিজে লইয়াছেন, পরকেও দিয়াছেন। জীবন আছে, তাহা জানিয়া তাহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইয়া তিনি খুশী, জীবনের 'কেন'র প্রশ্নে নিজেকে কোন দিন বিব্রত করেন নাই, অপরকেও বিব্রত হইতে উপদেশ দেন না।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

(৩)

পরাধীন ভারতে শিক্ষার ব্যবস্থা ১৯০২—৪৭

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর দ্রুত অগ্রগতি সকলকেই প্রভাবিত করে। শতাব্দীর প্রারম্ভে নেপোলিয়নের পদদলিত রাষ্ট্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া উঠিল, ইহার প্রভাব অন্যদেশেও পড়িল। শিক্ষাব্যবস্থাই এই দ্রুত উন্নতির কারণ হওয়ায় অন্যান্য দেশও শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

আমেরিকায় সর্বপ্রথম Public School স্থাপন করিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে বেসরকারি স্কুলের হ্রাস করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইলেও ১৮৬৪ সালের পর হইতেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল। ঐ বৎসর Morell Act অনুসারে শিক্ষাবিস্তারকল্পে জমির উপস্বত্ব ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়, এবং কয়েকটি স্টেটে কর ধার্য হয়। ইহার প্রতিবাদ হইলেও ১৮৭০ সালের Kalamazoo মোকদ্দমার রায়ে আমেরিকার প্রত্যেক রাজ্যই কর ধার্য করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিবার অনুমতি পাইল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের কথা তখনও ওঠে নাই।

গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৭৯ সালে ব্রাইস (Bryce) কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বতন্ত্র শিক্ষামন্ত্রী ও বোর্ড অফ্ এডুকেশন নিয়োগ সম্ভব হইল। ইহার ২৫ বৎসর পূর্বেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক কাউন্টিতে জনসাধারণের নির্বাচিত Local Educational authority (স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ) নিয়োগ ও তাহার পরে ঐ সকল কর্তৃপক্ষের সংখ্যা হ্রাস ও সীমা বৃদ্ধির প্রয়াস, শিক্ষাক্ষেত্রে জনসাধারণের দাবির বৃদ্ধির প্রথম সোপান বলিয়া ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধির প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করা। এই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই অতি দ্রুতভাবে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যের পরিমাণও ঐ দুই দেশে বৃদ্ধি পাইল। প্রায় ঐ সময়ে ভারতেও শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অধিকারের সীমা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার কারণ ছিল স্বতন্ত্র। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখিয়া দেশের শাসকসম্প্রদায় বিচলিত হইয়াছিলেন ও তাহার ফলেই নানারূপ নিষেধের নিগড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁধিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই প্রচেষ্টার প্রথম সূত্রপাত হয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ দ্বারা। আপাতদৃষ্টিতে উক্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মসূচিতে শুধু পরীক্ষার দায়িত্ব না রাখিয়া তাহার স্থানে পাঠনার ও গবেষণার সুযোগ রাখার উপায় হইল মনে হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা নূতন কলেজ খুলিতে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের সম্মতি, এবং সেনেটে আজীবন সদস্যের লোপ করিয়া তাহার স্থানে নির্বাচিত মনোনয়নের প্রথা প্রবর্তন করিয়া সেনেটগুলির স্বাধীনতালোপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্মতালোপের জন্যই করা হয়। বঙ্গদেশের ১৯০২ হইতে ১৯০৭ সালের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে স্কুলগুলির অনেকরূপ

অবস্থাপন্নদের পরিচয় পাওয়া যায়। Risley সাহেবের ইহাই অনতিকাল পরের ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গেই সরকার যেন শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী হইয়া ওঠেন। ১৯০২ সালে মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পেই তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষার অনুদান সাহায্য দানে সঙ্কুচিত হইতেছেন। ১৯১১ সালে কিন্তু স্বয়ং গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রস্তাব করিলেন যে, কোন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবেন। তখন সরকারপক্ষই তাহার বিরোধী হইয়া পড়েন। এই দুইটি নিদর্শন হইতে বোঝা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষাসঙ্কোচের কারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অনুদান বৃদ্ধি করিলেও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারেও সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হইলেও সমস্ত ভারতের ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অর্থকৃচ্ছ্রতার কারণ হইল। সুখের বিষয়, ঐ সিদ্ধান্ত অন্তি অল্প বিশ্ববিদ্যালয়ই গ্রহণ করিল। সরকারের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিলেও (Vol IV. 79, Vol V. 927 and 988) উক্ত কমিশন বেসরকারী বিদ্যালয়ের বিলোপ সাধনের সুপারিশ করিতে সঙ্কুচিত হইল, কারণ তাহাতে খরচ বাড়িবে।

১৯২১ হইতে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ আংশিক দায়িত্ব-শীল মন্ত্রীর হাতে আসায় একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা চতুর্গুণ হইয়া ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় হইল, অন্য দিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা সুরু হইল এবং পনেরো বৎসরের মধ্যেই নানা প্রদেশে ইংরাজির স্থানে দেশী ভাষা হইল শিক্ষার মাধ্যম। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের অনুপাতে বিশেষ কোন তারতম্য কিন্তু দেখা গেল না। শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলিয়া খোলা-খুলিভাবে স্বীকৃত হইল না। ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিশন শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিলেন সত্য, কিন্তু 'ভাল ফল পাওয়া যাইতেছে না' এই অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারও বন্ধ করিতে চাহিলেন। কাজেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে, এই কেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব যদি শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তে সংকোচের মনোভাব হইতে উদ্ভূত বলে করি, তবে হয়তো অন্যায় হইবে না। ১৯৩৪ সালের Wood Abbott Report নানাস্থানে (পৃঃ ১১, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭) শিক্ষার সংস্কারের জন্য সুপারিশ করিলেও শিক্ষাসংস্কারের আবশ্যকীয় অর্থ দিবার জন্য বিশেষ কিছু কথা বলিলেন না।

১৯৩৭ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বুনিয়াদী শিক্ষানীতির প্রস্তাব করেন, তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে সরকারী সাহায্য না লইয়া বিদ্যালয়গুলির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা যে কোন নেতার পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও মহাত্মা গান্ধী বিদ্যালয়গুলিকে কোন নিয়ন্ত্রণহীন রাখিতে চাহেন নাই। সকল বিদ্যালয়কে এক সূত্রে গঠনের উদ্দেশ্যেই মধ্যপ্রদেশে ১৯৩৯ সালে বিদ্যামন্দির প্রথার প্রবর্তন হয়।

১৯৪৪ সালের রিপোর্টে এক বিরাট পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় যাহাতে বার্ষিক ৩১৩ কোটি মুদ্রাব্যয়ে ৪০ বৎসর অবধি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত ছিল। এই বিরাট পরিকল্পনাও কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির বিলোপ সাধন চাহে নাই। এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই, কারণ দেশ ঐরূপ ব্যয় বহনে সমর্থ ছিল না।

এই সকল উদাহরণ হইতে বোঝা যায় যে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতাসঙ্কোচ সরকারের মুখ্য কাম্য ছিল, শিক্ষার বিস্তার বা তজ্জন্য অর্থব্যয়ের তত্ত্ব ইচ্ছা সরকারের ছিল না। বেসরকারী বিদ্যালয়ের সেইটুকু ক্ষমতাই সরকার লোপ করিতে চাহেন

যতটুকু থাকায় তাহারা স্বাধীন মতবাদের পরিপোষণ করিতে পারে। অন্যথা বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া শিক্ষকদের মধ্যে একটা ভেদনীতি সৃষ্টি করিতে ও তথায় ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির সমাবেশে দেশব্যাপী শিক্ষক বা ছাত্রের মিলনের যে অন্তরায় সম্ভব তাহার সুযোগ লইতে, তৎকালীন সরকার সর্বদা তৎপর ছিলেন।

এই অবস্থায় মধ্যেই ১৯৫৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। তখন দেশের মধ্যে অক্ষর পরিচয় শতকরা তিন জন অপেক্ষাও কম লোকের ছিল, তখন দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন কোন মিস্ত্রির চাপরাসির অপেক্ষাও কম ছিল, তখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক একজন সাধারণ মজুর অথবা সূত্রধরের অপেক্ষা কম আয় করিতেন। এই সময়ে দেশের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন এরূপ বিদ্যালয়ে পড়িত যাহার ব্যয়ভারের শতকরা ৩০'৫ অংশ মাত্র সরকারী সাহায্য হইতে ও অবশিষ্ট সমগ্রভাগের অধিকাংশ ছাত্রবেতন হইতে নির্বাহ হইত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা ইহা হইতে বিশেষ ভাল ছিল না, মাত্র ৩৬'৫ অংশ সরকারী সাহায্যে নির্বাহ হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক-গুলিতে গবেষণার ব্যবস্থা থাকিলেও সমগ্র সংখ্যার শতকরা ২২ জন ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগে পড়িত, ও অবশিষ্ট ছাত্র এরূপ বে-সরকারী কলেজে পড়িত যাহাদের অবস্থা বে-সরকারী স্কুল হইতে বিশেষ ভাল ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকারের (ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটি) অধীন ছিল, ও সমগ্র ব্যয়ভারের ৯১ অংশ বোর্ডের সাহায্য দ্বারা নির্বাহ হইত। বঙ্গ ও আসামে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা অধিক হওয়ায়, সেখানকার ব্যয় অনুপাতে কম ছিল।

বয়ঃসন্ধি

শ্রীমতী শেফালী গুপ্ত

বাল্যকালের পর মানবজীবনে একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়—ইহাকে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধি বলা হয়। বয়ঃসন্ধির আবির্ভাবে শিশু হঠাৎ এক নূতন জগতের সম্মুখীন হয়—নূতন অনুভূতি—নূতন উপলব্ধি—শিশুকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। বয়ঃসন্ধি এত অজানিতে—এত অতর্কিতে—শিশুর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের বার্তা উদ্‌ঘাটিত করে যে, এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে শিশুকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। তাহার প্রকৃতস্থান কোথায়, ছোটদের খেলা ঘরে বা বড়দের কর্মমুখর জীবনে, সে সমস্যার মীমাংসা করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়ে। কবিগুরু মানবজীবনের এই অবস্থাকে তাঁহার "ছুটি" গল্পটিতে কটিকের বিড়ম্বিত জীবন বর্ণনায় সমর সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাল্যকাল ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া হতবাক্ শিশু ভাবে, তাহার প্রকৃত স্থান কোথায়? ছোটদের খেলাঘর আর তাহাকে সেভাবে আকর্ষণ করে না—সেভাবে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। সে ব্যগ্র হইয়া উঠে স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানিতে, ছোট শিশুর মতই কৌতূহলী হইয়া সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া নূতন নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয় ও চাহে তাহার বিভিন্ন সমস্যার ও বিভিন্ন কৌতূহলের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। হঠাৎ তাহার দৈহিক পরিবর্তন বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শিশু ও বালকের দৈহিক পরিবর্তন কেবলমাত্র দৈর্ঘ্যের তারতম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু কিশোরের দৈহিক পরিবর্তনের বাহ্যিক প্রকাশ নানাদিক হইতে নানাভাবে প্রকাশিত হয়। বয়ঃসন্ধিতেই স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক বৈষম্যের অধিকাংশ বীজ অঙ্কুরিত হয় ও ধীরে ধীরে কিশোর কিশোরীরা অবয়বের বিভেদের মধ্যে প্রবেশ করে। দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বয়ঃসন্ধি লইয়া আসে মনোজগতে এক বিশাল আলোড়ন। তাহাদের মানসিক জীবনের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন অনুভূতি কিশোর কিশোরীর মনে রেখাপাত করে—সে অনুভূতির কোনও অস্তিত্বই বাল্যকালে তাহাদের মনে ছিল না। এই অনুভূতিকে সাধারণতঃ যৌনবোধ ও যৌন অনুভূতি আখ্যা দেওয়া হয়। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশেষ অনুভূতিটি কিশোর কিশোরীকে আচ্ছন্ন করিয়া তোলে। নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহারা বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠে। তাহাদের হঠাৎ নিজেদের বড়ই সুন্দর বলিয়া মনে হয় ও জগতের সম্মুখে তাহাদের সৌন্দর্য প্রকাশিত করিতে তাহারা ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কিশোরীর মধ্যে নারীসুলভ কতকগুলি প্রবৃত্তি এই সময় আত্মপ্রকাশ করে—তাহার মধ্যে তথাকথিত "লাজুক" ভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বালিকার কার্যকলাপ থাকে সাবলীল ও বিধামুক্ত। বয়ঃসন্ধির আগমনে বালিকা-সুলভ চপলতা অন্তর্হিত হয়—কিশোরী ক্রমে ক্রমে "শান্ত ও ধীর" হইয়া উঠে। কিশোরেরা সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়—তাহাদের কেহ কেহ হয় অতি-মাত্রায় কর্মী ও কর্মমুখর—আর কেহ কেহ হয় দ্বিধাগ্রস্ত ও চঞ্চলমতি। নূতন অনুভূতির প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে এক শ্রেণীর কিশোর তাহাদের অজানিতে অতিমাত্রায় কর্মে লিপ্ত হয়, আর এক শ্রেণীর কিশোর ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের কর্মে উদ্দীপনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে।

যৌনবোধের আবির্ভাব সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব বলিয়া ইহার প্রভাব হইতে অতি অল্প কিশোরকিশোরীই নিজেকে মুক্ত করিতে পারে। জীবনরহস্য ও জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে তাহাদের মনে আসে অসীম কৌতূহল, ও এই কৌতূহল নিবৃত্ত না হইলে তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। তাহারা হইয়া উঠে ভাবুক ও অন্যমনস্ক। মানব জীবনের এই যে সন্ধিক্ষণ—যে সময় মানুষের সম্মুখে তাহার ভবিষ্যত জীবনের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে, যে সময় সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত বিশ্ব, নূতন সত্তা, নূতন আলোক লইয়া তাহার কাছে উপস্থিত হয়, সে সময় প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি তাহাকে বিশেষ সাহায্য করে। প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্য না পাইলে এই প্রয়োজনীয় পর্যায়টি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টের কারণ হয় ও মানুষের উন্নতির পথে ক্রমান্বয়ে বাধা সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশের পূর্বপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাতে বয়ঃসন্ধির উপযোগী কোনও শিক্ষা সংস্থা নাই। বালকের ও কিশোরের শিক্ষাব্যবস্থাতে বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপ্রণালীর পার্থক্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ নীতির উপর পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিতে দেওয়া হয় নাই। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে কি প্রণালীর, কি বিষয়বস্তুর কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই শিক্ষাব্যবস্থাতে যৌনবোধরূপ যে নূতন প্রবৃত্তিটির প্রথম উন্মেষ বয়ঃসন্ধিতে হয়, তাহার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করা হয়, আর সেইজন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাতে ইহার দিকে কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয় না। কিশোর কিশোরীর মধ্যে এ প্রবৃত্তি যে স্বাভাবিক, এ প্রবৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশ যে কিশোরের নৈতিক চরিত্রের অবনতির কারণ নয়, পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতি এ সত্য মানিতে রাজী নয়, এই বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ মত লইয়া পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী ছাত্রজীবনের অশেষ অপকার সাধন করে। নূতন অনুভূতি লইয়া বিব্রত কিশোর কিশোরী কোথাও সহানুভূতি না পাওয়াতে বয়ঃসন্ধির অধিকাংশেরই জীবনে একটি ভারবহ স্মৃতি-রূপে থাকিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে এই অনুভূতি তাহারই চরিত্রগত অপসঙ্গতির ফল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এক শ্রেণী চাহে, প্রাণপণে তাহাদের এই প্রবৃত্তিকে দমন করিতে। অসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রচেষ্টাতে জয়ী হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টার ফল হইয়া উঠে বিপরীত। দেখা গিয়াছে যে সাধ্যের অতীত চেষ্টা করিয়া কিশোর হয়তো তাহার চেতনাগত হইতে এই প্রবৃত্তিকে অপসারিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু এই প্রবৃত্তি তাহার অবচেতন জগতে বিষের প্রভাব বিস্তার করাতে নানারূপ মানসিক ব্যাধিতে সে আক্রান্ত হইয়াছে ও সামাজিক জীবনের একটি সমস্যার কারণ হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তি এত প্রবল থাকে যে উহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা নানারূপ উপায় খুঁজিতে থাকে, এবং কুসঙ্গ ও কুশিক্ষার প্রভাবে তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, তাহারা নীতিবিগর্হিত কোনও কাজ করিতেছে ও সেইজন্য তাহারা সর্বদা গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। হইতে পারে সমস্ত কিশোর কিশোরীর মধ্যে সমভাবে এই প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে না, হইতে পারে অনেকের নিকটই বয়ঃসন্ধির স্মৃতি পীড়াদায়ক নয়, কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে এই প্রবৃত্তির আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিক। স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিকে অস্বীকার ও অবহেলা করিয়া আমরা অসংখ্য "সমস্যা শিশুর" সৃষ্টি করি, কিংবা অসংখ্য দুর্বল চরিত্রের সৃষ্টি করি, যে চরিত্র সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর ও নিষ্প্রয়োজন।

যৌনবোধরূপ নূতন অনুভূতিটির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বা তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়া যদি কোনও শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বয়ঃসন্ধির উপযোগী বলা যায়

না। মানুষের প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত গতি সব সময় আত্মপ্রকাশের অভিমুখে। ইহাকে অস্বীকার করিলে, যে কোনও উপায়েই হোক, এর প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চরিতার্থতা লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। ক্রমাগত বাধা দিয়া যদি ইহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলেও ইহার গতিকে বাধা দেওয়া অসম্ভব। বাধা অতিক্রম করিবার জন্য এই প্রবৃত্তি স্বাভাবিক প্রকাশ পথ ত্যাগ করিয়া বক্রগতি অবলম্বন করিবে ও বিকৃত অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে। যে কোনও তথাকথিত অনিষ্টকর প্রবৃত্তিকে যদি বাধার দ্বারা স্তিমিত করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তি মানবজীবনের একটি বিশেষ সম্ভাবনার কারণ হয়। পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে যৌনবোধকে তথাকথিত অনিষ্টকর প্রবৃত্তির শ্রেণীতে ফেলা হইয়া থাকে। কিশোর চরিত্রের এই দিককে একেবারে উপেক্ষা করা হয়, ও যদি তাহার কোনও কার্যকলাপে এই প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে তাহা হইলে তাহাকে অপরাধীরূপে গ্রহণ করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৈশোরের কার্যকলাপে যদি যৌনপ্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে ইহাকে চরিত্রের নৈতিক অবনতির দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাস্তবতার অপলাপ করা হইবে। যৌনবোধরূপ যে প্রবৃত্তিটি কিশোর কিশোরীর জীবনে নূতন পর্যায় আনয়ন করে, প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি তাহে বিভিন্নপন্থা গ্রহণ করিয়া নৈপুণ্যের সহিত সেই প্রবৃত্তিটিকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে ও প্রয়োজন হইলে ইহাকে রূপান্তরিত করিতে। বয়ঃসন্ধিতে যৌন-প্রবৃত্তির সাধারণ আত্মপ্রকাশ, জন্মরহস্য ও সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল ও আত্মপ্রেম—কৈশোরে কিশোর কিশোরীরা হঠাৎ স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও স্বীয় দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়া পড়ে।

যৌনবোধ ব্যতীত সৌন্দর্যবোধরূপ আর একটি নূতন প্রবৃত্তিও বয়ঃসন্ধিতে আত্মপ্রকাশ করে। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণের প্রবৃত্তি বাল্যকালে প্রায় থাকেই না, কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে ইহার আবির্ভাব কিশোরকে করিয়া তোলে শিল্পী, ভাবুক ও কবি। যে যৌনবোধ কৈশোরের সমস্ত সত্তা গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়, সৌন্দর্যবোধরূপ এই প্রবৃত্তিটি কিশোর কিশোরীকে বহু পরিমাণে ইহার প্রভাব হইতে মুক্ত করে, ও যাহাতে এই প্রবৃত্তি তাহাদের 'বিপথে' লইয়া না যাইয়া রূপান্তরিত হইতে পারে সেদিকেও বিশেষ সাহায্য করে। কৈশোরে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথম ও প্রধান কর্তব্য, কিশোর কিশোরীকে কর্মে লিপ্ত রাখা। কর্মবিমুখতা কিশোরকে অনিষ্টের পথে লইয়া যায়। কিন্তু আদর্শ শিক্ষাপ্রণালীতে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কিশোরকে কর্মে লিপ্ত রাখিতে হইলে যে সকল কর্মে কিশোরের কোনও আকর্ষণ নাই কোনও উৎসাহ নাই সে সকল কর্মে তাহাদের ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না। শৈশবের খেলাঘর, বালোর ক্রীড়া-ভূমি কিশোরকে আকর্ষণ করে না—সৌন্দর্যের পূজারী কিশোর চাহে সৌন্দর্য উপভোগ করিতে। কৈশোরের শিক্ষাপ্রণালীতে বাল্যকালের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াপদ্ধতির ব্যবস্থার সহিত বিভিন্ন প্রকারের শিল্পকলা, শিক্ষা-সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতির অন্ত কিছু সময় রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। জগতের বিখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী পাঠের ব্যবস্থা রাখিলে জীবন পথের উদ্ভ্রান্ত পথিক কিশোর কিশোরী জীবনের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিবে ও তাহাদের সৌন্দর্যবোধরূপ নূতন প্রবৃত্তিটিও আত্মতৃপ্তির সুযোগ পাইয়া ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে। এইরূপ সৌন্দর্যবোধের সাহায্যে কিশোর কিশোরীর যৌন প্রবৃত্তিকে ধীরে ধীরে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা যাইবে। জীবন-রহস্য ও সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে কিশোর কিশোরীর

কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্ভিদ্ বিদ্যা, প্রাণী-তত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি পাঠের ব্যবস্থা বয়ঃসন্ধির পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে পরোক্ষভাবে কৈশোরের যৌনপ্রবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে বহুল পরিমাণে আত্মপ্রকাশের পথে যাইবে ও কিশোরের চরিত্রগঠনে সাহায্য করিবে।

কিশোর কিশোরীরা জগতের কাছে—তাহাদের প্রিয়জনের কাছে—চাহে সহানুভূতি, চাহে তাহাদের নূতন ও অভূতপূর্ব অনুভূতির ও কৌতূহলের মীমাংসা। অভিভাবকগণকে এবিষয়ে বিশেষ সচেতন হইতে হইবে। কিশোর কিশোরীর পিতামাতারা তাহাদের বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়া কিশোর বিশেষ স্থানে যৌনজীবন সংক্রান্ত আলোচনা করিবেন। এ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় গোপনীতা অবলম্বন করিলে কিশোর কিশোরীকে অধিক পরিমাণে কৌতূহলী করিয়া তোলে, ও অবাঞ্ছনীয় উপায়ে তাহারা এই কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইয়া নিজেদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি সাধন করে। শৈশব হইতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কৈশোর পর্যন্ত যদি এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তাহা হইলে এ প্রণালীও বয়ঃসন্ধির শিক্ষার সহায়করূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। শৈশবে অবাধ মেলামেশার ফলে কৈশোরের আবির্ভাবেও কিশোরকিশোরীর পরস্পরের সহিত আচারব্যবহার ও মিলিত কার্যকলাপ বহু পরিমাণে সাবলীল হইয়া ওঠে, ও একের প্রতি অপরের আকর্ষণ ও বন্ধুত্ব যৌন সম্পর্কেই পর্যবসিত হয়না। তাহাদের মেলামেশা সহজ হওয়ায় ফলে তাহারা ভবিষ্যত জীবনে প্রকৃত সহকর্মী হইয়া উঠিতে পারে ও মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজে বিত্তির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। একের প্রতি অপরের আকর্ষণ যৌনবোধদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা প্রকৃত সহকর্মী হইয়া উঠিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিশেষ রঙ ব্যতীত আর কোনও রঙ না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক জীবনের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হয় ও তাহার গতি মন্থরীকৃত হইয়া ওঠে। জীবনের গতিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়া সামাজিক জীবনের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিলে চলিবে না। সহশিক্ষার দ্বারা, উপযুক্ত পাঠ্যের দ্বারা, নৈপুণ্যের সাহায্যে যৌনবোধকে নূতন রঙ দিতে হইবে। এই নূতন রঙ দিতে অক্ষম হইলে কোনও শিক্ষা-পদ্ধতিকেই বয়ঃসন্ধির উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না।

কবি কিশোর কিশোরীকে সমাজের, দেশের, জগতের, ভবিষ্যৎ আশা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাদের হাতে জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার দিয়াছেন। আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতিকে কবির আশা সফল করিবার জন্য জাগাইয়া আনিতে হইবে। প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, চরিত্র গঠনের সুযোগ না দিয়া, আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি না করিয়া আমরা যদি কিশোর কিশোরীর উপর ভবিষ্যৎ জগৎ গঠনের গুরুভার প্রদান করি, তাহা হইলে আমাদের অন্যায় ও অবিচার করা হইবে। কিশোর কিশোরীর মধ্যেই জগৎ গঠনের বীজ অন্তর্নিহিত আছে, কিন্তু সে বীজ যাহাতে মহীরুহ হইয়া উঠিতে পারে সে ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি আমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের আশা কবির কল্পনাতেই শেষ হইবে—কখনও বাস্তবে পরিণত হইতে পারিবে না।

———

সমাজশিক্ষার আদিকথা

শ্রীজীবেন্দ্র রে

শিক্ষাজগতে 'সমাজ শিক্ষা' কথাটা নূতন। সমাজ শিক্ষা কথাটা প্রচলিত হবার আগে যে কথাটা ব্যবহার করা হোতো—সেটা, বয়স্ক শিক্ষা। এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে দুটো কথা একসঙ্গে সমাজ (বয়স্ক) শিক্ষা—Social (Adult) Education—ব্যবহার করা হয়। খুব সম্ভব এর কারণ, নতুন কথাটা সম্পূর্ণ চলতি হবার আগে যে কথা ও যে ভাবধারার সাথে এর যোগ সেটা স্মরণ রাখা। সুতরাং সমাজশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে যে ভাবধারাকে অবলম্বন করে এর উৎপত্তি, সেখানে তথ্য সন্ধান প্রয়োজন।

আদিযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির পিছনে যে সত্য কখনও গোপনে ও কখনও স্পষ্টভাবে কাজ করেছে তা হচ্ছে—একজনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার চিরন্তন ইচ্ছা। পিতার পক্ষে পুত্রকে নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে তাকে ভাবী জীবনের জন্য তৈরী করা যেমন সহজ ইচ্ছা, তেমনি নিজের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতের মণ্ডলে নিজের জীবনলব্ধ তথ্য পরিবেশন করা আর একটি স্বাভাবিক ইচ্ছা। এর পিছনে নিজের চল তথা গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার ইচ্ছা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে কাজ করেছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ নিজের অগোচরে নিজ প্রবৃত্তির সহজ প্রেরণায় নিজের অর্জিত তথ্য অন্যের কাছে প্রকাশ করেছে। এর স্বাভাবিক প্রত্যুত্তরে প্রত্যেক সমাজ তার জ্ঞানী ব্যক্তিকে অভয় সম্মান দিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেবত্বে বরণ করেছে। এই দেয়া-নেওয়া তাদের গতি এত সহজ ও স্বাভাবিক যে শরীরের রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। শরীরের যে স্থানটিতে রক্ত তৈরী হয় সেখানেই যদি রক্ত আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে শরীর রক্ষণ ও বর্ধন কিছুই সম্ভব নয়। নূতন জ্ঞান ও নূতন অভিজ্ঞতা সকলের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্যে তার জীবনে প্রয়োগ করে ফললাভ করতে পারে। জ্ঞানের এই প্রয়োজনের দিক সম্বন্ধে প্রত্যেক জাগ্রত সমাজ সব সময়েই সচেতন। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই চেতনাই প্রত্যেক সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির আসল কারণ। পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতি ও সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে—এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়—এ সর্বকালের সর্বমানবের অগ্রগতির আদিকথা।

প্রেটো হতে আরম্ভ করে এ যুগের গান্ধীজী পর্যন্ত যে চিরন্তন সত্য মানবসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন সেটা আসলে এই—যে কারণ কার্য পরম্পরায় সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং যে শক্তি সকল সময়ে সমাজজীবনে গতির সঞ্চার করে সেটা আসলে শিক্ষা। Education itself is another name for the basic processes of human development. সমাজ উন্নয়নের মূলে এই যে আদিশক্তি যুগ যুগান্তের কালপ্রবাহে গোপনে ও অলক্ষ্যভাবে কাজ করে চলেছে, তাকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করা, সাধারণের মনোজগতের সঙ্গে পরিণত করা,

প্রতি মানবের প্রতিদিনের কর্মে ও জীবনধারায় প্রাণবন্ত করা—এ যুগের শিক্ষাকর্মীর সাধনা।

মানব অনুধাবনের এই basic process বা আদি প্রণালী কোথায় কি ভাবে কাজ করছে, কোন অবস্থায় কোন শক্তির প্রভাবে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সহজ প্রকাশ পথ না পেয়ে অগ্রগতি ব্যাহত করছে—এ যুগের শিক্ষাবিদ্‌গণ একে একে তা সকলের দৃষ্টিপথে তুলে ধরছেন।

আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি তার ইতিহাস যদি তলিয়ে দেখি তাহলে শিক্ষার সাথে সমাজের আসলে কোথায় যোগাযোগ সেটা আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে। মানুষ প্রথমেই সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করতে শেখেনি। অনেক বৎসরের অনেক অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে তার যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে। এই যোগসূত্র সাধারণ স্বার্থ, বেঁচে থাকবার সহজ প্রবৃত্তি থেকে সুরু হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মৈত্রীর কল্যাণ অথবা আদর্শের পথে এগিয়েছে। প্রত্যেক জাগ্রত সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যখন নিজেদের কথা ভাবেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেই সমাজের অন্য সকল লোকের কথাও ভাবেন। সেই জন্য একের সমস্যা সমাধান হওয়ার সঙ্গে অন্যেরও সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে বা সমাধান করবার চেষ্টা হয়েছে। একথা সত্য, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে শুধু নিজেকে নয়, অপরকেও সাহায্য করেছে, শক্তিমান তার শক্তি দিয়ে দুর্বলকে রক্ষা করেছে। এই পারস্পরিক সহায়তার প্রতিটি নরনারী একে অন্যের অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করেছে। এই ভাবে যুগযুগান্তের পারস্পরিক দান প্রতিদানে গড়ে উঠেছে সমাজ দেহ—প্রতিটি নরনারী যার অঙ্গ ও অংশ। এই অনুভূতি, অন্যের প্রতি এই মমত্ববোধ, সুখদুঃখসম্বিত হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ তার সমাজজীবনের প্রাণশক্তি রূপে লাভ করেছে। যে সমাজে এই সহানুভূতি যত বেশী, সে সমাজ তত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে এবং অগ্রগতির পথে যে বাধা এসেছে তা সহজে অতিক্রম করেছে। প্রত্যেক মানুষের প্রতি প্রত্যেক মানুষের সহানুভূতির এই বাঁধনকে আসলে ইমারত গঠনে সিমেন্টের সাথে তুলনা করা চলে। এই বাঁধন যখনই ক্ষীণ হয়ে আসে তখনই সুরু হয় সমাজের অধঃপতন। তখন মানুষ দুঃখে তার আর দুঃখী হয় না, বন্ধুর বিপদে সহজ সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসে না। এই ভাঙন একবার সুরু হলে কোথায় যে তার সমাপ্তি হয় ইতিহাস তার প্রমাণ বার বার দিয়েছে। পৃথিবীর কত জাতি কত সমাজ উন্নতির চরম শিখর থেকে অধঃপতনের গভীর গহ্বরে নেমে এসেছে। কবিগুরু তাঁর কবিদৃষ্টিতে সমাজগঠনের এই মূল সত্যকে দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখেছিলেন বলেই তাঁর কাব্যে সামাজিক অধঃপতনের কারণ এমন সহজ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে :—

"যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে টানিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে রেখেছ যারে তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।"

ব্যক্তিচেতনার মত সমাজচেতনাও একটি গভীর সত্য। এই সত্যকে যে সমাজ যত স্পষ্ট-ভাবে উপলব্ধি করতে পারে ও কার্যক্ষেত্রে সেই উপলব্ধ সত্যকে ব্যবহার করতে পারে, সে সমাজ ততই উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। সাধারণ লোক তার দৈনন্দিন কর্মজীবনে এই সত্যকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু সমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা সমাজরক্ষায় ও সমাজের উন্নতি

অবস্থিতির কারণগুলি স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারেন। এই ভাবে সমাজ-নীতি শেখা হয়। সমাজচেতনা ও সমাজবোধ সমাজের প্রত্যেকটি বয়স্ক নরনারীর মধ্যে জাগে না, এটা সত্য। সেইজন্য অনেক সময় সমাজনীতি কখনও রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও আবার ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে সংগোপনে সমাজ রক্ষা ও সমাজ প্রগতির কাজ অব্যাহত রাখে।

এ যুগের চিন্তাধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজজীবনের এই গভীরতর সত্য সমাজের প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনে কতটা প্রতিষ্ঠিত করা যায় সমাজের পক্ষে তাহাই মঙ্গল। কারণ এইভাবে প্রত্যেকটি নরনারী সমাজের সাথে তার কোথায় যোগ, সমাজের মঙ্গলের সাথে তার নিজের মঙ্গলের কোথায় সম্বন্ধ, তা নিজে উপলব্ধি করতে পারে। সমাজের যে দশজনকে নিয়ে মানুষের জীবন তাদের সাথে সত্যই কোথায় মিল, এই সত্য প্রতিদিনের ঘটনা ও ব্যবহারের মধ্যে যতটা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে ততটা অন্য কোনও ভাবে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। হিতোপদেশ অথবা বক্তৃতামালা মানুষের মনোরাজ্যে সকল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, বিশেষ করে বিভিন্ন মানুষের পরস্পরের ব্যবহারের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো নিজের অভিজ্ঞতা এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে উদ্ঘাটন না করলে সমস্যার মূলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি দশজনের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছে এবং শেষ পর্যন্ত সকল বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে কাজ সমাপ্ত করছে, তার পক্ষে সমবায় নীতি যতটা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব, কেবলমাত্র বই পড়ে অথবা অন্যের বক্তৃতা বা উপদেশ শুনে অন্যের পক্ষে ততটা বোঝা সম্ভব নয়। সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই যে শিক্ষা, এই শিক্ষা শুধু হৃদয় ও মনকে প্রভাবিত করেই শেষ হয়ে যায় না, প্রতিদিনের কর্মে ও ব্যবহারে এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

সমাজ শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কাজ—সমাজ গঠন ও সমাজ উন্নয়নের আদি প্রণালী (basic process) কোথায় কিভাবে সমাজ জীবনে কাজ করছে তা বের করা। সমাজশাস্ত্রের মূল সত্য কি, তা জানা প্রথমে দরকার। তাহলেই অপরাপর তথ্য, যেগুলি মৌলিক না হলেও সমাজজীবনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে, জানা সম্ভব। কোনটি প্রধান আর কোনটি অপ্রধান, এ বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক সময় প্রধান বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে অপ্রধান বিষয়ে ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রয়োগ করা হয়। এ বিষয়ে প্রথমেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

———

একটি আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়

শ্রীশ্যামাপদ বসু

পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম। নাম তার খাগড়া। এই গ্রাম হইতে দক্ষিণে মাত্র মাইল দশেক দূরে হইল বঙ্গোপসাগর। গ্রামের চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, ভূগোলে মেদিনীপুরের পাট-অঞ্চল বলিয়া প্রখ্যাত। শ্রাবণভাদ্রে বর্ষার জলে যখন কানায় কানায় ভরিয়া যায়, তখন যে-কেহই বলিবেন যেন সমুদ্রের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। মাত্র বছর কয়েক পূর্বে এই সময়ে লোকে ডিঙ্গী বা নৌকার সাহায্য ব্যতীত গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া আসা

করিতে পারিত না। অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা এই খাগড়া গ্রামে বাহিরের লোক খুব অল্পই যাতায়াত করিত। কেন না এর নাম কম লোকেই জানিত, কেবল যাতায়াতের সুব্যবস্থার অভাবে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধই ছিল না; তাই জানিবার আবশ্যকতা ও ছিল না। কিন্তু শুনিয়াছি ৪২-এর আন্দোলন কালে মাঝে মাঝে এখানে ছোটখাটো রকমের কংগ্রেসী অফিসিয়ারেরা আসিয়া গুপ্ত সভা করিত, ইংরেজ সরকারের অগোচরে। এত বড় বিপ্লবের দিনেও এই গ্রামটিতে খুব কম লোকেরই আনাগোনা ছিল, কেবল পথ ঘাটের অভাবে।

সকলেই জানেন ১৯৪২-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনের কথা। সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের শোচনীয়ভাবে ক্ষুণ্ণিতে বাধা করিয়াছিল। তাহার পরিণামে হাজার হাজার লোককে অনাহারে ও অর্ধাশনে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল এবং অগণিত মানুষকে মরিতে হইয়াছিল। অথচ এই মেদিনীপুরের লোকেরাই বাংলা তথা ভারতের গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, যেরূপে নিজেদের জীবনকে হাসিতে হাসিতে দেশের জন্য বলি দিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই; উপরন্তু এতবড় আকস্মিক প্রাকৃতিক বন্যা বহিয়া যাইবে কেহ ভাবিতেই পারে নাই।

এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি (Bengal Relief Committee) নামক এক সংস্থা ছোট ছোট অনাথ ও অসহায় বালক-বালিকাদের কেবলমাত্র জীবনরক্ষার জন্য মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় আবাসস্থল খোলে। এই অভাগা খাগড়াগ্রামেও এখানকার কংগ্রেস কর্মীদের আন্তরিক চেষ্টায় বেঙ্গল রিলিফ কমিটির তরফ হইতে একটি কর্মকেন্দ্র খোলা হয়। ইহা এখন আবাসিক প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত। ইহারই ক্রমবিকাশের সামান্য কাহিনী বলিতে চেষ্টা করিব।

আগেই বলিয়াছি, অসহায় ও পিতৃ-মাতৃহীন ছোট ছোট বালকবালিকাদের লইয়া বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সাহায্যে প্রতিষ্ঠান খোলা হইল। কেবল জীবন রক্ষার্থে। কয়েক বছরের মধ্যে কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায়, রোগ ও জরাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। খাওয়া-পরার অভাব একপ্রকার ঘুচিয়া গেল। এখন বয়স বাড়তির সাথে যাহাতে কিছুটা আক্ষরিক জ্ঞানের পরিচয়ও হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইল সাধারণ ইংরেজী আমলের প্রবর্তিত শিক্ষা-রীতি অনুসারে। এদিকে তখন দেশব্যাপী গান্ধীজির বিভিন্ন রকমের আন্দোলনের সহিত ঘুণ বর্জনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। দেশে জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ পুরাদমে চলিতেছিল, অন্য দিকে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের বেগও ছুটিয়া চলিয়াছিল। এই যুগসন্ধিক্ষণে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজি মেখিলেন, যদি আমাদের দেশকে প্রকৃত আদর্শে গড়িতে হয়, অর্থাৎ দেশের মধ্যে আজ যে অরাজকতা, আধিক সঙ্কট, সামাজিক দুরবস্থা, সমতা ও একতাহীন অমানুষিক আলোড়ন বহিতেছে ইহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে হয়, তবে চাই—মানুষের মধ্যে আদর্শ শিক্ষার বিস্তার, যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজেদের দেশকে চিনিতে পারিবে, ভবিষ্যতে আপন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে এবং ফলে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এই ত্রিগুণাত্মক বোধ পরিস্ফুট হইবে, সোজা কথায়—মানুষ সরল ও সত্য হইয়া উঠিবে, এমনি শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। যদিচ ১৯৩৭ সালে এই নতুন শিক্ষার আবিষ্কার ও প্রবর্তন, তথাপি বাঙলাদেশে ইহার প্রচার পরে হইয়াছে।

১৯৩৭ সনে সুরু হইল এই নূতন ধরনের শিক্ষা, যে শিক্ষা প্রথম হইতে জাতির বুনিয়াদকে নিখুঁতভাবে গঠন করিতে সহায়তা করিবে। ইহার কেন্দ্রস্থল হইল ভারতের মধ্যস্থলে এক অজ্ঞাত

ও অন্যান্য পল্লীগ্রামে। নাম তার সেবাগ্রাম। ইহার ঢেউ যখন ভারতের প্রায় প্রতি গ্রামে গ্রামে পৌঁছিল, তখন এই আবাসিক বিদ্যালয়ের (খাপরা) অনেকগুলি কর্মী এই নূতন প্রবর্তিত শিক্ষাগ্রহণের জন্য সেবাগ্রামে আসিলেন। বৎসর কয়েকের মধ্যে বাংলা দেশেও কেন্দ্র স্থাপিত হইল বাড়গ্রামে ও বলরামপুরে। শিক্ষকেরা ট্রেনিং লইবার পর বাপুজীর পরিকল্পিত শোষণহীন এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (বুনিয়াদী শিক্ষা) ছেলে-মেয়েদের দিতে লাগিলেন। প্রায় এই সময় নিখিল ভারত শিশুরক্ষা সমিতি (Save the Children Committee) নামক এক নতুন সংস্থার হাতে এর রক্ষাকার্যের দায়িত্ব চলিয়া যায়। এখনও ইহা তাঁহাদের দায়িত্বেই চলিতেছে।

এখন ছেলেমেয়েরা প্রচলিত একঘেয়ে নির্জীব পাঠ ত্যাগ করিয়া নূতন শিক্ষাকে বেশ উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিল। নিজেরা হাতেকলমে সুতাকাটা, কাপড়বোনা, সেলাই করা, বাগানের কাজ ইত্যাদি শিখিল। ইহার পূর্বে সাহাটদের জন্য মেথর, ধোপা, হাজাম জন্য পাচক থাকিত, এবং আরও সাধারণ কাজের জন্য কত রকমের লোকের ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু এই নূতন শিক্ষা এমনই যাদু করিল যে, ক্রমশ এ সবই উঠিয়া গেল। ইহার ফলে বহু টাকা বাঁচিয়া গেল। এই সমস্ত ব্যয়সঙ্কোচের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নামও বদল হইল "খাপরা আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়"। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ভিতর দিয়া পূর্বাপেক্ষা ছেলেমেয়েদের কাজকর্মে, ও চরিত্রে সমবায়নিষ্ঠা ইত্যাদির উন্নতি দেখা দিল। বেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে এই আবাসিক বিদ্যালয়টির নাম বাঙলার বিভিন্ন জায়গায় এমন কি, ভারতেরও বহু জায়গায় ইহার উন্নতির বার্তা রাষ্ট্র হইল। বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত, রাষ্ট্র-নেতাদের ইহার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এখন সাধারণ লোকে প্রত্যেকদিন যাতায়াত করে, পরন্তু মাঝে মাঝে মন্ত্রী মহাশয়েরও আগমন হইয়া থাকে। মহাত্মাজী ডাঃ বৈদ্যনাথ কাটজু যখন বাঙলার স্বাস্থ্যপাল ছিলেন, তিনিও এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখিয়া আশ্চর্য না করিয়া পারেন নাই, বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি কামনা করিয়া কিছু টাকা সাহায্যও করিয়াছিলেন। আরও শুনিয়াছি যে, তিনি শিক্ষাবিদ্‌দের ইহা দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। এই বিদ্যালয়টির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উন্নতিও স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। যে গ্রামে যাতায়াতের পথ ছিল না, সেখানে এখন চারিদিকে প্রশস্ত রাস্তা হইয়াছে, মোটর গাড়ী অনায়াসে যাইতে পারে। এই কাজে যতটুকু লোকের আসাযাওয়া ততই বিদ্যালয়ের নাম পূর্বাপেক্ষা প্রচারিত হইল। আজ যাঁহারা বাঙলার শিক্ষাব্রতী, যাঁহারা গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁহাদের বোধ হয় ইহার নাম অজানা নাই এবং থাকিবেও না।

এখন দৈনন্দিন কাজকর্মের দ্বারা কি রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, মোটামুটিভাবে তাহা বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

আজ পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, যেদিন হইতে বুনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে সেদিন হইতে ছোট বড় সবাই প্রাতে ৬টায় শয্যাত্যাগ করে। প্রাতঃকৃত্যাদির পর সমবেত প্রার্থনা হয়। সকলে মুখহাত, পায়খানা, কাপড় চোপড় ইত্যাদি সাফাই করিয়া লয়। সকলেই সতীর রক্ষার জন্য ব্যায়াম করে। ছোট বড় সকলেই আপন আপন শরীরের প্রতি যত্নশীল। তাই শতকরা ৯০-এরও বেশীর ভাগ শিশুর স্বাস্থ্য ভাল। রান্না, পরিবেশন, নিজেরাই উৎসাহের সহিত করিয়া থাকে। আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিস, ছেলেমেয়েরা অক্লেশে করিয়া লয়। এই উপরোক্ত কাজের মাঝেই ইতিহাস, ভূগোল, গণিত,

বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য একজন করিয়া ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন। এখানে সাধারণ স্কুলের ম্যাট্রিকের মান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়ই—(অবশ্য ইংরেজি ও বীজগণিত ছাড়া) উপরন্তু ছেলেদের কর্মে আচারে ব্যবহারে, সমবায়নিষ্ঠা, বক্তৃতা দেওয়া এবং কার্য পরিচালনার দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বস্তু আছে যে, ছেলেরাই বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনার ও ব্যবস্থা করে। নিজেরা "ছাত্র সেবক সংঘ" নামে কাজ চালায়। প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী হয়। পর মাসে তার কার্যবিবরণী সকলের সমক্ষে পেশ করে। দৈনন্দিন কার্যের দ্বারা যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা অনায়াসে সংশোধন হইয়া যায়। ইহার দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে, ছাত্রদের কর্ম ও পরিচালনদক্ষতা দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসন-পদ্ধতি হাতে কলমে অনুসরণ করিয়া সহজ ও সরল উপায়ে এ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করে। ইহার পর দিন-লিপি লেখা লইয়া দুইএক কথা বলিব। সবাই প্রত্যেকদিন দিনলিপি ইহা লেখে। এতে থাকে প্রত্যেকদিন কি কি ও কেমন করিয়া কাজ-কর্ম করিল। কাজের মধ্যে কি সমস্যা আসিল, এবং তাহার সমাধান কি উপায়ে করা হইল। এই দৈনিক বিবরণী লেখার দ্বারা হাতের অক্ষর ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি তো সহজেই হয়। তাছাড়া নিজের জীবনে বুদ্ধির ও চরিত্রের বিকাশ কতখানি হইল, শিক্ষকের হাতে বহা পড়ে। শিক্ষক ইহার দ্বারা জানিতে পারেন কোন ছেলে কোন দিকে চলিয়াছে। কোন বিষয়ে ত্রুটি রয়া পড়িলে শিক্ষকের ত্রুটি সংস্কার করিবার সুবিধা হয়।

এই আবাসিক বিদ্যালয়ে সামাজিক আমোদ-সবের ব্যবস্থা আছে। মহাপুরুষদের জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস, সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক উৎসব প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা ছাত্র-দিগকে মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী জানান হয় এবং তাঁহাদের আদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বলিবার শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয়।

পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, প্রচলিত শিক্ষা অপেক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষা বা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বহুগুণে উন্নত। কেননা প্রচলিত শিক্ষায় দেখা যায় ছেলেকে পরাশ্রয়ী এবং নগরাভিমুখী করে, এক কথায় চাকুরীই হইল সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলেরা গ্রামমুখী হইবে। গ্রাম্য জীবনের সাথে পরিচিত করিয়া তুলিবে এই বুনিয়াদী শিক্ষা। বর্তমানে দেশের ও দুনিয়ার সমস্যার আশু সমাধান করিতে হইলে শিক্ষাবিধির একান্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য হইবে শোষণহীন ও অহিংস সমাজ রচনা। ব্যক্তি হইবে স্বাবলম্বী। প্রত্যেক মানুষের চরিত্র হইবে সবল ও শুদ্ধ।

শিক্ষাসংস্কারের একটা দিক

শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত

জগতের প্রত্যেক লোকের চেহারায়, গলায় স্বরে, চলন ভঙ্গীতে, হস্তাক্ষরে, এমন কি অঙ্গুলির ছাপে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই জন্যই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজনের মিল নাই, রামের সঙ্গে শ্যামের বদল করা যায় না, এই বৈশিষ্ট্য লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের মূল ভিত্তি। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারেই মানুষের মনে ভাব জাগরিত হয়, সে পায় কর্মে প্রেরণা, আর তাহার আচার ব্যবহার চিন্তাও হয় তদনুপাতিক। মানুষ যদি ঐ বৈশিষ্ট্যের অবলম্বন বা সমর্থন পায় তবেই সে সত্যিকারের মানুষ হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। সেইজন্যই আমাদের আর্যভারতের বৈশিষ্ট্য মত শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল।

"বৈশিষ্ট্যে তোর নাকাল করে
হলি কতই বিদ্যাবান্।
শিখতে গিয়ে সাগলি খোকা
মনের ছাপটি কর্লি ম্লান।"

বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়া যে শিক্ষা, তাহাকে শিক্ষাই বলা চলে না। আজ তাই বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-হিতৈষীদের প্রচেষ্টাই হইল, কি উপায়ে বৈশিষ্ট্য অনুসারে শিক্ষার প্রবর্তন করা যায়, যাহার ফলে প্রতি দেশেই আজ নার্সারী শিক্ষার প্রবর্তন দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। এই নার্সারী স্কুলে বিশেষ কোন লেখা পড়ার ব্যবস্থা করা হয় না। সাধারণতঃ, ছোট ছোট শিশুদের এখানে ভর্তি করানো হয়। কাহারো বয়স ৫।৬ বৎসরের অধিক হইবে না। এখানে শিশুদের জন্য নানারূপ, বিভিন্ন রকমের খেলিবার উপকরণ সজ্জিত থাকে। শিশুরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে ঐ সকল উপকরণ লইয়া খেলিবার সুযোগ পায়। শিক্ষকেরা আবশ্যকবোধে শিশুদের খেলিবার সাহায্য করেন, আর এই খেলার ভিতর দিয়াই প্রত্যেকটি শিশুর বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান। ইহা ছাড়াও শিক্ষকদের আর একটি বিশেষ কাজ হইল, শিশুর পিতামাতার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা, তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া শিশুর বংশের ভাববারাটি জানিয়া লওয়া, এবং বাড়িতে পিতামাতা শিশুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদের অবহিত করা বা উপযুক্ত করিয়া তোলা। নার্সারী স্কুলের শিক্ষকগণ শুধু শিশুর শিক্ষক নহেন, তাঁহারা পরিবারেরও শিক্ষক

"বৈশিষ্ট্য রহুক বাকে,
উহার কোঁকে পরিপুষ্ট
তাকেই বলে আদর্শ শিক্ষা
তা বিনে ও হবেই নষ্ট।"

এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিলে দেশের যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ও রাশিয়া এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রচুর অর্থ ও প্রচুর সামর্থ্য ব্যয় করিয়াও দেশের সমগ্র একটি অংশকে মাত্র তাহাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইতেছে। দেশের প্রতিটি শিশুকে এইভাবে তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে যে পরিশ্রম ও যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমেরিকার মত অর্থশালী দেশের পক্ষেও সম্ভব কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কাজেই আমাদের এই গরীব দেশের পক্ষে ইহা যে কতটা কার্যকরী হইতে পারে তাহা বুঝিয়ে উঠা শক্ত নয়।

আমাদের দেশের মনীষিগণ কিন্তু ইহার সমাধান

করিয়াছিলেন পারিবারিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়া। ইহাতে টাকা পয়সারও তেমন প্রয়োজন না।

বর্তমান যুগের শিক্ষাবিদ্‌গণও স্বীকার করিবেন যে, শিশুর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিশুর পিতামাতা, আর তাহার গৃহপরিবেশই তাহার প্রকৃত শিক্ষালয়।

শিশু তাহার নিজ নিজ গৃহে যেরূপ স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পারে, স্কুলে তাহাকে যতই সুযোগ বা সুবিধা দেওয়া হউক না কেন, সে কিছুতেই বিনা সঙ্কোচে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার কতকটা সঙ্কোচ থাকিয়াই যাইবে। মনের এই সঙ্কোচই তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া রেখে। গৃহে নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে চলাফেরার ভিতর দিয়া ক্রমেই তাহার মনের প্রসার বৃদ্ধি পায়, আর শিশু স্বাধীনভাবে নিজে কিছু করিয়া পিতামাতা ও ভাইবোনকে দেখাইয়া যতটা তৃপ্তি বা আনন্দ পায়, স্কুলে শিক্ষককে দেখাইয়া নিশ্চয়ই ততটা তৃপ্তি বা আনন্দ সে পায় না। তা ছাড়াও গৃহে তাহার চাহিদা অনুযায়ী খেলিবার উপকরণ সংগ্রহ করা যতটা সহজ স্কুলে ততটা অনেক সময়ই সহজসাধ্য হইয়া উঠে না।

"বংশক্রমিক যে জীবিকা
তারই পূরণ টানে
শিক্ষার জ্ঞানের ব্যাপকতা
বৃহৎ বৃত্তি আনে।"

শিশুর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় কিন্তু তাহার জন্মের বহুপূর্ব হইতেই, আর পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই তাহা পূর্ণরূপ লয়। এই পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই শিশুকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পাঁচ ছয় বৎসরে যারা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, পরবর্তী জীবনে তাহাই তাহাকে চালাইয়া লইবে। শিশুর বাল্যের দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তিগুলি যদি স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হয়, তবে সে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিবে। অন্যথা সে কোন না কোন একটা মানসিক রোগের অধিকারী হইয়া বসিবে।

ভাল শস্য জন্মাইতে হইলে, বীজ বপনের বহুপূর্ব হইতেই জমিকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হয়। চারা অবস্থায় গাছকে যত সতর্কতার সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, গাছ একটু বড় হইলে কিন্তু আর অতটা সতর্কতার প্রয়োজন হয় না। মানুষের বেলাতেও ঠিক তাই। সুসন্তান লাভ করিতে হইলেও পিতা-মাতাকে সন্তান জন্মিবার বহুপূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

আর্যঋষিগণ কবিরা প্রজনন বিজ্ঞানকে শুধু উপভোগেই সার্থক করিতে চান নাই, তাঁহারা চাহিয়াছিলেন ইহার সাহায্যে ক্রমেই উন্নততর মানব সৃষ্টি করিতে। তাই তাঁহারা সৃষ্টি করিলেন বিবাহের কঠিন নিয়ম, যেখানে প্রবেশ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কঠিন পর্ব শেষ করিয়া আসিতে হইত। তারপরে এইখানে ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হইলে, আচার্যের স্বীকৃতি লইয়া আদর্শের প্রয়োজনে উন্নততর জীবন সৃষ্টি করিবার মানসে প্রবেশ করিত গার্হস্থ্যাশ্রমে। তাই এই বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল বংশানুক্রমিক গুণাবলীকে জিয়াইয়া রাখা। এক জীবনের সাধনায় মানুষ যতটা অগ্রসর হইত, বংশানুক্রমের মধ্য দিয়া মানুষের সে গুণাবলী চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। আবার সন্তানের সাধনার ফলে পিতার গুণাবলী উন্নত হইতে উন্নততর রূপে পরিবর্তিত হইতে থাকিত। এই ভাবে সমাজ ক্রমেই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশে উন্নত হইতে উন্নততর হইতে থাকিত। এইভাবেই একদিন আর্যভারত উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আজ হয়তো অনেকেই বলিবেন—এর প্রমাণ কোথায়? কিন্তু একটু বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে—সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারত তাহার রাজশক্তি হারাইয়া বসিয়াছে, তবুও ভারতীয়

কৃষ্টি ভারতীয় সমাজ জীবন্মৃতরূপে কঙ্কালসার ন্যায় রহিয়াই চলিয়াছে। বাহিরে তাহার বিশেষ কোন শক্তি বা উজ্জ্বলতা দেখা না গেলেও এই কঙ্কালসার একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, উপযুক্ত পোষণ ও সমর্থনের প্রতীক্ষায় সে ধারা অন্তঃসলিলা রূপে বহিয়াই চলিয়াছে।

পারিবারিক সংহতির প্রভাবই আজও আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠার দিকে একটু নজর দিলে আমরা দেখিতে পাইব, পৃথিবীর বিভিন্নদেশে বিভিন্ন সময়ে একটার পর একটা সভ্যতা অভ্যুদয় করিয়া সকলকে সাময়িক ভাবে চমক লাগাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু কিছুদিনের ব্যবধানেই সে সভ্যতা কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন দেশেরই গৌরবের ইতিহাস পাঁচ ছয় শত বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। আর ভারতের বুকের দিয়া শত সহস্র ঝঞ্ঝা অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ভারত কিন্তু আজও টিকিয়া আছে, তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া। আজ আমাদের সম্মুখে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—ভারত এতদিন পরাধীন ছিল, তাই তাহার শিক্ষানীতি সবই ছিল বিদেশীর অনুকরণে, আজ ভারত স্বাধীন, সে ইচ্ছা করিলে আজ বিদেশীর স্বার্থের জন্য যে শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, ভারতীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শিক্ষার প্রবর্তন করিতে পারে। তবে শুধু গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলেই এ শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না। প্রতিটি পিতামাতাকেই অগ্রসর হইতে হইবে, এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য।

তাই পিতামাতার চাল চলন, আচার ব্যবহার সন্তানের সম্মুখে এমন হওয়া উচিত—যাহাতে পিতামাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা বা ভক্তি ক্রমবর্দ্ধনশীল হয়। পিতামাতার প্রতি সন্তানের টান যতই প্রখর হইতে থাকিবে, সন্তান ততই উন্নত হইতে উন্নততর হইতে থাকিবে।

তাহা হইলেই দেখা যায়, আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাসংস্কারের প্রথম ও প্রধান প্রচেষ্টাই হইবে আদর্শ পিতামাতা গঠন করা। আমেরিকায় যে Parent education-এর আন্দোলন চলিতেছে, ইহাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। পারিবারিক আবহাওয়া, পিতামাতার আচার ব্যবহার ও মতিগতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা কোনক্রমেই সুশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে পারি না। দেশের মঙ্গলকামী প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর আজ একবাটি ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের কোন প্রশ্ন উঠে না। বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্য অট্টালিকা, মূল্যবান আসবাব ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি যেখানে সম্ভব, সেখানে ব্যবস্থা করাই ভাল। যেখানে সম্ভব নয়, শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানেও আমরা স্থগিত রাখিতে পারি না।

প্রত্যেক মুটীরকে, প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণকে আমাদের শিক্ষা ভারতের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক মাতাপিতা যে সন্তানেরই আদি ও আদর্শ শিক্ষক, এ তথ্য তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অনেকেই সন্তানের শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে রাজী আছেন, কিন্তু তাঁহারা যদি নিজেদের স্বাভাবিক গুরু হারিয়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চান, সেইখানেই হইবে মারাত্মক ভুল। অথচ এই ভুলেরই প্রচলন হইয়াছে সমাজের সর্বত্র। এ ভুলের সংশোধন না করিলে আমাদের কিছুতেই রেহাই নাই। আসল কথা এই যে, আজ আমরা এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যেখানে দেশের প্রত্যেক পিতামাতার, শিক্ষকের ও সমাজসেবকের নূতন শিক্ষায় সংস্কৃত হইতে হইবে, আদর্শ শিক্ষাব্রতীর ছাত্রত্ব বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাদের দৈনন্দিন চালচলনকে পরিমার্জিত করিয়া, সুসংস্কৃত করিয়া আত্মগঠন করিতে হইবে। এই গঠন কার্যে আমরা যদি সফলতা লাভ করিতে পারি, তবেই আসিবে সর্বপ্রকার শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার সাফল্য।

———

শিক্ষা

ম হি বল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

CALCUTTA UNIVERSITY

১৩শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৬১ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

ইংরেজীর নূতন সিলেবাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কোর্সে ইংরেজীর সিলেবাস পরিবর্তনের এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানের তিনটি পত্রের বদলে দুইটি পত্র থাকিবে এবং ঐ দুই পত্রেও তাড়াতাড়ি অবাধে ইংরেজী পড়িতে পারা, শুদ্ধভাবে ইংরেজী লিখিতে ও ইংরেজী ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারার মত জ্ঞান অর্জন করাই লক্ষ্য থাকিবে। প্রথম পত্রে অনুবাদ, সার-সংক্ষেপ, ভাব সম্প্রসারণ ও প্রবন্ধ রচনার জন্য মোট একশত নম্বর থাকিবে। দ্বিতীয় পত্রে নির্দিষ্ট গদ্য পদ্য ও নাটকের জন্য একশত নম্বর থাকিবে।

ইহা ব্যতীত ইংরেজীতে আরেকটি কোর্স থাকিবে, ইচ্ছা করিলে ছাত্রছাত্রীরা তাহা পড়িতে পারিবে। উহাতেও দুইটি পত্র থাকিবে। প্রথম পত্রে নাটক ও নির্দিষ্ট কাব্যগ্রন্থের উপর একশত নম্বর ও দ্বিতীয় পত্রে গদ্যের উপর একশত নম্বর থাকিবে।

সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করেন, ভবিষ্যতে আঞ্চলিক ভাষাই মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হইবে, এবং সহায়ক ভাষারূপে ইংরেজী শিখিলেই চলিবে। ছাত্রদের সাহিত্যের রসবোধ মাতৃভাষার মাধ্যমে জাগরিত করিলেই ভাল হইবে, এবং ইংরেজী পড়িয়া বুঝিতে ও নিজের মনোভাব ইংরেজীতে প্রকাশ করিতে পারিলে যাহার ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইবে সে ইংরেজী সাহিত্যের রসবোধ হইতে বঞ্চিত থাকিবে না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের নূতন পরিকল্পনা

কিছুদিন যাবৎ নানা প্রদেশেই ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছিল, এবং কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাবিদ্‌গণ তাহার কারণ অনুসন্ধানে ও সংশোধনের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। অন্য কারণ যাহাই হউক নিয়মানুবর্তিতার অভাব অন্যতম কারণ। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় আর্থিক উন্নতির প্রস্তাব ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে।

১। রামকৃষ্ণ কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী সিনেট ও সিণ্ডিকেট পুনর্গঠনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন

২। রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাব দূর করিবার জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিগুলি পুনর্গঠন

৩। শিক্ষকদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা

৪। পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্তন

৫। আত্মসংযম শিক্ষার, সমাজসেবামূলক কার্যে, পাঠ্য বিষয়ের বহির্ভূত কার্যে ছাত্রদের উৎসাহ দান

৬। বিদ্যালয়গুলির অনুমোদনসম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ এবং

৭। পাঠ্যতালিকায় নীতিশিক্ষামূলক বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা।

উপরে লিখিত ব্যবস্থাগুলির কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। কার্যে পরিণত হইলে ইহারা শিক্ষাব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি আনিতে পারিবে। তবে ইহার মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতার মধ্যেকার সম্পর্ক। দেশের লোকের শ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষ, স্বাধ্য পারিশ্রমিকে সাংসারিক অভাব হইতে মুক্ত, আপনার বৃত্তিতে নিষ্ঠাবান ও ছাত্রের প্রকৃত কল্যাণকামী শিক্ষকের হাতে যদি শিক্ষাদানের সুযোগ পায় তবে আমাদের ভবিষ্যতের আশাভরসার স্থল ছাত্রদল যে আত্মবিশ্বাসী, শ্রদ্ধাশীল, বিনয়ী, জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক এবং সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য উৎসুক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি দিল্লীতে অখিল ভারত সংস্কৃত সাহিত্য-সম্মেলনের এক বার্ষিক অধিবেশন হইল। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত চিন্তামন দেশমুখ। কেন্দ্রীয় অর্থসচিব তাঁহার সমগ্র অভিভাষণ সংস্কৃত ভাষায়ই দেন। ইহাতে তাঁহার সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ ও তাহাতে অপূর্ব ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃতকে আমরা মৃত ভাষারূপেই জানি, এই ভাষায় সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি পাঠ্য আছে কিন্তু কথ্য ভাষারূপে ইহার ব্যবহার নাই। মাদ্রাজী ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুতা কমলাদেবী ও অন্যান্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃতে বক্তৃতা ও উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইহারা দেবভাষা সংস্কৃতের মানকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া উহার সাহিত্যমন্দিরে দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

এই ভাষায় আমাদের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ইতিহাস, ও তাহার সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ আছে এবং ইহাই একদিন বিশ্বের কাছে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহার প্রতি উদাসীনতা ও উপেক্ষা কখনই শুভ নয়। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পাশাপাশি একটা ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ইহার প্রতি উদাসীনতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইহার শিক্ষাদান প্রণালীকে যুগোপযোগী করিয়া গঠিত না করিলে হয়ত ইহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা যাইবে না।

কেহ কেহ আবার ইহাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী। সব দাবির মত ইহারও সপক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার অনেক আছে, তবে জগতে যোগ্যতমেরই বাঁচিবার ও উঠিবার অধিকার। সংস্কৃত ভাষা যুগ যুগ ধরিয়া সাহিত্যে ও দর্শনে ভারতীয় কৃষ্টির অমূল্য ধনকে বক্ষে ধরিয়া আপনার মাহাত্ম্য সগৌরবে প্রচার করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা প্রমাণিত হইবে কি?

কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে কলেজ স্থাপনা

কিছুদিন আগে কাগজে দেখিয়াছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ঘোষ বলিয়াছেন যে সহরতলী অঞ্চলে ১৪টি কলেজ খোলার যে

পরিকল্পনা তাঁহার আছে তাহাদের মধ্যে অন্তত ছয়টি কলেজের কাজ আগামী জুন মাসের মধ্যেই আরম্ভ করিবেন। এই কলেজগুলির কিছু বিশেষত্ব থাকিবে - তিনি আশা করেন। যদি ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্তত দুই তৃতীয়াংশকে যদি অন্তত ভবিষ্যতে জীবিকাসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া না হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলির সমস্যার সমাধান করা অসাধ্য হইয়া পড়িবে। তিনি মনে করেন এই কলেজগুলিতে কতজন যুবককে কোন্ ধরনের জীবিকার জন্য নিয়োগ করা যাইবে, আগে তাহার একটা পরিকল্পনা করিয়া সেই অনুযায়ী ছাত্রভর্তি নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। কিন্তু জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে, উপযুক্ত পরিমাণে জীবিকার সংস্থান না করিলে এই ব্যবস্থা করা নিষ্ফল। শুধু চাকুরি নয়, শিল্প বাণিজ্যে সর্বত্র যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় লোকে কাজ পাইতে পারে সেদিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

পরলোকে শিক্ষাব্রতী জগত্তারণ ঘোষ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত লিখিতেছি, প্রবিত-মনা শিক্ষক ও সাহিত্যিক জগত্তারণ ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং শিক্ষকতা-ব্রত তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অপত্যস্নেহ ছিল, শুধু স্কুলেই তাহাদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক শেষ হইত না, পরবর্তী জীবনেও তিনি তাহাদের উপদেষ্টা বন্ধুরূপে কাজ করিতেন। অনেক ছাত্রকে তিনি সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের লেখা প্রকাশ করিয়া, লিখিতে উৎসাহ দিয়া। শিক্ষক-জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে নিজে পরিচিত ছিলেন, সেজন্য তাঁহার ছাত্রদের জীবনসংগ্রামের পথেও তিনি অনেক সময়ে সাহায্য করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। পুরাতন ছাত্রদের সঙ্গে যোগ রাখা তাঁহার শুধু কর্তব্য ছিল না, তিনি ইহাতে নিজের জীবন সার্থক মনে করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা নিষ্ঠাবান একজন শিক্ষাব্রতী হারাইলাম।

ছাত্রদের প্রতি কংগ্রেস সভাপতির উপদেশ

মালদহে অনুষ্ঠিত পশ্চিম-বঙ্গ প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের বর্তমান অধিবেশনে একটি প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনেরও অনুষ্ঠান হয়। বহু ছাত্রছাত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীধেবর সম্মিলিত ছাত্রছাত্রীদের দেশের প্রতি গুরু দায়িত্ব পালন করিবার জন্য চরিত্র গঠনে আহ্বান জানান। তিনি দুঃখ করেন যে, ক্রমেই যেন ছাত্রসমাজে নিষ্ঠানুবর্তিতা ও পাঠে অমনোযোগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি বলেন মানবতার সেবা ও শিক্ষালাভ, ছাত্রসমাজের লক্ষ্য এই দুইটিই হওয়া দরকার। তাহারা ইহা হইতে বিচ্যুত হইলে সমাজের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি। সেজন্য তিনি ছাত্রসম্প্রদায়ের হৃদয়ের ও মনের পরিবর্তন সাধনের জন্য আবেদন করেন।

তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, ছাত্রেরা অতিমাত্রায় সিনেমাপাগল হইয়া উঠিয়াছে। নব্য ছাত্রদের যদি সিনেমা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়, নিঃসন্দেহ তাহারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবে। তাহারা সিনেমা অভিনেতাদের মত চলাফেরা করিতে, পোষাক পরিচ্ছদ পরিতে চেষ্টা করে। সিনেমা সংক্রান্ত বই ও পত্রিকা তাহাদের প্রিয় পাঠ্য এবং পিতামাতা, অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক, সিনেমা দেখাই চাই, অন্তত মাসে একবার করিয়া। অবশ্য সব ছাত্রই এই দলে পড়ে না। তবে অধিকাংশই বোধ হয় পড়ে। এই ভাবে তাহারা শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় করিতেছে।

কংগ্রেস সভাপতি ছাত্রদের এই ভাবে স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া স্বচ্ছ চিন্তাশীলতার সাধনা করিতে বলেন। তাহারা বিচারবুদ্ধি দিয়া ভালমন্দ বুঝিতে শিখুক। নিজেদের ভুল ত্রুটি যেদিন তাহারা

সংশোধন করিতে পারিবে সেদিনই দেশের মঙ্গলের দিন সুরু হইবে।

শিক্ষাব্রতীর পরলোক গমন

এবারে শিক্ষকের পরলোক গমনের কথাই লিখিয়াছিলাম। তাহার পর অকস্মাৎ আর একজন শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত হইলাম। ইনি প্রেসিডেন্সি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমাদের পরম স্নেহের পাত্রী শ্রীযুতী কমলা চট্টোপাধ্যায়। ইনি নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় অতি সামান্য সম্বল লইয়া এই বিদ্যালয়টিকে সহরের অন্যতম উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন। নিরহঙ্কার, অমায়িক স্বভাবের জন্য ইনি শিক্ষয়িত্রীর ছাত্রীদের, তাহাদের অভিভাবকদের ও সমস্ত পল্লীটির প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র পল্লীতে গভীর শোকের ছায়াপাত হয়। তাঁহার শেষ যাত্রার পথে যে বিরাট জনতা পরলোকীদের অনুগমন করে তাহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি শুধু যে বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন তাহা নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব ও দুঃখের প্রতি সহানুভূতি তাঁহাকে নানাভাবে ছাত্রীদের কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত রাখিত। বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাঁহার কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবনের যোগ ছিল। এই রকম একজন শিক্ষাব্রতীর অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা

বিনোবা ভাবে

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির বয়স ষোল বছরের পূর্ণ হলো। এত দিন পরে আর এই পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তবু কিন্তু আজও সকলে নিঃসংশয় নয়। আর, বড় বড় নেতাদেরও এক এক সময় এমন একটা কথা বলে ফেলতে যে আশ্চর্য লাগে। মাত্র এবছর মীরাট ইসলামিয়ায় একজন একটা কথা বলেছিলেন, আর বলেছিলেন এ শিক্ষায় আমরা আবার পিছিয়ে পড়বো। ওঁর মত লোকেও যখন সংশয় পোষণ করেন তখন আমাদের আরও বেশি সাবধানে থাকা দরকার। আত্মপরীক্ষা তো আমাদের পদে পদেই করতে হবে।

বর্তমানে যে শিক্ষা চলছে সকলেই তার নিন্দা করে এবং করেছে। তাও সেই শিক্ষা কাদের জন্য? কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছেন যে দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা চালাতে হবে। ওয়ার্দিং কমিশন দেশে বুনিয়াদী শিক্ষা চালাবার কথা স্বীকার করেছেন। সরকারও তা মেনে নিয়েছেন। এটা সুখের কথা। এত সব কাজ করার আছে যে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমাদের এখন তাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে যাতে এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব স্পষ্ট হয়।

বুনিয়াদী তালিম থেকে দুই রকম পরিচয় পাওয়ার কথা আর সেই দুটিই আমাদের সম্পন্ন করতে হবে। এক তো এই পদ্ধতিতে যে সব ছেলে মেয়ে তৈরি হবে, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। দেশের সাম্পত্তি বাড়াবে। লোককে দেখানোর জন্য এই শিক্ষা গ্রহণ করলে চলবে না।

দৃঢ়তার সঙ্গে এই শিক্ষা গ্রহণ করা চাই আর এই শিক্ষায় লোকের কাছে পাকা হওয়া চাই। দ্বিতীয় পরিচয়, আমাদের ছেলেরা দেশের নেতৃত্ব করতে পারবে। তাদের মধ্যে সংযোজন শক্তি থাকবে। বর্তমান শিক্ষায় যে রকম নেতা তৈরি হচ্ছে এই শিক্ষায় তার চেয়ে অনেক উঁচু দরের নেতা সৃষ্টি হবে। এই দুটি পরিচয় যাতে যাতে সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে।

তাছাড়া আর একটা কথা, বুনিয়াদী শিক্ষায় খরচ বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বরং দেখাতে হবে সরকারের উপর শিক্ষার জন্য যতটা ভার পড়ে এ শিক্ষায় তার অনেক কমান হয়েছে। সাধারণত যে তিনটি বিষয় বলা হয়, বুনিয়াদী শিক্ষায় এই তিনটি লক্ষণ থাকবে কিন্তু আজ এক বিশেষ সময় উপস্থিত সে জন্য চতুর্থ আরেকটি বিশেষ পরিচয় থাকবে। সেটা হচ্ছে, সমাজে যে পুরানো মূল্য চলে আসছে তার মোহ ছাড়তে হবে। নয়ী তালিম যদি নতুন মূল্য এনে দিতে পারে তবেই তার নয়ী তালিম নাম সার্থক হবে। এদিক দিয়ে দেখলে, আজ যে ভূদানের কাজ আরম্ভ হয়েছে, আর এর পর যে গ্রাম-রচনা, গ্রাম-স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হবে তা সম্পূর্ণ নয়ী তালিমের উপর নির্ভর করবে। আর সেজন্যই এই কাজের জন্য ছেলে তৈরি করা নয়ী তালিমের কাজ। এ জন্যে আমি বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিত্য-নয়ী-তালিম নাম দিয়েছি। দশ বছর আগে এর যতটা অন্য রকম ছিল। আবার দশ বছর পরে এর রূপ আরো অনেক বদল হবে। ধরে নিন যে ভূদানের যজ্ঞ সফল হয়েছে, ভূমির ঘাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছে, তখন দেখবেন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তার সমাধান করার দায়িত্ব নয়ী তালিমের ওপরেই পড়বে। হয় তো প্রশ্ন উঠবে, দেশ রক্ষার কি ব্যবস্থা হবে? তারও উত্তর নয়ী তালিম দেবে। দেশরক্ষা বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই, নয়ী তালিম এমন কথা কখনও বলবে না। দেশ যেমন যেমন উন্নত হবে, তার সুযোগও যেমন যেমন বাড়বে নয়ী তালিমকেও নিজের রূপ বদলাতে হবে। এইটিই নয়ী তালিমের স্বরূপ। আমি সামান্য দিগ্‌দর্শন করে দিলাম কিন্তু তারি মধ্যে নয়ী তালিমের দর্শন নিহিত আছে। আমি কেবল বলতে চাই যে ভূদানের কাজ চলছে আর সঙ্গে সঙ্গে আমি নয়ী তালিমের কথা চিন্তা করে যাচ্ছি। আমার এমনও মনে হয় আমি নয়ী তালিমের কাজই নিরন্তর করে যাচ্ছি।

আজকের দর কিছু দেখে খুব খুশি হয়েছি। যাঁরা এসব কাজ করেছেন তাঁরা নিজেদের বিশ্বের অগ্রভূক্ত মনে করে সেভাবে আপন আপন জীবনকে শুদ্ধ করবেন। এই আমার আশা ও প্রার্থনা। ঈশ্বর আপনাদের উপযুক্ত বল ও বুদ্ধি দিন।*

---

*সর্বোদয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বলরামপুরে প্রদত্ত ভাষণ।

টয়েন্‌বী ও বর্তমান জগত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক টয়েন্‌বী (Arnold, J. Toynbee) A. Study of History লিখেছেন দশ খণ্ডে। আশ্চর্যবাগী ঐতিহাসিকের লেখায় পাণ্ডিত্যের এবং সাহিত্যরসের অদ্ভুত সমন্বয়। নিজের সিদ্ধান্তকে জোরালো করবার জন্য তাঁর পাতায় বাইবেলের বাণী তুলে দিয়েছেন, বড়ো বড়ো কবিদের স্মরণ নিয়েছেন। ইতিহাসের নীরস তত্ত্ব ঐতিহাসিকের লিপিচাতুর্যে কতখানি রসালো হতে পারে—টয়েনবীর ইতিহাস পড়লে তা উপলব্ধি করা যায়।

A Study of History-র নবম খণ্ডে মানুষের সভ্যতা ও বহুশক্তি নিয়ে যে-আলোচনা তিনি করেছেন তা পড়ে আমার বারে বারে মনে হয়েছে গান্ধীজির কথা। টয়েনবী বলেছেন, বাহ্যিক সভ্যতার উত্তরোত্তর উন্নতি মানুষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র পরিয়ে দিয়েছে; চেতন অচেতন যোনি শক্তিই তাকে আজ পর্যন্ত রুখতে পারে নি। কিন্তু মানুষের চলার পথে একটি শত্রু আজও বাধা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর এই বাহ্যিক শত্রুটি, টয়েনবীর ভাষায়, Man himself অর্থাৎ মানুষ নিজেই আজ নিজের প্রবলতম শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে। টয়েনবীর মতে মানুষ জড়প্রকৃতিকে নিঃসংশয়ে জয় করেছে। তার এখনকার সমস্যা বাহ্যিক নয়, আধ্যাত্মিক। বাইরে সহায় করে যে বিরাট শক্তি সে অর্জন করেছে সেই শক্তিকে সে লাগাবে ঈশ্বরের এবং নিজের অনুকূলে—এ সমস্যাই আজ সকল সমস্যাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। মানুষ আজ কী করবে নিজেকে নিয়ে, কি রকম তার আচরণ হবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে, ঈশ্বরের সম্পর্কেই বা সে কোন্ পথ অবলম্বন করবে—এই আধ্যাত্মিক সমস্যা আজ নিদারুণ হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জীবনে। একদিকে Technology, আর একদিকে Morality,—এই দুয়ের টানাটানির মধ্যে পড়ে মানুষের অবস্থা আজ সঙ্কটময় হয়ে উঠেছে!

টয়েন্‌বী বলছেন, বিগত পাঁচ ছয় হাজার বৎসর ধরে মানুষ লড়াই করে এসেছে, শ্রেণী-সংগ্রামে বারম্বার লিপ্ত থেকেছে। এই শ্রেণী-সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের ফলে কম্‌সে-কম বিশটা মানব-সভ্যতার অকালে অপমৃত্যু ঘটেছে। এবারে যদি লড়াই বাধে তবে শুধু যে একটা সভ্যতারই মৃত্যু হবে, তা নয়। মানুষের জাতই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় আনবিক বোমার বিস্ফোরণ মানুষের ইতিহাসে এমন একটা যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটিয়েছে যাকে কোনরকম অত্যুক্তি না করে প্রলয়ঙ্কর বলা যেতে পারে। হিরোশিমার ঘটনাকে সম্মুখে রেখে টয়েনবী বলছেন: মানুষকে আজ দুটো পথের একটা পথকেই বেছে নিতে হবে। সে মৃত্যুর পথে যাবে, না জীবনের পথে পা বাড়াবে? মানুষের সভ্যতা আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে।

টয়েন্‌বী বলছেন, সভ্যতার তরণী ইতিহাসের তরঙ্গবহুল সমুদ্রপথে ভাসতে ভাসতে চলেছে বিগত পাঁচ থেকে ছয় হাজার বৎসর ধরে। আজ আমেরিকার আর রাশিয়ার নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন একটা আপত্তিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে এই ভাসমান তরণী যে কোন মুহূর্তে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। কেউ আর জোর করে

বলতে পারে না—ভবিতব্যতা মানুষের জন্ম অন্ধকারের মধ্যে কি লেখা করে রেখেছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! অন্তপ্রকৃতিকে জয় করে মানুষ যখন বিজ্ঞানলক্ষ্মীর আশীর্বাদে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য রচনার স্বপ্ন দেখছিলো তখন সেই স্বপ্ন আজ ধূলিসাৎ হওয়ার পথে। পাশ্চাত্যের অন্ধ যন্ত্র-পূজা মানব-জাতিকে আজ প্রলয়ের তীরে টেনে নিয়ে এসেছে।

টয়েনবীর মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আশা আছে, যদি সে নম্র হয়ে এখনও স্বীকার করে: যন্ত্রসভ্যতা (Mechanised Technology) আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মানুষকে মূল্যবান কিছুই দিতে পারেনি। এই যন্ত্রদানব পাথরের পাহাড়কে স্থানচ্যুত করতে পারে, একথা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে যে বর্বরতা নিহিত রয়েছে সেই আত্মঘাতী বর্বরতাকে কি এই যন্ত্র সভ্যতা অপসারিত করতে পেরেছে?

টয়েনবী বলছেন, যন্ত্রতার ভিতর দিয়ে নিজের আত্মাকে গ্লানিমুক্ত করলেই পাশ্চাত্যের কাজ ফুরিয়ে যাবে না। তার দ্বিতীয় কাজটি হবে পাশ্চাত্যের মূঢ় চৌবাচ্চাকে ভরিয়ে তোলা সেই ঝরণার নির্মল জলধারায় যার মধ্যে ধর্ম রয়েছে প্রবহমান। পশ্চিমের মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের রূপান্তর ঘটানোর উৎসমুখটি পাশ্চাত্যেও নেই, রাশিয়াতেও নেই। কেন? টয়েনবী বলছেন, History and Scripture had testified with a conclusive unanimity that the parts of Ceasar and Christ could never both be played by the same person or same people। হাইড্রোজেন বোমার ভয় দেখিয়ে পৃথিবীকে শাসন করবো এবং সেই সঙ্গে শান্তির ও প্রেমের বাণী শুনিয়ে খ্রীষ্টীয় আদর্শের পায়ে পূজা দেবো—এ দুটো এক সঙ্গে চলবে না। Mechanised Technology-র সর্বগ্রাসী চর্চা ব্যক্তিকে অথবা জাতিকে আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উন্নত করবার শক্তি রাখে না এই কথাটা টয়েনবী জোরের সঙ্গেই বলেছেন। টয়েনবীর ইতিহাস পড়তে পড়তে যেমন গান্ধীজির রচনার কথা মনে হয়েছে তেমনি মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'যুক্তধারার' কথা। পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে যন্ত্রকে যারা প্রাণপণে দেবতার আসনে বসাবার চেষ্টায় আছেন ধর্মকে ছদ্মআসন করে—তাঁদের আজের দৃষ্টিকে বিনয়ের সঙ্গেই আকর্ষণ করি টয়েনবীর রচনাবলীর দিকে। পড়তে পড়তে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাওয়া যাবে।

দেশের শিক্ষাব্রতীদের কাছে বিনীত নিবেদন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে টয়েনবীর কাছে সত্য বলে যা প্রতিভাত হয়েছে তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের তাঁরা যেন পরিচয় করিয়ে দেন। যন্ত্রসভ্যতার একটা মোহ আছে। সেই মোহে আমাদের যুবসমাজের অনেকেরই দৃষ্টি আজও আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গান্ধীজির অহিংসার বাণী অনেকের কাছে এখনও স্বপ্নবিলাসীর সূত্রগর্ভ আদর্শবাদ মাত্র। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের চিন্তাধারার দিকে যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযানের যে মৃদু সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে—তা শুনবার মতো কান যদি থাকে গান্ধীজিকে বুঝবার পথ প্রশস্ত হবে। পথের আলো আমেরিকায় নেই, রাশিয়াতেও নেই, ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে সেই আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে—এ সত্য উপলব্ধি করলে আমাদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে।

———

বি-টি কলেজ ও শিক্ষণ সমস্যা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

শিক্ষণ-শিক্ষা-বিভাগের কথা সাধারণে শিক্ষিত ব্যক্তি খুব কমই জানেন। দেশে ইস্কুল-কলেজ আছে, কিন্তু তার ব্যবস্থার কথা দেশবাসী বিশেষ আলোচনা করেন না। কারণ, দেশের সমৃদ্ধি এবং ধনদৌলতের বৃদ্ধির পক্ষে এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে তেমন কিছু করে না। সমস্যা যখন বেশি বেড়ে যায় তখন সাধারণত আশু সমস্যার দিকেই নজর পড়ে। অথচ প্রবীণের ছেলের মতো এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেশের যথো কাজ করে যাচ্ছে, তা আমরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারি। বৎসর অন্তে ইস্কুলে যখন ভর্তি করতে যাই, বাজারে বই কিনতে যাই, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতির দিকে যখন সচেষ্ট হই, তখনই শিক্ষার নানা সমস্যার কথা মনে হয়। সেই সময়েই আমরা মনে করি, ভালো মাষ্টার কাকে বলে, 'বি-টি' ডিগ্রীটুকু কি জন্য, ঐ ডিগ্রী কারা নেয়।

এই শিক্ষণ-শিক্ষা বা বি-টি যাঁরা পড়তে আসেন এবং সেখানে ঘাঁরা পড়িয়ে থাকেন তাঁদের সমস্যা কিন্তু কম নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে ছয়টি মাত্র। তার যথো মাত্র একটি মফঃস্বলে, বহরমপুরে। কাজেই সুদূর দার্জিলিং থেকে সুন্দরবনের কিনারা পর্যন্ত যে সমস্ত ইস্কুল আছে সকল জায়গা থেকেই শিক্ষকেরা এই কলকাতায় এসে থাকেন।

এঁদের যথো অনেকে নিজ নিজ ইস্কুল থেকে প্রেরিত, তাঁদের যথো অনেকেই এই পাঠকালে ইস্কুল থেকে পূর্ণ বেতন পেয়ে থাকেন। আবার অনেকের সে সৌভাগ্য হয় না। যাঁরা পূর্ণ বেতন পান তাঁদের পক্ষে সমস্যা—ঐ বেতনে তাঁদের সংসার নির্বাহ হোত না, কাজেই উপশিক্ষকতা থেকে যে আয় হোত এই এক বছরের জন্যে (শিক্ষাকাল ৯ মাস) সে আয় বিসর্জন দিতে হবে। তাছাড়া বেতনের কিছুটা থেকে কলকাতায় ছাত্রাবাসের খাওয়া-থাকা চালাতে হয়। যাঁদের বেতন পাওয়ার কোন অধিকার নেই, তাঁদের যদি স্ত্রীর গায়ে গহনা থাকে ভালো, নতুবা অবিবাহিত ব্যক্তি ছাড়া এই শিক্ষণ-শিক্ষা নিতে আসা বিলাস মাত্র।

এই শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক আছে; কিন্তু ছাত্রছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে তা এতই সামান্য যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে 'আপ্‌না টিকট আপ্‌না খরিদো' অর্থাৎ নিজের বই নিজেকেই কিনতে হয়। এই সব বইয়ের দাম কিছু কম নয়; বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক-বিষয়ক বই, এবং তাও আমেরিকা মহাদেশ হতে প্রকাশিত, কাজেই দাম যে কত বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য।

এদের বয়স? এমন দেখা গেছে, বাপ-বেটা দুজনেই বি-টি পড়তে এসেছেন; মা-মেয়ে জোড়া হামেসাই দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র যেসুনদাসী আহারের বর্ণনায় প্রয়োগ করেছিলেন সাড়ে বত্রিশ ভাজা; কিন্তু বয়স এবং মনোবৃত্তির কথা বললে শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে হয়, বর্তমানকালের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিধবার ঘরের সেই চচ্চড়ি, যাতে আছে লাউয়ের ডাল, বীচের টুকরো, ঝিঙা কুমড়ার ফুচি, আর ফুলকপির পোড়া-কোটা চচ্চড়ি, কিন্তু তেল তাতে নেই।

এরপর আবার ভর্তি হওয়ার আগে পুরনো

ছাত্রদের কাছ থেকে এঁরা শুনে এসেছেন, বি-টি বিভাগের অধ্যাপকের মর্যি-ই হচ্ছে নয়, ওঁদের সন্তুষ্ট করাই পাশ করার প্রধান অস্ত্র। কলমের জোরের চেয়ে তোষামোদের জোরই প্রধান। কাজেই অনেকেই পাঠ্যবিষয়ে আর বেশিদূর ছুঁতে চান না। বিদ্যা যদি ওঁদের থাকে তবে অধ্যাপকের মুখ চেয়ে সে বিদ্যার দীপ্তিকে ঘষামাজা চেকে চলেন। হাজার প্রশ্ন করেও ওঁদের মুখ থেকে 'রা' বের করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্যের' চেয়ে শোকাবহ চরিত্র। কাজেই দিনের মধ্যে ছত্রিশবার ওঁরা অধ্যাপকদের কাছ থেকে ধমক কুড়িয়ে চলেন। ওঁরা সত্যিকারের বা, এখানে তা নয়। বয়স চল্লিশই হোক, পঞ্চাশই হোক আর পঁচিশই হোক—এখানে ওঁরা বারো বছরের ছেলে, মেয়ে একটু বেশি বয়স দেখান, অর্থাৎ টেনেটুনে বছর আঠার ধরা যায়।

অধ্যাপকদেরও সমস্যা কম নয়। আসলে ওঁরা দেশের লোকের সঙ্গে খুব যে বেশি মিশেছেন তা নয়। থাকতে হয় কলকাতায়। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ খুব কমই। অথচ, ওপক্ষ সেই অভিজ্ঞতাই কিন্তু নিয়ে এসেছে। যে সব বিষয় পড়াতে হবে—তা বেশির ভাগ বিদেশী গ্রন্থ থেকে আহরিত। দেশের সঙ্গে এগুলো খাপ খায় না, সে প্রশ্ন তুললে বলতেই হয়, 'হতে পারতেম আমি মস্ত একটা বীর।' অতএব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ওপক্ষকে কোন রকম অবসর না দিয়ে মনোবিদ্যা, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার ইতিহাস আর পদ্ধতির চোখা-চোখা বাণ ছুঁড়ে তাদের চিত্তকে অহরহ ক্ষত বিক্ষত করে ফেলতে হয়। প্রয়োজন বোধে কোন সময়ে উদাত্ত, কোন সময়ে গম্ভীর, কোন সময় তীব্র তর্জনী। অধ্যাপকদের পাতন্ত অস্ত্র হচ্ছে শিক্ষকেরা যে কিছুই জানেন না—সেই কথাটিকেই বারবার শোনাতে হবে।

কিন্তু ওঁরা কিছু জানেন না, একথা যদি শুনিয়েই খালাস পাওয়া যেত তবে চিন্তার কিছু ছিল না। দেখা যায়, ওঁরা সত্যি সব কিছু ভুলে গেছেন। অর্থাৎ এম-এ বাংলার এম-এ প্রবৃত্তি যখন ওঁরা পাশ করেছিলেন—তখন সবই জানতেন—কিন্তু কিছুদিন ইস্কুলে কাজ করবার পর দেখা যায় ওঁরা অধিকাংশই সেগুলো ভুলে গেছেন।

ভুলে যাওয়ার কারণ আছে। ইস্কুলে পড়াতে হয় কোন বিষয়ের সামান্য অংশ মাত্র। 'বি-এ, এম-এ' মানের জ্ঞান যে খুব দরকার হয়, তা নয়। কাজেই চর্চার অভাবে সেগুলো ওঁরা ভুলে যান। তাছাড়া মফঃস্বলে সে সব চর্চা করবার সুবিধেও কিছু থাকে না, নেই গ্রন্থাগার, নেই বন্ধুবান্ধব, নেই পরিবেশ। অথচ একথা ঠিক, অতটা পড়েছেন বলেই, সহজে ছেলেদের পড়াতে পারেন। এখন বি-টি পড়তে এসে দেখা গেল, একটা বিষয়ে ততটা জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ের পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যায় না। অথচ, এই ন'মাসের মধ্যে বি-টি কলেজে সেগুলো পড়ানোও যায় না। ওদিকে মনোবিদ্যা নামক নতুন বিষয়বস্তু এমন তাড়া করে যে বাড়ীতেও পড়ে নেওয়ার অবসর নেই। তা ছাড়া আর এক সমস্যা। বি-টিতে তিনটি বেঙ্গল সাবজেক্ট নিতে হয়। যে বিষয়টি ভালো জানি সেটি তো অবশ্যই কিন্তু তা ছাড়া আর দুটি। কি নেওয়া যায়? অপত্যা বাংলা বা ইতিহাস। যাঁরা একটু ঝুঁকি অথচ বৈষয়িক তাঁরা নেন ভূগোল এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান। ভূগোল হয়ত তাঁরা কোন দিনই পড়েননি।

ইংরেজি সাহিত্যের যিনি এম-এ, তিনি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ পড়াশুনা করেছেন—এমন কথা কিন্তু ঠিক নয়। কাজেই প্রথমে গোদমাদ হুরু হয় ব্যাকরণ নিয়ে। প্রবেশিকা ব্যাকরণ আবার সমগ্র ভাবে পড়ে নিতে হচ্ছে; তাছাড়া আছে অলঙ্কার ছন্দ ছড়া প্রভৃতি। ওদিকে সমস্যা হচ্ছে এই, কলেজের বাংলা অধ্যাপক যিনি তিনি নিশ্চিন্তে পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন, যদে

নিয়েছেন—বাংলার বিদগ্ধ-বন্ধু এই বিচারের সমস্ত ছেলেমেয়েরাই পড়ে বসে আছেন। তাঁর পক্ষে এ অনুষ্ঠান করে নেওয়া অন্যায়ও নয়। এমনি করে ইতিহাসের অধ্যাপকের সমস্যা, সমস্যা প্রাথমিকের, সমস্যা কুলোল অধ্যাপকের।

এমনি ক'রে বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে। পাশও অনেকেই করেন। মনস্তাপের মূলধন বজায় রেখে অনেকে বাড়ী ফিরেও যান। কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, ইস্কুলের পড়াশুনার তেমন উন্নতি ঘটছেনা। আমরা অভিভাবকেরা মাথা চুলকোলাম, ভাবলাম বিস্তর—চিন্তাশীল মনস্বিরা যতো। অতঃপর এক শুভপ্রাতে দেখা গেল কেন্দ্রে এক শিক্ষাবিদ্ অভিনব ইস্কুল প্রবর্তনের কথা তুলে দেশের এপার থেকে ওপার শঙ্করাচার্যের মতো পরিক্রম করছেন। অর্থাৎ ছেলেদের মেটে দাঁকা ছুরির মতো, যেন অপদস্থ হালে ছাড়া দিয়ে ঘুছে দিলেই চলে।

কিন্তু যে ধরনের শিক্ষাই হোক, তাকে সার্থক আর সফল করতে অধ্যবসায় দরকার। সেই ব্যবস্থাকে উন্নত করাই যে আমাদের প্রধান কর্তব্য, সেই ব্যবস্থাকে নিত্য আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা যে দরকার—সে কথাটা আমরা ভুলে যাই। অভিনবত্ব আমাদের আকৃষ্ট করে বেশি, নিষ্ঠাকে তাই বর্জন করি। কিন্তু এমনি করে অব্যবস্থিত চিত্ত-কে নিয়ে আমরা কি কোন কিছুকে সফল করে তুলতে পারব?

এইজন্যই বলছিলাম, দেশে যেসব ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলি ঠিকমতো চলছে কিনা, তার অপূর্ণতা কোথায়, তার সমস্যা কোথায়, তার সমাধান কি ভাবে হয়, এই সব আমাদের এখন ধৈর্যের সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। আর, দেশের যেখানে উপকার সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত মত পথমর্যাদা আর স্বার্থকে বিসর্জন দিতেই হবে। দেশের সমস্যাকে ভেবে না দেখে সেই সমস্যাকালে যারা আবদ্ধ, তাদের বিদ্রূপ করার অর্থ দেশকেই বিদ্রূপ করা।

মাষ্টারমশাই সুকুমার মিত্র

শ্রীকালিদাস ঘোষ

মাষ্টারমশাইকে এখনি বেশি করে মনে পড়ে, যখন ক্লাশে বাংলা কবিতা পড়াই। যত সুন্দর আবৃত্তি করতেন মাষ্টারমশাই। বোধ হয় সে সময় আমি সেভেনটে পড়ি। কলকাতার শোভাবাজারে। তারিখের দিক থেকে সেটা হবে ১৯৩০ সাল। বাংলা পাঠ্যগ্রন্থের নাম ছিল—মনমুগ্ধ মনে পড়ছে—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের নির্দেশনী। তাতে শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের একটি কবিতা ছিল;—নামটি আর মনে নেই, তবে তার বিষয়বস্তু ছিল বৃদ্ধদেবের শুশ্রূষা পেয়ে সুজাতার পায়সান্ন নিবেদনের কোন কিছু ব্যাপার। দীর্ঘবিলম্বিত লয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতাটি লেখা। বাড়ীতে যখন একা কবিতাটি পড়তে চেষ্টা করেছি, ছন্দ বুঝে উঠতে না পারায় পড়তে ভাল লাগেনি। পরদিন ক্লাশে নতুন পাঠ দেবার সময় মাষ্টার মশাই চিরাচরিতভাবে বললেন—এবারে কোন কবিতা তোমরা পড়তে চাও? প্রায় সকলেই যে সকল কবিতার নাম করলো তার মধ্যে অন্তত

ঐ কবিতাটি ছিল না—এ কথা বেশ মনে পড়ে। কিন্তু মাষ্টার মশাই কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে নীরব রইলেন,—এ গুরুগম্ভীর নজরে এলেই কি জানি কেন ক্লাশশুদ্ধ সবাই আমরা চুপ হয়ে যেতাম। আজ বুঝতে পারছি—ওঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ছিল—যে ব্যক্তিত্বের সামনে সহজেই আমাদের মাথা নুয়ে যেত। ওঁকে ভয় জন্যে শুদ্ধ করতাম না, চমৎকার পড়াতে পারতেন বলে শ্রদ্ধা করতাম ওঁকে, ভালও বাসতাম। কিন্তু যা বলছিলাম,—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যখন দেখলেন ক্লাশও নিস্তব্ধ, তখন মিষ্টি হাসির সুকোচুরি খেলানো মুখে বললেন, সেই বুদ্ধদেব সুভাষের সম্পর্কিত কবিতাটিই তিনি পড়াবেন। স্পষ্ট মনে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। আমার কথার অবাধ্য না দিয়ে তিনি কবিতাটি পড়তে সুরু করলেন। আবেগে কাঁপা গুরুটি গলায় প্রথম পংক্তিটি উচ্চারণের সঙ্গেই একটা নতুন সৌন্দর্যের দিক যেন খুলে গেল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইলো সারাটি ক্লাশ। আমার মনে তখন কী কলরোল, কী আনন্দঘন বেদনার খেলা। কবিতার সৌন্দর্য সেই প্রথম আমার মনের ক্যামেরায় ধরা পড়লো। আর সেই প্রথম দর্শনেই কাব্যলক্ষ্মীর অধরা নয়নভরা 'প্রেমে' পড়ে গেলাম!

সেই বছরের শেষের দিকে নব বৎসরকে আহ্বান জানিয়ে হঠাৎ এক দুপ্তভঙ্গীর কবিতা লিখে ফেললাম, নাম দিলাম 'নববর্ষ'। মাষ্টার মশাই ছিলেন স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। ছাত্রদের লেখা সযত্নে সংশোধন করে ছাপাতেন। ভয়ে ভয়ে আমার লেখাটি ওঁকে একদিন দিয়ে এলাম। আর কোন খবর নিতে সাহস পাইনি। বড়দিনের বন্ধ হবার দিন ম্যাগাজিন হাতে এল। বলা-বাহুল্য, কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। সংশোধনের ছাপ রয়েছে স্পষ্ট। সেই আমার প্রথম কবিতা লেখা ও ছাপা হওয়া। কবিতার প্রতি যে ভালোবাসা সেদিন ক্লাশে মনের ভূমিতে বীজাকারে প্রবেশলাভ করেছিল, এই ঘটনায় তাতে অংকুর দেখা দিল। সেই থেকে কবিতাকে মনের প্রধান সঙ্গী করে নিলাম। কিন্তু অজানিতে যিনি এই সঙ্গী নির্বাচনের প্রধান প্রেরণাদাতা ছিলেন, তিনি সেই মাষ্টার মশাই। এ কথা তো আর কারুর জানার কথা নয়, আজই তা প্রকাশ পেল আমার কলমে। মনে মনে সেদিন থেকেই মাষ্টার মশাইকে শিক্ষাগুরু নয় শুধু, দীক্ষাগুরু রূপেই বরণ করে, স্বীকার করে নিয়েছি। এ কথা হিনিও অবশ্য জানতেন না। কিন্তু অলক্ষিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধেয়, ভাবগুরু আমি অনুকরণ করেছি, আজও করে চলেছি তাঁরই পথে চলেছি বলে। তাঁর প্রতি আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না; তাই এর তার মুখে খবর নিয়ে জানলাম তিনি এম.এ পাশ করেছেন, কেউ বলে বাংলায়, কেউ বলে ইংরেজীতে। বলাবলি হতো সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছেন। সেকেণ্ড ক্লাশ কথাটার সুস্পষ্ট অর্থ তখনো আমার কাছে ধরা পড়ে নি। কিন্তু আমিও একদিন ঐ রকম এম. এ. পাশ করবো এবং শিক্ষক হবো, এরকম একটা প্রতিজ্ঞা মনের কোণে গোপন করেছি। মনে আছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে ইংরেজীতে পত্র লেখার একটা বিষয় ছিল,—"তুমি শিক্ষাব্রতে সমাপ্ত করে ভবিষ্যতে জীবিকারূপে কোন বৃত্তি বেছে নেবে?" তার উত্তরে আমি জোর দিয়ে নানা যুক্তি দেখিয়ে এই শিক্ষকতাবৃত্তিকে আদর্শন করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলাম। মাষ্টার মশাইয়ের ছবি সেই সময়েও মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল নিশ্চয়ই।

আজ তাই অতীতটাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পাই মানুষের জীবনের বড় দুটি জিনিষ, সবচেয়ে বড়, নেশা ও পেশা;—এ দুটোই গ্রহণ করেছি সেই মাষ্টার মশাইকে সকল করে। অনেকই তো ছাত্র ছিল ওঁর, কিন্তু ঠিক আমার মত এমন অবিকৃতভাবে ওঁকে অনুসরণ করতে

আর একজনকেও দেখলাম না। আমার জীবন রচনার পরিকল্পনায় তাঁর জীবন-দৃষ্টিই গ্রহণ করেছি, এটা আমার পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমাকে নিয়ে তিনি মনে মনে একটুও কি আনন্দ ও গর্ববোধ করতেন না?

আজ কিছু শিখেছি, অনেক দেখেছি এবং প্রায়ই শিখছি এবং দেখছি। জ্ঞানের খনির তার অল্প অল্প খুলে আমার আয়ত্তে এসেছে ও আসছে। আমি, যা জেনেছি তা নেহাৎই তুচ্ছ, কিন্তু আমার জীবনের পক্ষে কম কি? শিক্ষকতা করতে এসে অনেকটা অতিরিক্তভাবে লাভ হয়েছে। শিক্ষণ-শিক্ষার ভ্যানলাটের মধ্য দিয়ে কত কি নতুন প্রণালী জেনেছি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সে সকল শিক্ষা প্রয়োগ করে আমার কাজকে আরও সুষ্ঠু ও সুন্দর এবং সফল করতে পারব, ভরসা করি। কিন্তু জেনে যখন দেখি, দেখি সেই মাস্টার মশাই শিক্ষণ-শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করেন নি কোনদিন, তবুও তাঁর শিক্ষাদান ব্যর্থ হয়েছিল, এ কথা বলি কেমন করে? অন্তত আমি তাঁর একটি ছাত্র হিসেবে তো বলতে পারি—কেন তাহলে অমন করে তাঁর আদর্শে ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি কি তাহলে ব্যতিক্রম? তাঁর ক্লাসে নেহাৎ অমনোযোগী ছাত্রও তো শান্ত হয়ে পড়া শোনায় মন দিত। সাহস দিত। বয়স তাঁর তখন অল্পই ছিল, বার্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন। তার ওপর সবেমাত্র বিয়েও করেছিলেন (কৌতূহলী ছিলাম বলেই এ সংবাদও সংগ্রহ করতে সেদিন ছাড়িনি।) তবু তাঁর ক্লাসে সত্যি গোলমাল হয় নি কখনো, এটা অত্যুক্তি নয়। অথচ আশ্চর্যের কথা, ক্লাসে কোন ছাত্রকে তিনি কখনই এক ঘা বেত মারেন নি বা চড় চাপড় দেন নি। যখন রেগে যেতেন, তখন কেবল ছিপের গাছটা নিয়ে 'খ' হয়ে থাকতেন কারুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। আর একটি ভাল অস্ত্র ছিল তাঁর—গালি নয় শব্দভেদী বাণ। তীক্ষ্ণ তির্যক বিদ্রূপবাক্য ব্যবহার। শব্দগুলি নির্দোষ গালিগালাজ করাই থাকতো, কিন্তু অর্থ খুলতে গেলে আমাদের কান লাল হয়ে উঠতো। মারের চেয়েও এই আঁতে-ঘা-দেওয়া নিরীহ কথাগুলো আমরা খুব বেশী ভয় করতাম। আমার শিক্ষকতার জীবনে এই অস্ত্রটিকে কাজে লাগিয়ে আমি সুফল লাভ করেছি। ক্লাসে ব্যাপক কথাকে আমার কাছেও বিশ্রী কুৎসিৎ লাগে।

হার্বার্টের 'আইড্‌স টেন মেকস্ত' তিনি জানতেন কিনা জানি না, কিন্তু পড়াবার সময় তার ছাপ একেবারেই পড়তো না এমন কথা বলা যায় না। মাতৃভাষার যোগ্য শিক্ষক হতে গেলে তাকে আবৃত্তিকার হওয়া দরকার, মাস্টারমশাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। সত্যি সুন্দর নিখুঁত উচ্চারণসহিত আবৃত্তি পাঠদানের কাজকে অনেক এগিয়ে যায়, প্রস্তুতিবিভাগের বাঘ আমার মনে হয় সুন্দর আবৃত্তিই সবচেয়ে ভালভাবে সমাধা করতে পারে। বি. টি. পড়বার আগেই তাঁর কাছ থেকে এ শিক্ষা আমি লাভ করেছিলাম।

আরও অনেক কথাই বলা যায় তাঁর সম্বন্ধে, কিন্তু পাছে তা একঘেয়ে হয়ে পাঠকের বিরক্তির কারণ ঘটায়, তাই থামতে হল। কলাম মুড় সেই মাস্টার মশাইকে ব্রহ্মচাত করে শিক্ষকতার গণ্ডী থেকে টেনে নিয়ে ১৯৪৩ সালে সিভিল সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে নিয়ে ফেলেছিল—এ সংবাদ পেয়ে প্রচুর ব্যথা পেয়েছি। তার চেয়েও বেদনার বিষয়—তাঁর অকাল-মৃত্যু। পোড়াবাড়ীর সেই বয়স্কাউট সাহসোচ্ছল আর্য বিদ্যালয়ের সাধারণ একজন শিক্ষক অসীম মুকুমার মিত্র, আমার গুরুজন, পথ প্রদর্শককে কি ভুলতে পারি? সমাজ তাঁর দান স্বীকার করতে না পারে, আমার জীবনের সাধনা দিয়েই তাঁকে আমি স্বীকার করে নিয়েছি, এটুকুই আমার সান্ত্বনা ও গৌরব।

ভূগোল শিক্ষা

শ্রীবকুলমালা সেন

(৩)

জলবায়ু ও ফসল

মানুষের সঙ্গে জলের অর্থাৎ বর্ষার এবং জলবায়ুর সঙ্গে ফসলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই সম্পর্ক প্রাথমিক শ্রেণীর বালক বালিকাদের ছড়াগান বা আবৃত্তির মাধ্যমে শেখানো যেতে পারে। অভিব্যক্তির সাহায্যে কতকটা নাটকীয় ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারলে শিশুমন এর মধ্যে যেমন আনন্দ পাবে সুতরাং আকৃষ্ট হবে বেশী। তার ফলে শেখা ও শেখানো সহজ হবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু ও উত্তর-পূর্ব বায়ুই বাংলার বায়ু। বৃষ্টি ও নদনদীর জলই বাংলার জল। ফসলের মধ্যে প্রধান ধান, পাট, চা এবং আম জাম, কাঁঠাল, কলা, আনারস, তাছাড়া কিছু কিছু সবজি ও তৈলি ফসল। বালক বালিকারা এই সব ভূমিকা গ্রহণ করে বাংলার জলবায়ু ও ফসলের রূপকে জীবন্ত করে তুলবে। দুইজন ছেলে মেয়ে নদ ও নদী হবে, বৃষ্টির ভূমিকায় থাকবে একজন। এরা জলের প্রতিনিধি। উত্তর-পূর্ব বায়ু, আশ্বিনের ঝড় ও কাল বৈশাখী হবে একজন করে ছেলে বা মেয়ে। এরা সকলেই মোটামুটিভাবে নীল রঙের পোষাক বা পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে। পার্থক্য বুঝবার জন্য হালকা, মাঝারি ও পুরো নীলের ব্যবস্থা করা চলে। ফসলের মধ্যে ধান পাট ও চা-এর ভূমিকায় থাকবে এতজন করে ছেলেমেয়ে। ফল ও সবজির ভূমিকায় ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যানুপাতে এক বা একাধিক ছেলেমেয়ে থাকতে পারে। যথাযোগ্য রঙের পোষাক বা ফিতে বা রুমালের সাহায্যে বিভিন্ন ফল ও সবজির পরিচয় জ্ঞাপন করা যেতে পারে। তা সম্ভব না হলে ছেলে মেয়েরা নিজেদের পরিচয়জ্ঞাপক নাম লেখা টিকিট বুকে এঁটে নেবে।

প্রথমে প্রবাহিত হয় বায়ু। তারপর আসে বৃষ্টি এবং নদনদীর পূর্ণতা। পল্লী-প্রকৃতির এই পরিপূর্ণতার ক্রোড়ে জন্ম নেয় ফসল।

ক্রীড়াভূমির এক প্রান্তে নদ ও নদীর ভূমিকা গ্রহণকারী ছেলেমেয়েরা পেন্সিল ভঙ্গিতে নদী রচনা করে বসবে—গুটিসুটি হয়ে। তৈলি ফসল ও শীতের সবজি অপর প্রান্তে ছুটি গোষ্ঠী রচনা করে বসবে। মাঝখানে তিনটি চতুষ্কোণ রচনা করে বসবে ধান, পাট ও চা-এর দল। নদনদীর উভয় পার্শ্বে স্থির সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়াবে ফলের গাছগুলি। সকলেই প্রথমে গুটিসুটি মেরে স্থির হয়ে থাকবে। দক্ষিণ পশ্চিম বায়ুর প্রবেশের পর তৈলি ফসল ও সবজি যাবে আর সবার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগবে। বৃষ্টি প্রবেশ করার পর নদনদী ও শস্যক্ষেতে স্ফীতি বিস্তৃতি ও সুচ্ছন্দ প্রাণস্পন্দনের প্রকাশ দেখা যাবে। গাছেদেরও শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটবে। উত্তর বায়ু ও বৃষ্টি প্রথমতঃ থাকবে অন্তরালে। নিজ নিজ ভূমিকার ছড়াগানের সঙ্গে তারা ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হবে।

ছুটি বালক বালিকা প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত থাকবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনার মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্ফুট করতে সাহায্য করবে।

আদিক অভিব্যক্তি দহ ছড়াগান বা আবৃত্তি

দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু—

কাল বোশেখির মত ঘোড়ায়
সওয়ার হয়ে এলাম ধরায়।
মোদের-আকাশ জোড়া বেশ,
মোদের—রূপের নাহি শেষ।
তপ্ত যার আকুল ডাকে
শ্যামা কাহার দূরে থাকে।
বরুণ রাজার রাজ্য ছেড়ে তাই তো এসেছি,
বাষ্পীভূত জলকণায় অঙ্গ ভরেছি।

বালক—

সজল বাতাস ওগো সজল বাতাস,
কোথায় যেতেছ, তব কোথায় নিবাস?

বালিকা—

কোন্ কাজ আছে সেথা, এত যে ত্বরা।
কোথায় পেলে এ রূপ বেদনা-ভরা?

দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু—

দখিন-পশ্চিম হতে এসেছি ধেয়ে,
জলকণা গায়ে মেখে নেচেছি ধেয়ে।
উত্তর পূব পানে বহিয়া চলি
সজল কাজল মেঘে গড়িয়া তুলি।

বৃষ্টি—

সেই মেঘ হতে আমি ঝরি অবিরল,
ঝর ঝর জলধারে ধরা টল মল।

বালক—

কে তুমি ওগো নৃত্যপরা মেয়ে,
নাচে গানে মুখর হয়ে চলেছো কোথা ধেয়ে?

বালিকা—

তোমার পায়ে নূপুর রিনি ঝিনি,
হাতে শুভ্র শাঁখ,
তোমার কাঁকন বলছে ঝিলি মিলি,
লাগায় চোখে তাক।

বৃষ্টি—

বর্ষায় জলধারা নাম মোর বৃষ্টি,
ঝর ঝর ঝরি সদা শীতলিয়া সৃষ্টি।

নবনদী—

তোমার ঝম্ ঝম রবে শুনি
নূপুরের রিম ঝিম,
মেঘে মেঘে ঘুনাকাতে
শাঁখ বাজে ভিমিভিম।

কল—

তোমার ভিমি ভিমি ভিমি নাদে
বিদ্যুৎ ঝলকে
আকাশের বুক চিরে
চক্ষের পলকে।

শস্য—

তোমার সে আলোকে ঝলসায়
কাঁকনের স্বর্ণ,
কাল মেঘে মুছে যায়
দ্যুলোকের বর্ণ।

নবনদী, কল ও শস্য—

কল কল বহে জল
বারি করে টুপ টুপ,
বর্ষার গান শোন
কান পেতে নিশ্চুপ।

বৃষ্টি—

বর্ষার জল ধারা নাম মোর বৃষ্টি
দখিন-পশ্চিম বায়ু করে মোরে সৃষ্টি।

নবনদী—

শিব-সুন্দরে তুমি সঙ্গে আনো,
ওরো—খাল বিল নবনদী পূর্ণ।
শুষ্ক ধরনী বুকে জীবন ধারো,
ধন্য যে তুমি চির ধন্য।

কল ও শস্য—

তোমার প্রসাদে পাই নবীন দেহ
আষাঢ়ে হয়ে রসে পূর্ণ,
অমিয় ধারায় তব অপার স্নেহ,
ধন্য হে, তুমি চির ধন্য।

বালক বালিকা—

কল কল ছল ছল বহিয়া চলো,,
দুকূল প্লাবিনী ধারা কি নাম বলো।

নদনদী—

নদনদী বাংলায় আমরা ছুটি
সাগরের অভিমুখে সদাই ছুটি।
তুষার গলিত ধারা
আনন্দে আপনা হারা
নেচে নেচে গেয়ে যাই লহরী তুলি,
নাস্তি ক্ষতি শোক দুখ সকল ভুলি।

নদ—

আমি ফুলে দিয়ে যাই সরস ধারা,
সেই রসে ভূমিদেহে জাগিল সাড়া।

নদী—

চাষী ক্ষেতে ধান বোনে মনের সুখে,
আমার পরশে আশ জাগিল বুকে।

নদ—

ধুয়ে মুছে নিয়ে যাই রোগের রাশি,

নদী

পল্লীজনের মুখে ফোটাই হাসি।

নদনদী—

বাংলার নদী আমরা ছুটি,
সাগরের অভিমুখে সদাই ছুটি।

বালক বালিকা—

শস্য-শ্যামলা গাঁয়ে ক্ষেত্র ভরা
ফুলে ফুলে সারা, বল তোমরা কারা?

ধান—

আমরা সোনার বরণ ধান,
মোদের সবার বাড়া মান।
প্রধান খাদ্যশস্য মোরা সোনার বাংলা দেশে,
দিগদিগন্ত জোড়া ফলন আকাশ তলে মেশে।
সকল বাধা বিপদ নাশি বাড়াও মোদের আয়ু,
তাই তো তোমায় ভালবাসি ওগো জনক বায়ু।

পাট—

আমি পাট,
তন্তু জাতীয় কৃষি দ্রব্য,
মোর তরে বাংলার সীমাহীন গর্ব।
বিশ্বের কোন ঠাঁই
পাট নাই
উল্লেখ উপযোগী আন ত?
সুতরাং অবহেলা করো নাকো জানত।
বর্ষার তরা জলে পাই আমি পুষ্টি,
বাংলার ঐশ্বর্য, কৃষকের তুষ্টি।

চা—

আমরা চা এর পাতা,
মোদের ভেবো না কো ঘাস তা।
সারা সভ্য জগৎ মোদায় মোদের পানে বাঁধা।
মোদের আদর সকল ঠাঁই,
চা'র আদরে বনী গরীব বিভেদ কিছু নাই।

বালক—

চিনি চিনি তোমায় আমি
জানি তোমার মর্ম।
মহাচীনের আদিবাসী
নেশাই তোমার ধর্ম।
ধনবানের প্রাসাদে—
সকাল সাঁঝে অবাধে
অমছে আদর চা নিয়ে—

বালিকা—

জন্মদিন কি হোক বিয়ে!
পোসিলিনের কাপ পেয়ালায়
টুং টাং টাং উঠছে সুর।
চলছে সাথে মটন চপ,
খাচ্ছে সবাই গপাগপ,
গরীব ঘরে খুব বেশী তো
ভেল মুড়ি আর আখের গুড়।
তবুসে সব খাচ্ছি চা,
কদর নাই তার সঙ্গে যা।

বালক বালিকা—

তোমরা কে ভাই বলতরা ?

ফল—

বাংলা দেশের ফল মোরা।
শোন জল, শোন বায়ু, নহে শুধু সত্য,
আমরা সরস পেয়ে তোমাদের স্পর্শ।
তোমাদের সহায়তা যদি নাহি থাকতো,
উপোসে কাটাত দিন যত ফল তরুর।

আম—

সকল ফলের রাজা ওগো, ফলের রাজা আমি,
নামটি আমার আম।

কাঁঠাল—

বৃহদাকার সবার চেয়ে, নই যদিও দামী
কাঁঠাল আমার নাম।

জাম—

টুকটুকে নয়, টবটকে নয়, রংটি আমার কালো,
মিষ্টিস্বাদ নয় যদিও খেতে বড়ই ভালো।
ছেলে বুড়োর মন হরি
বিজয় গর্বে বাস করি,
বন্ধু গাছে যেদায় ফলি ছোট কালো জাম,
মৃদু হাওয়ার দোলায় দুলি করছি অবিরাম।

আনারস—

বর্ষার ফল আমি নাম আনারস,
অম্ল-মধুরে ভরা রসে টস্ টস।
স্বাদে গন্ধে অতুলন
বিমুগ্ধ সবার মন,
ভোগী ভোগী সকলের পুরে মনস্কাম।
আনারস টস্‌টস্ বাংলার নাম।

কলা—

শ্রেষ্ঠ ফলের পংক্তিতে
স্থান দিয়েছে পণ্ডিতে
আমরা কলা।
পাকা কিম্বা কাঁচাই হোক,
আছে জানে বিশ্ব লোক,
মিথ্যে ছলা।

কাঁচকলা কি রম্ভা বলে যতই কর অসম্মান,
হাস্যমুখে সহ্য করি অবোধ জনের স্নেহের বাণ।

বালক বালিকা—

ছি ছি ছি কথা শুনে লাজে যে মরি।
আমরা সকল ফলে আদর করি।
ফলে ও ফসলে ভরা গাঁয়ের বুকে
বসবাস করি মোরা পরম সুখে।
দখিন পশ্চিম বায়ু প্রণাম লহ,
বাংলার প্রাণবায়ু অঙ্গে বহ।

আশ্বিনের ঝড়—

আশ্বিনে ঝড় এল, আশ্বিনে ঝড়,
শন শন বন বন চড় বড় চড়।
ছুটে পালা সব সর,
গাই গরু তোল ঘর,
প্রাণপাখি থরথর
এল ঝড়, এল ঝড়।
আসে উত্তুরে বায়ু,
প্রবেশিতে পথ চায়,
ভাঙ ভালা খোল দোর,—
বর্ষায় হ'লো ভোর।
শন শন বন বন চড় বড় চড়,
আশ্বিনে ঝড় এল, আশ্বিনে ঝড়।

উত্তর পূর্ব বায়ু—

উত্তর পূব হতে এসেছি বয়ে
উত্তুরে বায়ু সবে কয়।
বর্ষা বিগত হিম আমার ভয়ে
নবনদী ক্ষীণ অতিশয়।

বালক—

চিনি চিনি তোমায়, তুমি শীতের আগে আস,
পাতা ঝরার খেলায় ধরায় জীর্ণহারে নাশো।

বালিকা—

তুমি ফলাও ফুলের ফসল
কচুরাজের বনে,
বর্ণে গন্ধে গানে ভরা
রইলে মোদের মনে।

সরিষা— সর্ষে আমি—
তিল— আমি যে তিল—
ধনিয়া— ধনে আমি,
ডাইল—চৈত্র ফসলের প্রধান মোরা নানাবিধ ডাল।
তামাক— তামাক আমি—
গাজর বীন— গাজর বীন—
আলু— আলু আমি,
কপি মূলো—
কপি-মূলোয় ভরি মোরা সারা শীতের কাল।
সকলে—
প্রধান ফসল নই যদিও, অল্প কিছু ফলি,
অনেক অভাব মিটাই তবু, প্রাণ খুলে তা বলি।
ব্যবসাদারের গোলায় মোদের ঠাঁই হয় না তাই
গ্রামবাসীদের বিচার সভায় কিছু কি দাম নাই?
বালক—
রাগ ক'রো না, রাগ ক'রো না চৈত্তি ফসল ভাই,
তোমা সবার নিবিড় পরশ মোর ভুবেলা পাই।
বালিকা—
পরম আত্মীয় বলে তোমাদের মানি,
ঘরে ঘরে গ্রামবাসী প্রীতি করে দান।
উত্তর পূর্ব বায়ু—
উত্তর পূব হতে আমরা আসি,
সজল শীতল বলে নিমেষে নাশি।
দুয়ারে সাজাই সিধি,
হিমকণা করে কিরি,
বাদলীরে দোলা দিয়ে মধুরে হাসি,
উত্তর পূব হতে আমরা আসি।
কাল বৈশাখী—
বৈশাখী ঝড় আমি বৈশাখী ঝড়,
শুষ্ক গুরু রবে কাঁপে ধরা থরোথর।
গাছ ভাঙে ধুলো ওড়ে,
ফুল ঝরে পাতা ঝরে,
পিঙ্গল রঙে ছায় গগন প্রান্তর।
বৈশাখী ঝড় আমি বৈশাখী ঝড়।
ঝরে ঘুঘুদের বাসা,
বাঁশ বনে বাজে বাঁশী
সোঁ সোঁ সোঁ কট কট শন শন শন।
উত্তর-পূব বায়
নিমেষে পলায়ে যায়
ফুল দাও ফেলে দিয়ে।
প্রলয় বিষাণ লয়ে
উন্মাদ বিশ্বের
বীজ বোনে ধ্বংসের
বৈশাখী ঝড় কাল বৈশাখী ঝড়।
শুষ্ক গুরু রবে কাঁপে ধরা থরোথর।
বালক বালিকা—
জল বায়ু ঘাস ফুল,
তোমাদের নাই ভুল।
বালক—
বাংলার প্রাণধারা
বাংলার সৃষ্টি,
তোমাদেরই দানে ভরা
তোমাদেরই সৃষ্টি।
বালিকা—
আমাদের দেহে মনে উৎসাহ অবসাদ,
যাহা কিছু সদসৎ তোমাদেরই পরসাদ।
বালক বালিকা—
তাই বলি তোমাদের আপনার আত্মীয়,
প্রাণ ভরা ভালবাসা খুশী মনে সবে নিয়ো।

———

নূতন শিক্ষায় কাতাই শিল্প

শ্রীগৌরী প্রসাদ ভট্টাচার্য

দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেব ঢাকাই মসলিন বস্ত্রে সজ্জিতা কন্যা জেবউন্নিসাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করতে রাজকুমারী সাতখানি সাতবার জড়িয়ে পরিধান করেছেন বলে উত্তর করেছিলেন। সেকালে বস্ত্র-শিল্পীরা বয়নশিল্পে কতদূর পারদর্শী ছিলেন উপরোক্ত ঘটনাটি তার উপযুক্ত প্রমাণ। ৬০ হাত দীর্ঘ মসলিন বস্ত্র যদি হস্তমুষ্টির মধ্যে রাখা হতো তাও কেউ জানতে পারত না। একটি বড় এলাচের মধ্যে চার পাঁচটি ধৌতা সহজে রক্ষিত করার কথাও শোনা যায়। আশ্চর্যের বিষয় যে, ১১৫ হাত মসলিন বস্ত্রের ওজন চার তোলারও কম হতো। সে কালের মসলিন বস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ওয়াটস্ লিখেছিলেন, 'With all our machines and wonderful invention we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca.' তিনি মসলিনকে 'হাওয়ার ইন্দ্রজাল' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রকৃত পক্ষে একদা ঐ শিল্পটি বাংলার গৌরবের সামগ্রী ছিল। বয়নশিল্প বাঙালীর সৃষ্টি, বাংলা দেশই এর জননী। সেদিনের কথা আজ আমাদের সুখস্বপ্নের মত মনে হয়। সেদিন বাংলার পল্লী বালকবালিকার আনন্দনিকেতন ছিল। বাংলার লক্ষ্মী দু হাত দিয়ে বাঙালীর ঘরে ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছিলেন। শক্তিদেবীও সেদিন বাঙালীকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দিতে কুণ্ঠিত হননি। উৎসবমুখর পল্লীর বুকে বাংলার নারীর সুমধুর সঙ্গীতের ছন্দের দোলায় শুনতে পাওয়া যেত তাঁতির ঘরে তাঁত চালাবার আওয়াজ। বিশ্ব আনত পৃথিবীর বুকে তার কারুকার্য ও গঠন ভঙ্গিমা। বাঙালী নাবিক বস্ত্রের বাণিজ্য পোত নিয়ে যেত চীন, তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, ইটালির বাজারে, প্রত্যাবর্তন করত বিজয়ীর বেশে। তখন না ছিল অন্নের অভাব না ছিল বস্ত্রের দারিদ্র্য।

যেদিন থেকে 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে' সেদিন থেকে ঐ শিল্পটিকে বণিক রাজা পঙ্গু করে দিলেন। বাংলায় কুটিরে কুটিরে দুঃখের আঁধার ঘনিয়ে এল। বাঙালীর জীবনে এল অসহনীয় বেদনা, বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল করুণ বিলাপ। শুষ্ক মলিন বাংলা-মায়ের চোখে ঝরে পড়ল অপমানের ও লাঞ্ছনার জল। তাঁদের কোল থেকে অকালে মাটির সঙ্গে কত শিশু মিলিয়ে গেল নশ্বর দেহে।

বঙ্গোপসাগর থেকে যে করুণ আর্তনাদ উঠেছিল তার ঢেউ গিয়ে আছড়ে পড়ল হিমালয়ের পাদদেশে। সেই বেদনার হুতাশন পান করেই মানব-দরদী মহাত্মা নিয়ে এলেন চরকা। রাজ-নৈতিক কারণে তিনি যতটা না চরকাকে গ্রহণ করেছিলেন, জাতির নিজস্ব চাহিদাই তার থেকে অধিক ছিল। রামরাজত্বের স্বপ্নের পূজারী বাপুজীর চোখের সামনে রামরাজত্বের চিত্র ভেসে উঠেছিল। তাঁর সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবার জন্য বর্তমান যুগের শিশুর হাতে চরকা তুলে দেবার কথা বললেন।

নূতন শিক্ষাপদ্ধতি শিশুকেন্দ্রিক। শিশুদের এতে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধা পরিপ্রেক্ষিত

হয়। মুখস্থ বিদ্যার বিরুদ্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা অনেক কথা বলেছেন। মন্টেন বলেছেন, 'পুরাতন সাহিত্য পাঠ করে আমরা পরের কথা আবৃত্তি করতে পারি, কিন্তু নিজের চিন্তাশক্তি থেকে কিছু কাজ করাই শিক্ষা।' এই জন্যই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। মন্টেনের সাথে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতের ঐক্য দেখা যায়। গান্ধীজি ঐ সূত্রের ছন্দে আর একটি বাণীর সুর যোজনা করলেন। তিনি অবশ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই বাগানের কাজ ও কাতাই শিল্পকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মূল শিল্প হিসাবে গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য করে এর পরিবর্তে অন্য কোন শিল্প গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেছেন। জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাই এই শিক্ষাকে 'জীবনকেন্দ্রিক' বলা হয়।

শিশুর সৃজনধর্মী মন যে কোন শিল্পকাজে তৃপ্তি লাভ করে। শিল্পকাজের মধ্যে শিশু পায় আনন্দের আস্বাদ। কাজেই শিল্পের উৎপাদনাত্মক মূল্য আছে। উৎপাদনাত্মক কাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন হয়। তা ছাড়া সমাজকে বাঁচাবার ও নিজে বাঁচবার দায়িত্ব শিশু বুঝতে শেখে। এই সব উৎপাদনাত্মক কাজ ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তার সঙ্গে সৃজনাত্মক কাজে আনন্দের সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করতেই হবে। কাজেই শিল্পে শিশু ঐ দুটির মিলনে শিক্ষার অগ্রগতির পথে বাধিত হয়। কারখানায় শ্রমিকেরা যে উৎপাদনাত্মক কাজ করে, তার সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উৎপাদনাত্মক কাজের প্রভেদ আছে। কারখানার শ্রমিকেরা কোন একটি কাজের বিশেষ অংশ তাদের সমগ্র জীবন ধরে করে চলে, ফলে সেই বিশেষ কাজটির প্রতি তাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। অপর পক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুরা শ্রমিক নয়, শিক্ষার্থী। তাই তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূর্ণ কাজটি করে, আর প্রস্তুত সামগ্রী দেখে আনন্দ লাভ করে। ঐ দিক দিয়ে বিচার করলে বিদ্যালয়ের শিশুরা কৌতূহল মিটিয়ে কাজ করার সুবিধা পায়। তাই শিক্ষার্থী সজীব, কিন্তু শ্রমিক মৃত। সুতরাং শিশুশক্তির অপচয় হচ্ছে বলে যারা বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে নিন্দাবাদ করেন, তাঁদের সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করা উচিত।

আমাদের দেশ দরিদ্র, কিন্তু এর নিরক্ষরতা শোচনীয়। এই অজ্ঞতা দূর করে জ্ঞানের আলোকে দশদিক উদ্ভাসিত করে দিতে হলে অর্থের প্রাচুর্যের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। কাজেই শিল্পে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার মধ্যে শিক্ষা পাবার যদি উপায় থাকে তবে তা গৃহীত হবে না কেন? তা ছাড়া এর ঐতিহাসিক দিকটাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। এই শিল্পটিকে বিদ্যালয়ে রাখার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে কেউ যদি বিকল্প সুন্দরতর ব্যবস্থা দিতে পারেন, তবে বুনিয়াদী শিক্ষাব্রতীরা তা ভেবে দেখতে পশ্চাৎপদ নন। শিল্পটির যন্ত্রপাতি যেমন সস্তা, তেমনি পৃথক পৃথক ভাবে সমস্ত শিশুর মধ্যে বণ্টনব্যবস্থার সুবিধাও যথেষ্ট আছে। শিশু এর মাধ্যমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেন্দ্রিকতার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার শিক্ষা লাভ করে। নিজের যন্ত্রপাতি সুশৃঙ্খলভাবে ও যত্নসহকারে রাখতে শিক্ষা পায় এবং তার ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ হয়। ঐ সব দিক বিচার করে কাজাই শিল্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া অসঙ্গত হয়নি। কাজাই শিল্প বলতে কার্পাস উৎপাদন থেকে বস্ত্র বয়ন পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বুঝায়। তা ছাড়া এই শিল্পটির মধ্য দিয়ে শিশু নানা সহায়ক শিল্পের সংস্পর্শে আসবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার মূলনীতিতে শুধু সেই শিল্পে পারদর্শী হয়ে জীবন যাপন করা যোক্তিক নয়। এর ভেতর দিয়ে অনুসৃত প্রণালীতে নানা জ্ঞান

আহরণ করে, শিল্পের বিভিন্ন অংশের তাৎপর্য ও কার্যকারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, কর্মকুশলতা ও সৃজনী শক্তি আয়ত্ত করে আপন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই এর মূলনীতি।

সমাজজীবনে সমাজের মঙ্গলকর যে কোন কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা বাল্যকাল থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই শিল্প সেইরূপ একটি কাজ। বর্তমান জগতে শ্রমিক শ্রেণী ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মিল নাই। গান্ধীজী কাতাইকে বিদ্যালয়ে স্থান দিয়ে ঐ দুই শ্রেণীর মিলনের চেষ্টা করেছেন। তাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের যোগাযোগ আছে। কর্মপ্রিয় শিশুর পক্ষে কাতাইকে আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য নয়। দেখা গেছে, এর ভেতর দিয়ে শিশু নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা পায়। কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ শক্তি, উৎসাহ ও কর্মানুরক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় শিশু যেমন স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ লাভ করে, তেমনি তার ধৈর্যশক্তি, দৃঢ়সঙ্কল্পবোধ ও সেলফকন্ট্রোলের স্ফুরণ হয়। তা ছাড়া এটি দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের সহায়কও বটে।

শিশু একদিকে যেমন কাজ করতে চায় তেমনি অন্যদিকে তার স্বতন্ত্রসত্তাও দেখা দেয়। তাকাপড়ার মধ্য দিয়ে সে সব জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে চায়। তুলোর চাষ, কার্পাস চয়ন, তুলাই, ধুনাই, সূতাকাটা ও বয়ন ইত্যাদি কাজের মধ্যে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কার্পাস যোগান, চাষ এসবের মধ্যে এক দিকে যেমন কৌতূহল ও পর্যবেক্ষণশক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়, তেমনি আবার আত্মপ্রকাশের পথে শিশুর শিল্পকাজ করার দ্বারা ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধন হতে দেখা যায়। সূতা কাটতে গিয়ে শিশু বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যেমন, তুলা কোথায় পাওয়া যায়? কি ভাবে তুলার চাষ হয়? কোন্ জমিতে কতটা পরিমাণ তুলা হতে পারে এই সব মাটির প্রকারভেদ জানতে হবে। ইতিহাসে তুলার জন্য কি কি সংগ্রাম হয়েছে? তুলা চাষের জন্য কিরূপ জলবায়ুর প্রয়োজনীয়তা আছে? কতখানি সূতোতে কতটুকু কাপড় হয়? তা ছাড়া সে বীজকোষ অঙ্কন করবে, যন্ত্রবয়ন, যৌথশিল্প, হস্তশিল্প আয়ত্ত করতে চেষ্টিত হবে। সে প্রতিদিন কতটুকু সূতা কাটলো, কি কি অসুবিধা ও সুবিধার সম্মুখীন হলো, এই সব ঘটনা বিশদভাবে আপন অভিজ্ঞতায় লিখবে। আমরা ঐ সব কাজের মধ্য দিয়ে অনুরূপ প্রণালীতে, ফুলোল, সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি। শিশু আপন চাহিদায় তা জেনে নেবে। শিক্ষক শুধু শিশুর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষক তাই নিষ্ক্রিয় এবং শিশু সক্রিয়। কাজের পরে শিশু তার জিনিস গুছিয়ে রাখবে, তার প্রস্তুত জিনিস অপরের সঙ্গে মিলিয়ে গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এর ভিতর দিয়ে তার কর্তব্যবোধ, শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ আসবে, ইন্দ্রিয়গুলির স্ফুরণ হবে এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হবে। তুলা ধোনন, ধুনাই, তুনাই, সূতো কাটা, বস্ত্রবয়ন এ সবের মাধ্যমে তার পরীক্ষা-চর্চারও সুযোগ ঘটে, তারপরে সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা দেখা যায় ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। সূতা কাটার মধ্যে ধৈর্য-শক্তি ও একাগ্রতার সৃষ্টি হয়। পরস্পর মিলে মিশে করার জন্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজজীবনে চলবার শিক্ষা হয়। সর্বদিকে বিচার করলে কাতাই শিল্পের যোগ্যতা শিক্ষাক্ষেত্রে অবিসম্বাদী।

এই সব কাজ শিশুর নিজের এবং জাতীয় জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারবে, এই বোধ তার মনে এনে দিতে হবে। কাজেই শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্তব্য। শিশু হয়

তো ভুল ভাবে কাজ করবে এবং অসুবিধায় পড়বে, শিক্ষক তখন তার ভুলকে সংশোধন করে দেবেন। প্রতিটি সংস্থানের নাম, কোনটির কি কাজ, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশুর কৌতূহল ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন কাজ শিক্ষা সামনে এগিয়ে দেওয়া উচিত। সে তার স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা কোন জিনিসের সঠিক রূপ দিতে প্রয়াসী হবে। তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠবে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিত কুমার মুখোপাধ্যায়

(৭)

বর্তমান জগত ও স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অবস্থা :

বিংশশতাব্দীতে প্রত্যেক দেশকেই শিক্ষার উন্নতি তথা শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট দেখা যায়। ব্রিটেনে যেরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ১৯০২ সাল হইতে স্বতন্ত্র বিদ্যালয়গুলিকে কতকটা আংশিক স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে Local Educational Authority অর্থাৎ স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ, ১৯১৮ সালের Fisher Act দ্বারা নিঃশুল্ক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকের পেন্সনের ব্যবস্থা, Haddow এবং Spense report দ্বারা বেসরকারী স্কুলগুলিকে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনে বাধ্য করা এই সকল প্রচেষ্টাই অন্তর্গত। ১৭৩৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের শতকরা ৬৬'৫ ছাত্রই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন স্কুলে পড়িত ও মাত্র ৩৬'৫ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বেসরকারী স্কুলে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন স্থির হয় যে ছাত্রদিগকে নিরাপদ এলাকায় রাখা হইবে, তখনই বোঝা গেল যে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে যে স্থানে যে ছাত্র গেল তাহার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব হইয়া পড়িল। কোথাও হয়তো অধিক সংখ্যক ভাষাশিক্ষক, কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত গণিত শিক্ষক গিয়া পৌঁছিলেন এই অচল অবস্থা দূর করিতে যুদ্ধের মধ্যেই Fleming Commission স্থির করেন, বিদ্যালয় ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন, ও তদনুসারে ১৯৪৪ সালে Butler Act দ্বারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল, ও বেসরকারী স্কুলেও সরকারী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইল। উচ্চ শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের জন্য University Grants Committee নিযুক্ত হইল।

গ্রেট ব্রিটেনে মাধ্যমিক শিক্ষা নিঃশুল্ক না হইলেও শুল্কের হার শিক্ষামাতার আয়ের উপর নির্ভর করে ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় শতকরা ৯০ জন কোন না কোন বৃত্তিধারী। উচ্চ শিক্ষা-ক্ষেত্রেও শতকরা ৭০ জন বৃত্তিভোগী। ১৫ বৎসর অবধি শিক্ষা আবশ্যিক ও নিঃশুল্ক। অতএব আমরা দেখিতেছি যে গ্রেটব্রিটেনে শিক্ষায় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক আনুকূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ বহুদিন হইতেই জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল স্থানীয় কমিটিগুলির হাতে ছিল। গত শতাব্দীর

শেষভাগ হইতেই ট্যাক্স আদায় দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হওয়াতে মাধ্যমিক শুর অবধি শিক্ষা নিঃশুল্ক ছিল। অবশ্য কোন সম্প্রদায় যদি নিজে খরচ করিয়া বিদ্যালয় চালাইতে চান, তবে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই, তথাপি বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা শতকরা ৬-এরও কম। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দুইটি ত্রুটি, প্রথম উচ্চ শিক্ষা নিঃশুল্ক নহে সরকারী নিয়ন্ত্রিতও নহে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণের অধিকার না থাকায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের নিয়মের সমতা নাই।

ধীরে ধীরে আমেরিকার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হইতেছে। বর্তমানে শতকরা ৭৫ ভাগ ছাত্র ছাত্রীর বয়স ও প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রাজ্যের পরিচালিত। গত মহাযুদ্ধের পর President Truman Commission যে রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা কার্যকরী হইলে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার শতকরা ৮০টি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে ও তথায় বর্তমান অপেক্ষা অনেক কম শুল্কে পড়ানো সম্ভব হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে শুধু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নহে, গণ্য শিল্পশিক্ষা ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করিতেছে। বর্তমানে একই স্কুলে নিগ্রো ও শ্বেতকায় বালকের পড়াইবার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টারই পরিচয়। বর্তমানে আমেরিকার নিগ্রুদের সংখ্যা শতকরা ২ জনেরও কম, শতকরা ৭০ জন কিশোর মাধ্যমিক শিক্ষা পাইতেছে।

১৯১৭ সালের পূর্বে রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা এরূপ ছিল যে সহজে তাহাতে লোকে ছেলে পড়াইতে পারিত না। বোলশেভিক গভর্ণমেণ্ট সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্রীয় শক্তির অধীন করিলেন। সহরে চলৎসহর ও গ্রামাঞ্চলে সাতবৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা হইল, ও ঐ সকল শিক্ষার স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অধীন হইল। উচ্চ শিক্ষা অন্য এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অধীন ও শিল্পশিক্ষা তৃতীয় এক মন্ত্রীর অধীন হইল। কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কিণ্ডারগার্টেনের উর্দ্ধে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার তখন নাই। মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয় বর্তমানে নিঃশুল্ক নহে। তবে Medonesky দেখাইয়াছেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ভারের শতকরা তিন ভাগ মাত্র শুল্ক হইতে নির্বাহ হয়। উচ্চ শিক্ষায়ও শুল্ক নামমাত্র। রাশিয়াতেও নিরক্ষরতা দ্রুত দূর হইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী।

দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলণ্ডে শ্বেতকায় অধিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এবং অন্যজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থা বেসরকারী এবং প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকারী মিশনের অধীন। কানাডায় এক মাত্র দুইবেক রাজ্য ভিন্ন অন্য সব রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। অবশ্য উচ্চশিক্ষা এখনও স্বতন্ত্র আছে।

আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট, টাঙ্গানিকা, বেলজিয়াম, কঙ্গো প্রভৃতি স্থানে শিক্ষার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ না থাকায় ঐগুলি অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে। ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন (আরব অংশ) সিরিয়া এবং ইরাকে শিক্ষাব্যবস্থাগুলি ক্রমশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিচালনাধীন হইতেছে। ডেনমার্কে প্রাথমিক শিক্ষা এখনও বেসরকারী সংস্থার অধীন থাকিলেও অন্য ক্ষেত্রে শিক্ষা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। নরওয়ে এবং সুইডেনে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রীসে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও ইটালী, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভেকিয়া এবং পোর্টুগালের শতকরা দশ ভাগের কম ছাত্র বেসরকারী স্কুলে পড়ে। তুর্ক, কলম্বিয়া মেক্সিকো এবং চীন ও জাপানেও বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ও তথাকার ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। জার্মানীতে বহুদিন হইতে শিক্ষা রাষ্ট্র-

নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নাৎসী আমলে এই নিয়ন্ত্রণের লোপ করা হয় ও শিক্ষাকে প্রচারের বাহন করা হয়। যুদ্ধের পর জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার লালফৌজের অংশে সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। অন্য অংশে অল্পেকটা আমেরিকান নীতির প্রচলন দেখা যাইতেছে। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের পর হইতেই শিক্ষা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াছে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর অধিকৃত অংশে জার্মানী এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করে। স্বদেশে শিক্ষা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া সত্ত্বেও, ফ্রান্সে সরকারী প্রতিষ্ঠানের স্থানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া দেশের একতা নষ্ট করা হিটলারের জার্মানীর একটা নীতি হইয়া পড়ে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ফ্রান্স ধীরে ধীরে এই সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিতেছে।

এই পটভূমিকার মধ্যে আমরা ভারতের শিক্ষানীতি আলোচনা করিতে পারি। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের একটা অংশ পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে। তথাকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ পাওয়া যায় না। উপরন্তু পূর্বের দেশীয় রাজ্য বর্তমানে 'বি' শ্রেণীর রাজ্য নামে পরিগণিত ও পূর্বের প্রদেশগুলি 'এ' শ্রেণীর রাজ্য। লোকসংখ্যার প্রায় তিন চতুর্থাংশ 'এ' শ্রেণীর রাজ্যে ও মাত্র এক চতুর্থাংশ 'বি' শ্রেণীর রাজ্যে বাস করে।

সমগ্র ভারতে ২৮টি বিশ্ব বিদ্যালয় ১৮টি গবেষণা মন্দির ও ৩৭৫টি ডিগ্রী কলেজ আছে। আমেরিকার প্রায় তিন ভাগ লোকসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষায়তনের সংখ্যা আমেরিকার এক-চতুর্থাংশ মাত্র। সমগ্র ভারতে ১৯৫১ সালে ২১০৭৫টি মাধ্যমিক ও ২১১৪৮১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সর্বসমেত ২৮৩৫৬০টি বিদ্যালয় একত্র করিলে প্রতি ১২০০ ছাত্রের জন্য একটি বিদ্যালয় পড়ে ও তাহার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র।

১৯৫১ সালে উচ্চ শিক্ষা ৩৯০০০০ ছাত্র (যাহার মধ্যে ২২১২৯৯ ইন্টার মিডিয়েট) পাইতেছিল। ৪৮৯৬০০ মাধ্যমিক ও ১,৮১,০৬,২০০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। সমগ্র ভারতের সর্ব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৩৩,১৮,৩৫১ ছিল, ইহা ব্যতীত প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ অনমুমোদিত বিদ্যালয়ে পঠিত। যাহা হউক, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে সাত ভাগেরও কম। দেশের বার আনা শিক্ষোপযোগী বয়স্ক বালকবালিকাকে পড়াইবার ব্যবস্থা সম্ভবই হয় নাই।

এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৩২৩০২৭৩০, ও বিভিন্ন রাজ্যগুলির সরকারী তহবিল হইতে ৬১,৮৯,১৯,৬৩১৲ ব্যয় হয়। শুল্কের খাতে ৩৬,১৩,০৪,০৫৯৲ আসে।

সমগ্র ব্যয়ের মধ্যে ৩৭১৯৭২০৩২৲ টাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়, যাহা আগে প্রায় নিঃশুল্ক ছিল। সরকারী সাহায্যের অধিকাংশ এই দিকে ব্যয়িত হইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ৩০৪১৫২৭১৯৲ প্রায় অর্ধেক শুল্কের দ্বারা নির্বাহিত হয়, তবে তাহার মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যয় সরকারী সাহায্যে চলে বলিয়া ও 'বি' শ্রেণীর রাজ্যে অধিকাংশ মাধ্যমিক শিক্ষালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায়, 'এ' শ্রেণীর রাজ্যে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে (যাহাতে দেশের অধিকাংশ ছাত্র, সমগ্র ভারতের অন্যূন শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্র—শিক্ষা পায়) সামান্য মাত্র সাহায্য পৌঁছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ৪,৮৫,৬৯,৬৮৮৲ ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ ছাত্রপ্রদত্ত শুল্ক হইতে নির্বাহ হয়, কলেজগুলির ৭২৫২৯৮১৭৲ ব্যয়েরও অধিকাংশ শুল্ক দ্বারাই মূলায়।

দেশে নানারূপ বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীতে ১২৭৯৭৬ জন ও নিম্ন শ্রেণীতে ১৭৪৯১ জন ছাত্রছাত্রী আছে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বাণিজ্য,

আইন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রেই এই সংখ্যার অর্ধাংশ, নিম্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে মর্ণালট্রেনিং অথবা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকশিক্ষণ সমগ্র সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ ও বাণিজ্য ২০ ভাগ।

উপযুক্ত বৃত্তিশিক্ষাযোজনার অভাব, পরিকল্পনা-বিহীন শিক্ষাব্যবস্থা, সরকারী সাহায্যের (বিশেষ, কেন্দ্রীয় সাহায্যের) স্বল্পতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অসংলোচিত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিল্পনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৎ কশ্চিদ্‌ভূর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৬২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

শ্রদ্ধায় স্মরণ

কবিতা ও গানের মধ্য দিয়া বিশ্বমানবের মন যিনি জয় করিয়াছিলেন, দেশের লোকের হৃদয়তন্ত্রীতে যিনি বারবার আনন্দ ও বেদনার অমোঘ আঘাত হানিয়াছিলেন, যাঁহার লেখা সঞ্জীবনী সুধার মত বাংলা দেশের মরা গাঙ্গে বাণ ডাকিয়া আনিয়াছিল, যাঁহার জন্মদিবস বলিয়া বাঙ্গালীর কাছে বৈশাখ মাসটি পুণ্য মাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, আজ শিক্ষার বৈশাখ সংখ্যায় আমরা সেই কবি ও মহামানব রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। মহৎ কথা শুনিলে পুণ্য, মহাজনকে স্মরণ করিলে পুণ্য।

আমরা মুখেই বলি, মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা, পথের দিশারী তাঁহারা তো দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই পথে আমরা চলি কি? শিক্ষার লক্ষ্য কি, কোন্ পথে চলিলে আমাদের শিক্ষার সংস্কার হইবে, শিক্ষার মুক্তি কিসে, এই সব দিকের কোনটাই কি তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টির আড়ালে ছিল? কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারার কতটুকু তাঁহার দেশবাসী গ্রহণ করিল? আজ তাঁহার জন্মদিবসের উৎসবে এই কথাটাই আমাদের ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তবেই না উৎসব পালন সার্থক হইবে। তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও নির্দেশের কিছুটাও যদি আমরা কর্মক্ষেত্রে পালন করিতাম, কার্যকালে বারবার পাঠ করিতাম তবে আমাদের পথ সুগম হইত। বারবার আবৃত্তি করিলে যেমন হৃদয়ের কথা যায়, বারবার পড়িলেও তেমনই উপলব্ধি সহজ হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের সম্মান

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া বর্তমানে ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনে যোগ দিবার জন্য দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাঁহার কাছে লোকে অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই সব আশা পূরণ করিবার অবকাশ পাইলেন না, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান আসিয়া পড়িল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কর্মীগণ নানা ভাবে তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা ডাঃ ঘোষের কর্মশক্তি ও নূতন নূতন

উন্নয়ের প্রশংসা করিয়া পরে বলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারও বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি এখন যেখানে যাইতেছেন সেখান হইতেও ইহার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁহার অনেক কিছু করিবার সম্ভাবনা রহিল। আশা করা যায় তিনি সেদিকে তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

উত্তরে ডাঃ ঘোষ বলেন, তিনি যে সব কাজ আরম্ভ করিয়াও শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না, সেগুলি নিশ্চয়ই নূতন উপাচার্য শেষ করিবেন, তাহাতেই তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টি করা, আর সেই কাজে অধ্যাপক ও ছাত্রকে একপ্রাণ হইতে হইবে। অধ্যাপকগণ যেন ছাত্রদের চিত্ত জয় করিতে পারেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় যেন উৎকৃষ্ট অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য সকলের কাছে গৌরব অর্জন করে।

ভাইসচ্যান্সেলারের পদে নিয়োগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভায় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের স্থানে নূতন ভাইসচ্যান্সেলারের পদের জন্য ডাঃ বিধিরঞ্জন মিত্র, অধ্যাপক শ্রীনির্মল সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু, এই তিন জনের নাম অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। যিনিই নির্বাচিত হউন, আমরা আশা করি এই গুরুত্বপূর্ণ পদের মর্যাদা তাঁহার হাতে রক্ষা হইবে।

এই তিন জনের মধ্যে একজনকে চ্যান্সেলার মনোনীত করিবেন। তাঁহার মনোনয়ন না হওয়া পর্যন্ত সেনেটের সদস্য, অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষকে কার্যকরী পরিচালনার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ অধ্যাপকপদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে সমাজবিজ্ঞান ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে একটি অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সিণ্ডিকেটের অনুরোধে অর্থকমিটি এই প্রস্তাবের আর্থিক দিক বিচার করিতেছেন। তার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার জীবিতকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা ভাবে অকাতর সেবা করিয়া গিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার এই ব্যবস্থা সকলেরই সমর্থন লাভ করিবে।

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের লোকান্তর গমন

বিগত ৪ঠা বৈশাখ ১৮ই এপ্রিল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ এলবার্ট আইনস্টাইন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মনস্বামধিক বিজ্ঞানাচার্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। আবার তাঁহার মনীষা শুধু বিজ্ঞানের সাধনায়ই ব্যাপৃত ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণব্রতে রত হন। জীবনের শেষ দিকে তিনি জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত ও নিজের সম্পত্তি ও নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্বাসনে আমেরিকায় গিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হন। পরমাণু বিজ্ঞান যখন মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত না হইয়া মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে চলিল তখন বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনের কণ্ঠেই সর্ব প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল। তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন। পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ হইলেও মানুষের আত্মার সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, প্রেম ও মানবতার দিকে তাঁহার অনুভূতি ছিল প্রবল। তাই অনেকে তাঁহাকে ঋষি আখ্যা দিয়াছেন। এই মহাপ্রাণ বিজ্ঞানবিদের মৃত্যুতে যে স্থানটি শূন্য হইল তাহা আর পূরণ হইবার নয়।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অবনতি এই সম্মেলনের অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল। শিক্ষা ব্যবস্থার নানা রকম ত্রুটির কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবাহুল্য ও স্থানের সঙ্কীর্ণতা ইহাদের এক প্রধান কারণ। ইহার প্রতিবিধান না করা হইলে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ ভালভাবে চলিতে পারে না। দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা হয়। এইরূপ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে বাস করা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক কোন দিকেই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়। ছাত্রদের গৃহের পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করিবার জন্য এই সম্মেলন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান। স্থানাভাব পূরণ প্রশ্নের সমাধান শুধু রাজ্যসরকারের হাতে নাই, কেন্দ্রীয় সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমরা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শুধু বলিতে চাই যে বর্তমান পরিস্থিতিতেও যতটা করা সম্ভব তাহাতে যেন তাঁহাদের ঔদাসীন্য না ঘটে।

রাণাঘাট উত্তর মণ্ডল প্রাথমিক শিক্ষা-সম্মেলন

বিগত ৭ই মে নদীয়া জেলার আড়ংঘাটায় রাণাঘাট উত্তর মণ্ডল অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধন করেন মূলবোর্ডের সভাপতি ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় সরকার যে দেশের শিক্ষাবিস্তার ও নিরক্ষরতা দূর করার দিকে মন দিয়াছেন নানা ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আগে নদীয়া জেলায় মাত্র দুই শত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এখন সেইখানে প্রায় বারো শত প্রাথমিক বিদ্যালয় বেশ ভালভাবে চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, এখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের কথার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ইঁহারাই জাতীর বুনিয়াদ গড়িতেছেন, কাজেই ইঁহাদের দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশি।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীকিশোরীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন শিক্ষার বিস্তার ও অভাব অসুবিধা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ তাঁহাদের কর্তব্য কতটা পালন করিতে পারিয়াছেন ও তাঁহাদের সম্বন্ধে যে-সকল সমস্যা উত্থিত হইয়াছে তাহারও আলোচনা হইলে উপকার পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন, জাতীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা বিস্মৃত হন নাই; তাঁহাদের দাবি দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহারা আর উদাসীন নন। এখন শিক্ষকদের শিক্ষকতাকার্যে অধিকতর মনোযোগ দিবার সময় আসিয়াছে। তিনি বলেন, কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য না হইয়াও দেশসেবার কাজ করা যায় এবং শিক্ষকদের পক্ষে ঐরূপ ভাবে কাজ করাই বাঞ্ছনীয়।

ডেনমার্ক প্রভৃতি কয়েকটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জীবনের শিক্ষা ও অক্ষর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। নাম সহি করিতে শিখার সঙ্গে জীবনের শিক্ষাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ সব দেশের নিকট হইতে আমরা কি কি গ্রহণ করিতে পারি তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। সব শেষে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা অনুসরণেই রচনা করিতে হইবে।

এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষকগণের ও বিশেষভাবে ৮০টি ছেলের অসামান্য পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের কথা উল্লেখ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বলেন, এজাতি একেবারে মরিয়া যায় নাই। এই সব ছেলেদের মধ্যে বাঙালী আবার বাঁচিবে।

নয়ী তালিমের কর্মীদের প্রতি

বিনোবা ভাবে

১

নয়ী তালিম এক বিশেষ চিন্তাধারা, এক পদ্ধতি, একটি ব্যবস্থা। সুব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা বুনিয়াদি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। তাহা লইয়া কিছু সমালোচনাও হইয়াছিল। যদিও প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনও চেষ্টা নাই, তাহাতে বিশেষ অনুরাগও নাই, তথাপি যখন সমস্ত দেশের শিক্ষা লইয়া প্রশ্ন ওঠে, তখন প্রয়োগ বা ব্যবহার কথা ভাবিতে হয়। এজন্য আমি ব্যবস্থার বিষয় কিছু ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। এখন আমি নয়ী তালিমের চিন্তাধারা ও পদ্ধতির বিষয়ে কিছু বলিব।

আশা দেবী সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের সঙ্গে পঁচিশ দিন ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ভূদানে কার্যে যোগ দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও দিবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এবিষয়ে আলোচনা করিতেন: একদিন তিনি বলিলেন, কর্মীদের জন্য সপ্তাহে আধ ঘণ্টা সময় রাখা উচিত, বুনিয়াদি শিক্ষার উপর আলোচনা করা যাইবে। কথাটা আমার ভালই লাগিল। তাহার ফলও ভাল হইল। ঐ সম্পর্কে নয়ী তালিমের বিষয়েও আলোচনা চলিল। আমার মনে হইল, কার্যত যাঁহারা নয়ী তালিম চালাইতেছেন তাঁহাদের সঙ্গে একবার কথাবার্তা বলি। সাধারণ ভাবে আমি কিছু কিছু সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিব। আমি দেখিতেছি যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের নিজের জায়গায় কাজে আটকাইয়া যায়, চারিপাশের লোকের মধ্যে পৌঁছায় না, ইহাতে তাহাদের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যে সব ত্রুটি আছে তাহার সংশোধন হওয়া চাই।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে যেখানে কাজ করে, সেখানে কর্মীদের ইহা অনুভব করা দরকার যে উহার আধার বলিতে কি বুঝায়, তাহাদের সেকথা ভাবিয়া দেখা উচিত এবং সেজন্য চেষ্টাও করা উচিত। এইভাবে যোগযুক্ত জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে একদল ছেলে কর্মী এক স্থানে থাকে, সেখানে কাজের পরিমাণ এত বেশি যে, অন্য কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না। কর্মীরা অলস তো নহেন, সর্বদা কর্মে ব্যস্ত; কিন্তু যে সমাজে তাঁহারা কাজ করিতেছেন তাহা অর্থ-নিরপেক্ষ সমাজ নহে। ঐ সমাজের আধার তো পয়সা। যদি আমরা ঐ আধার ভাঙিয়া ফেলি, তাহা হইলে মিথ্যা যোগের আচরণ হয় না। যে যোগের আধার পয়সার উপর আছে তাহার নাম দিয়াছি মিথ্যা যোগ। উহা ধ্যান-যোগ নয়, কর্মযোগ নয়, জ্ঞানযোগ নয়। আমরা যাহা করি সব ভাসা-ভাসা, হৃদয়কে স্পর্শ করে না, নাটকের মত, অভিনয়ের মত হয়। নাটক দেখিলেও তো মনের উপর প্রভাব পড়ে। এজন্য বাহির হইতে কোনও ভাই আসিয়া আমাদের কাজ দেখিলে তাঁহার উপর ইহার ভাল ফল হইতে পারে। কিন্তু উহাও নাটক মাত্র। যোগযুক্ত জীবনের যে প্রভাব তাহা উহাতে হয় না। স্বীকার করি, জীবনে নাটকের প্রয়োজন আছে। কেহ হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখিয়া আসিলে তাহার উপর উহার এতখানি প্রভাব পড়িতে পারে যে সে ইহার পর সত্যবাদী হইল। এই ভাবে প্রদর্শনী

প্রভৃতি হইতেও দুনিয়ার খানিকটা সেবা তো হয়, কিন্তু সমাজ পরিবর্তন করিবার যে কথা, মূল্য পরিবর্তন করিবার যে কথা তাহা ইহাতে হইবার নয়।

২

প্রথম কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যে সব প্রতিষ্ঠান গঠন করি, সেখানে বেশি সংখ্যায় যেন একত্র না হই। বেশি সংখ্যায় একত্র হইলে পয়সার আধার গ্রহণ না করিয়া পারা যায় না। চারিদিকের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না। কিন্তু একথা জানিবেন যে আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, পয়সার আশ্রয় না লইয়া দুইশত পরিবার যদি একত্র থাকে এবং অর্থ-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করিয়া দেখাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে লোকের লাভ হইবে। কিন্তু বৃহৎ সমাজ রাখিয়া উহাতে আটকাইয়া পড়িলে আমাদের কাজ নষ্ট হয়।

বড় প্রতিষ্ঠান রাখিলে অনেক কিছু করিতে হয়, আর এরূপ উত্তম ব্যবস্থার মধ্যে যখন আমরা শিক্ষকের শিক্ষা দিয়া মানুষ করি তখন শিক্ষার পর তাহারা যে সমাজে যায়, সেখানে উত্তম ব্যবস্থা থাকে না। সেদিন মন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী আমার দলে পদব্রজে পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন, নিজেদের মিলিটারির কথা আমাকে শুনাইতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সামরিক বিভাগের লোকেরাও আজকাল মোটরেই চলিতে চায়, পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া তাহারা বিপদ মনে করে। সামরিক বিভাগের যদি এই দশা, দেশের অবস্থা যে তবে কিরূপ তাহা অনুমান করুন। একথার তাৎপর্য এই যে, যদি আমরা সুব্যবস্থা করিয়া শিক্ষকের শিক্ষা দিই, আর এইরূপ সমাজেই পাঠাই যেখানে সেরকম সুযোগসুবিধা নাই, তাহা হইলে কি হইবে? এখন নয়ী তালিমের আয়োজন এরূপ হওয়া চাই যেমন রবিনসন ক্রুসোর ছিল। কাজের জন্য সুযোগ সুবিধা থাকিবে না, ছেলেদের সব রকম অসুবিধায় পড়িয়া তাহা হইতে রাস্তা তৈয়ার করিয়া আগে চলিতে হইবে।

৩

দ্বিতীয় কথা এই যে বর্তমানে সরকার নয়ী তালিমকে স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে আমাদের নয়ী তালিম চালাইতে হইবে। এখন যেখানে সরকার নয়ী তালিম চালাইবার কথা বলিতেছেন সেখানে সমস্ত দেশ জুড়িয়া উহা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশে নয়ী তালিমের কাজ করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের এক সুযোগেরও সৃষ্টি হইয়াছে, এক ভয়েরও। সুযোগ হইতেছে এই যে, আমাদের দৃষ্টান্ত যদি ভাল হয়, সকলের অনুকরণীয় হয়, তাহা হইলে ব্যাপক প্রচারে সাহায্যই হইবে। ভয় এই যে, আমরা যে কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা যদি সরকার পছন্দ করেন এবং চালান, তাহা হইলেও ক্ষতি হইবে, আর যদি আমরা যাহা প্রস্তুত করিয়াছি তাহা ছাড়িয়া নিজের খেয়াল খুসীমত নয়ী তালিমের জন্য কিছু ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেও ক্ষতি হইবে। এ অবস্থায় নয়ী তালিমের কর্মীদের এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে যে পদ্ধতির বিষয়ে নজর থাকে, তাহার দিকেও নিশ্চয়তা থাকে। বিচারে যদি সন্দেহ থাকে, তবে খুবই খারাপ হইবে, আর পদ্ধতিতে আস্থা না থাকিলে শিক্ষার যে ব্যাপকতা চাই তাহা থাকিবে না। সঙ্কোচের ভাব আসিয়া যাইবে। এজন্য আমরা স্বীকার করি যে নয়ী তালিমের খুব ভাল ভাল পরীক্ষা চলা উচিত। কেহ কেহ মনে করেন, আমি বুঝি চাই যে সমস্ত নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া লীন হয়, তেমনি সকলকে সব ছাড়িয়া ভূদান যজ্ঞে লীন হইতে হইবে। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা হয়তো ভুলিয়া যান যে, যে ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যৌবনে

রচনাত্মক কাজ করিয়াছে তাহার পক্ষে হঠাৎ বুড়া বয়সে প্রচারক বনিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সে এরূপ কথা প্রচার করিতেই পারে না, যাহা একদেশদর্শী, যাহাতে কোনও দিকে বেশি ঝুঁকিয়া পড়া হইয়াছে। এই জন্য আমি চাই না যে নয়ী তালিমের পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এখন সংকারের যে সব কাজ চলিতেছে তাহাকে তো আমি রানরীতিরূপ নাম দিয়াছি। আমি খুব গম্ভীর শব্দই প্রয়োগ করিয়াছি। কোনও কটুতা সৃষ্টি করিতে আমি চাই না, কিন্তু ইহা হইতে ভদ্র শব্দ কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। এজন্য আমি ঐ সব পরীক্ষার উল্লেখ বা প্রসঙ্গ করি না, কিন্তু আমরা যাহা প্রয়োগ বা পরীক্ষা করিয়াছি তাহার এদিক ওদিকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের কার্যপদ্ধতি ভাল। আমরা এরূপ মনে করি, কিন্তু ইহাকে আদর্শ কথা বলা যায় না। রাজকুমার কলেজ যেমন চলে, উহাও তেমনি চলে। উহাও আশেপাশের লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া চলে না। তবে রাজকুমার কলেজের মত আমাদের কাজ ভোগবিলাসী নয়। আমাদের ত্যাগময় জীবন। এজন্য এখানে উহার তুলনা লাগসই নহে। কিন্তু দুইটি এই জায়গায় সমান, যে আশেপাশের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না এজন্য প্রাণচাঞ্চল্য চাই, বিদ্যার দিক হইতে নানাপ্রকার পরীক্ষা হয়, ইহা চাই। এক বার আমরা বিশ মিনিটে করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলাম, আমরা একঘণ্টা স্কুল চালাইবার কথা বলিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কোনও পরীক্ষা ছিলনা, শুধু ছিল একটা চিন্তাধারা।

এখন বলা যাইতে পারে যে নয়ী তালিমে খরচ কিছু বেশি হয়, আর ঐ খরচের জন্য প্রায় কাজ বন্ধ করিতে হয়। আর বর্তমান সরকারের অবস্থা ব্যয়বহুল শিক্ষা চালাইবার মত নয়। যাহারা নয়ী তালিম চায় না তাহারা এই ভাবে যুক্তি করে। তাই যাহারা বলে যে নয়ী তালিম ছুমূল্য, তাহারা ভুল বলে। নয়ী তালিমের পয়সার প্রয়োজন নাই, পয়সা হইতে মুক্তি পাওয়াই প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত অনেক কাজ পূর্ণ হয় নাই, এজন্য এখন কিছু ব্যয় হইতেছে। আমি একটা লেখায় বলিয়াছিলাম যে গ্রামে তো কাজ চলিতেছে। কাজের উপরই গ্রাম চলিতেছে। আলস্যে গ্রাম চলিতেই পারে না, প্রত্যেকের কিছু না কিছু করিতেই হয়। ঘরে ঘরে ভোজন চলে, উৎপাদন চলে। গ্রামের জীবন আছে, গ্রামের বাহির হইতে কোনও বিশেষ সাহায্য পৌঁছানো যায় না, সুতরাং সেখানকার জীবন নিজেদের চেষ্টার উপরেই চলে। সেখানে লোকে রোগাক্রান্ত হয় এবং বাহির হইতে কোনও সাহায্য পায় না, সেখানে নিজেদের চেষ্টা স্থির চলিবে কি করিয়া? এজন্য যদি আমরা এমন ক্ষেত্রে যাই যেখানে বাহির হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না, তাহা হইলে নয়ী তালিমের পক্ষে তাহা উত্তম ক্ষেত্র। সেখানকার জীবন কৃত্রিম বা পরাশ্রিত নয়। কৃত্রিম শব্দটি এখানে বুঝিয়া সুঝিয়াই প্রয়োগ করিয়াছি। তাই যেখানে কম কৃত্রিমতা, সেখানে তো নয়ী তালিম চলিতেছেই। মনে করুন, সরকার শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা করিলেন না; তাহা হইলে কি হিন্দুস্থানের লোকেরা অশিক্ষিতই থাকিয়া যাইবে? তাহারা তো শিক্ষিত আছেই। লিখিতে পড়িতে পারা সামান্য কথা। যাহারা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে, তাহারা তো শিক্ষা পাইয়াই আসিতেছে। পরমেশ্বরই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি পেটে দিয়াছেন ক্ষুধা, মাথায় দিয়াছেন বুদ্ধি। যেখানে এই দুইটি বস্তু রাখিয়া দিয়াছেন, সেখানে শিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন তো আছেই। পেটে ক্ষুধা আছে বলিয়া কাজ করিতে হয়, বুদ্ধি আছে বলিয়া যুক্তি দেখা দেয়। তাই আমাদের যে শিক্ষার অহংকার তাহা

ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমরা না শিখাইলে লোকে অশিক্ষিত থাকিবে না। তবে নয়ী তালিমের মাধ্যমে শিক্ষার কিছুটা সংস্কার করার চেষ্টায় সাহায্য করা আমাদের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক চিকিৎসার অনুকূল যাঁহারা তাঁহারা বলেন যে রোগ যে আসে, তাহা আমাদিগকে আরোগ্যের পথে লইয়া যাইবার জন্য একটা প্রক্রিয়া। আমরা উহাকে সামান্য একটু সাহায্য করি মাত্র। নয়ী তালিমে এরূপ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এখন গ্রামে গ্রামে বালক-বালিকারা মাস্টার পিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইতেছে। শিক্ষা না পাইলে পেটের ভাত জুটিবে কি করিয়া? গ্রামে গ্রামে লোকে অসুস্থ হইয়া পড়ে। রোগ আসিয়া আক্রমণ করিলেও নিশ্চিন্ত থাকে। মৃত্যু হইলে সৎকার করে। এ সব তো চলিতেছেই। এজন্য শিক্ষা তো তাহাদের হইয়াই যাইতেছে। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা তাহাদিগকে অল্প একটু সাহায্য দিয়া থাকি, যাহাতে পূর্ণতা আসিয়া যায়। আজ কিছুটা অপূর্ণতা আছে। এই দৃষ্টি লইয়া আমরা কোনও ক্ষেত্রে কাজ করিলে ভাল হইত।

এখন আমি একটা কথা বলিয়া ফেলি। হিন্দুস্থানে এত ভাল ভাল ভাষা আছে, যাহা কিনা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আর যাহার মধ্যে সংস্কৃতও আছে। আরও আছে এমন সব ভাষা যাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ ভারতীয় ভাষায় "টীচ্" করা ধাতু নাই। আমাদের ধাতু দেখা এবং তাহার প্রেরণার্থক দেখানো। আমাদের ভাষাশাস্ত্রের নির্দেশ বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইংরেজিতে "পার্ণ" ও "টীচ" দুই স্বতন্ত্র ধাতু। ইহা হইতে বলিতে চাই "টীচ" হইল এক স্বতন্ত্র ক্রিয়া। কিন্তু আমাদের ভাষায় এরূপ স্বতন্ত্র ধাতু নাই। এখন দেখিতে হইবে, সংস্কৃতের মত সমৃদ্ধ ভাষাতেও 'টীচ্' এর মত কোনও শব্দ নাই। ইহার কারণ কি? কোনও বিশেষ মানসিক কারণেই এরূপ শব্দের অভাব ঘটিয়া থাকিবে। স্বীকার করি, এরূপ শব্দের অভাব খুবই চিন্তা করিয়া দেখার কথা। মহত্বপূর্ণ চিন্তাধারার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই চিন্তাধারা হইল এই যে, শিক্ষা তো লোক পাইতেছেই। আমরা শুধু সামান্য কিছু শিক্ষা দিতে পারি মাত্র। আমরা "টীচ্" করিতে পারি না। শিখাইতে পারি, তাই নয়ী তালিমের প্রসঙ্গে যে খরচের কথা ওঠে তাহা একেবারেই নিরর্থক। গ্রামে গ্রামে উদ্যোগ বা কর্ম চলিতেছেই। আমরা সেখানে পৌঁছিলে দেখিব যে শিক্ষকও কর্ম করিতেছেন, বালক বালিকাদেরও তাহা শিখাইতেছেন। সেখানে তো গ্রামোদ্যোগ চলিতেছেই। তাহার মাধ্যমেই আমরা শিখাইব। গ্রামের লোক অসুস্থ হইলে রোগও শিক্ষার এক সাধন হইয়া দাঁড়ায়। আমরা শিক্ষাপ্রাপ্তারা তো এমনি শুষ্কতর লোক যে সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ, জন্ম-মৃত্যু, রোগ, দরদস্তুই শিক্ষার সাধন বা উপকরণ বলিয়া ধরিয়া লই। ধর, যাক, গ্রামে ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব হইল, ইহাতো নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয় নহে। কিন্তু শিক্ষকের পক্ষে ইহাও আনন্দের বিষয়, কারণ শিক্ষাদানের ইহা এক সাধন বা উপকরণ। ওলাওঠা হইল কেন? আসিল কেন? উহা বন্ধ করিবার জন্য কি কি করিতে হইবে? এসব শেখানো যাইতে পারে। আমার পেটব্যথা করিতেছে; আমার মনে সুখ, কেন ব্যথা করে জানিতে পারিব এবং প্রতিকারের সুযোগ পাইব। কেন পেট ব্যথা করে, ইহা জানিবার চেষ্টাই তো জ্ঞানের সাধনা। এজন্য পেট ব্যথাও গুরুর মূর্তিতে দেখা দেয়, ইহা আমাকে জ্ঞান দিতে আসিয়াছে। আমাদের দুঃখ তো ইহাই যে কখনও কখনও গুরু আসেন, কিন্তু জ্ঞান না দিয়াই চলিয়া যান। গুরু আসিলেন, আর জ্ঞান দিয়া ফিরিয়া গেলেন, তাহাতে দুঃখের কিছু নাই। পেট ব্যথা করিতে

থাকিলেও একটা আনন্দ, একটা কিছু জ্ঞান পাওয়া যায়। তাই গ্রামে নয়ী তালিমের আধার সর্বত্র। তবে পয়সা কেন খরচ করিতে হইবে? যাহা চলিতেছে তাহাতে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন জ্ঞান না দেয়, যদি সমন্বিত জ্ঞান দেয়, তাহা হইলে আমাদের কাজ ফুরাইল। আর কি করিতে হইবে? যদি চরখা চলে তাহা হইলে উহার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু যদি না চলে তবে ছেলে-মেয়েদের কেন বাধ্য করিতে হইবে? যে চরখা যাহা চলে না, সমাজ চায় না, সরকার চায় না, তাহার ভার ছেলেমেয়েদের উপর চাপাইতে হইবে, আর সেই চরখাকে করিতে হইবে শিক্ষার উপকরণ? আমি যদি কোনও গ্রামে যাই তাহা হইলে আমার এক কানা কড়িরও প্রয়োজন হইবে না। আমি লোকদের বলিব, আমার কাছে আছে জ্ঞান, আর আপনাদের কাছে আছে অজ্ঞান। যেখানে এই দুইটি জিনিসই আছে সেখানে তো সব হইয়া গেল। আপনাদের নিকটে অজ্ঞান না থাকিলেও কোন কথা উঠিত না, আমার নিকটে জ্ঞান না থাকিলেও কোন কথা উঠিত না। তাই আপনাদের অজ্ঞান ও আমার জ্ঞান থাকিলে ব্যবস্থা হইবে। গ্রামের লোকেরা প্রতি অবস্থাতেই কিছু না কিছু কাজ করে। আমাকেও কিছু না কিছু খাইতে হইবে। আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে থাকিব। তাহারা যদি চাষ বাস করে আমিও সঙ্গে সঙ্গে করিব। তাহারা যদি রান্না করে আমিও সঙ্গে সঙ্গে রান্না করিব। তাহারা যদি ঝাঁট পাট দেয় তো আমিও তাহা দিব। তাহারা যদি গোরুর সেবা করে তো আমিও গোসেবা করিব। এরূপ শিক্ষক গ্রামে গেলে সে গ্রামের সকল কাজ অবলম্বন করিয়া সমস্ত কিছু শিখাইবে। আমি গো-রক্ষাও করিব, সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদ্‌ও শিখাইব। আমার সমস্ত শিক্ষা শ্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত থাকিবে। তখন নয়ী তালিমের পুস্তক পাইলেও ক্ষতি নাই, না পাইলেও ক্ষতি নাই। যাহাদের পুস্তক না হইলে চলে না, তাহাদের খরচ হইবে বেশি। চরখা, পুস্তক, যদি পাই তো তাহাদের কাজে লাগাইব। না পাই, ওসব ছাড়াই চলিবে। ঐ সবের জন্য খরচ করিতেই হইবে, এমন কথা কেন ওঠে? আজ যে শিক্ষারীতি চলিতেছে তাহাতে ব্ল্যাক বোর্ড চাই, চা খড়ি চাই, বই চাই। নয়ী তালিমে কিন্তু এসব কিছুই চাই না। ভগবান কান দিয়াছেন, শুনিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহাই কাজে লাগাইব। ভগবান যখন কান দিয়াছেন, বসিবার জায়গা দিয়াছেন, তখন আর কি চাই? নয়ী তালিমে পয়সার প্রশ্ন নাই, ব্যবস্থার প্রশ্ন। শুধু চাই শিক্ষক, যিনি গ্রামের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। অর্থ ব্যয়ের কথা তো ইহাতে মোটেই আসিতে পারে না। আজ যদি সে কথা উঠিয়া থাকে তবে নয়ী তালিমের পথে যাহারা চলে তাহাদিগকে অর্থ হইতে কি করিয়া নয়ী তালিমকে মুক্ত করা যায় তাহাই ভাবিতে হইবে। শিক্ষকের জীবন যেন পয়সার উপর নির্ভর না করে। শিক্ষক অন্য সকলের সঙ্গে কাজ করিবেন আর সারা বৎসর যাঁরে যে ফসল জন্মিবে তাহার এক ভাগ শিক্ষকও পাইবেন। পূর্বে ইহাই ছিল ব্যবস্থা। যদি সরকার ইহার উপর কিছু সাহায্য দিতে চাহেন তো দিবেন, পুস্তকাদিরূপে প্রয়োগশালা রূপে। কিন্তু ইহা না হইলে কাজ যে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা নয়। একথা নয়ী তালিমের সঙ্গে অত্যাবশ্যক।

এখন আর একটি কথা বলিব। সরকার স্থির করিয়াছেন, দশ বৎসরের মধ্যে বেসিক শিক্ষা চালাইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া দেখিবার কথা। অর্থাৎ কংগ্রেস বলিলেই সরকারের বলা হইল। তাহা হইলে সেই শিক্ষা প্রণালী চালু হইবে। সেজন্য উদ্যোগের আয়োজন ইত্যাদি যে এপ্রকার তন্ত্র আছে তাহাই যথেষ্ট, না সেজন্য কিছু মন্ত্রও

চাই? যদি উহা মন্ত্র না হয়, শুধু বাইরের জন্যই হয়, তবে শুধু তন্ত্রে কি হইবে? মন্ত্র এই যে নয়ী তালিম শরীরশ্রমে নিষ্ঠা রাখে, উহা সাম্যযোগী। নয়ী তালিমে একথা চলিবে না যে শিক্ষকদের যোগ্যতানুসারে প্রভেদ আছে, সুতরাং টাকাতেও পার্থক্য রাখিতে হইবে—কাহারও চল্লিশ টাকা, কাহারও আশী টাকা, কাহারও বা একশত টাকা। এই যে সমস্ত গ্রেড প্রস্তুত হইতেছে, শিক্ষণ বিভাগে এইরূপ শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা হইতেছে, ইহাতে শিক্ষও তো গুরুর শ্রেণী লইয়া বিচার বিতর্ক জুড়িয়া দিবে! নয়ী তালিমে গ্রেড চলিবে? ইহাতে তো গুরু শিষ্যের সম্বন্ধই ভাঙিয়া পড়ে। জীবনের মৌলিক বিচার বা চিন্তাধারা নষ্ট হইয়া যায়। তাই নয়ীতালিমের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল শিক্ষক যেন সমান বেতন পান। আমি টাকা বাঁচাইবার কথা বলিতেছি না। হইতে পারে, সকলকে সমান বেতন দিতে গিয়া বেশি ব্যয় হয়। আমি এবিষয়ে আর্থিক কোনও কৌশলের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি সাম্যযোগ যোজনার কথা। তা না হইলে নয়ী তালিম অগ্রগতি লাভ করিবে না। নয়ী তালিমে আমরা শরীরশ্রম ও বুদ্ধির কার্যের মূল্যে কোনও ইতর-বিশেষ স্বীকার করি না। আমরা স্বীকার করি, নেতৃত্বের মধ্যেও বেতনের অন্তর থাকা উচিত নয়। এখন রাষ্ট্রপতিকে এত বেশি টাকা দিতে হয়, সেজন্য বলা হয়, উহার পিছনে কারণ আছে। কিন্তু আমরা স্বীকার করি, দেশের যে নেতৃত্ব, সেখানে বেতনের প্রভেদ থাকা উচিত নহে। আমি এখানে চাকুরের কথা বলিতেছি না। চাকুরের টাকার যে ভেদ আছে তাহা আস্তে আস্তে কমিয়া যাইবে। চাকুরি ও নেতৃত্ব এক শ্রেণীর নয়। কিন্তু শিক্ষকতা ও নেতৃত্ব এক শ্রেণীর। তাই নয়ীতালিম যদি আরম্ভ করিতে হয় তবে দুই জায়গায় সাম্যযোগ স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষক ও মিনিস্টার প্রভৃতি যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের সকলের বেতনে সাম্য হওয়া চাই। না হইলে বিদ্যার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হইবে কেমন করিয়া? তাহার জন্য প্রয়োজন হইল এই যে শিক্ষা বিভাগে সমান বেতন হউক, আর নেতৃত্বে সমান বেতন হউক। এখানে বেতন শব্দ প্রয়োগ করাও ঠিক হইল না। কথাটা হওয়া উচিত 'দক্ষিণা' আর উহা দেওয়া উচিত প্রেমের সঙ্গে, আদরের সঙ্গে। শিক্ষকের শরীরের জন্য যত টাকা চাই তত টাকাই দিতে হবে। ইহা না হইলে নয়ী তালিমের আরম্ভই হয় না। তাহার পর সমাজের কাঠামো বদলাইবার কাজ ধীরে ধীরে হইতে থাকিবে। উহা তো কাজ করিবার একটি ক্রম। কিন্তু উহাতে দশ বৎসরও লাগিতে পারে, দুই বৎসরও লাগিতে পারে। ঐ পর্যন্ত আমাদের প্রস্তুতি, অবশ্য বিশেষে উহা আরও দ্রুত গতিতে হইতে পারে। কিন্তু এই দুই জায়গায়, দেশের নেতৃত্ব যেখানে, সেখানে আর্থিক সাম্যও হওয়া চাই—অন্তত এইটুকু আমাদের করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। আমাদের সংকল্পে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

৪

এখন আমি তৃতীয় কথাটি বলিব—যাহার সঙ্গে শিক্ষণের সম্বন্ধ আছে। আমাদের নৈতিক মূল্যের কিছু পরিবর্তন করিতে হইবে। কিছু কিছু মূল্যের পরিবর্তন তো বিশেষ আবশ্যক, সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। শরীরশ্রমের মূল্যকে মান্য করিতে হইবে। একথা সকলে জানেন। কিন্তু এক বিশেষ ভ্রান্ত মূল্য আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, যাহা মৌলিক, যাহার পরিবর্তন হইলে সমস্ত নীতিশাস্ত্র একেবারেই বদল হইয়া যাইবে, সমস্ত অর্থশাস্ত্রও বদল হইয়া যাইবে। সে বিচার হইল এই যে, সমাজে যদি সমস্ত গুণের মধ্যে সব

চেয়ে অধিক দুষ্কর্ম কিছু থাকে তাহা হইলে উহা হইল অসত্য। অন্য সমস্ত দুষ্কর্ম তো দোষ অর্থাৎ ব্যাধি। অসত্যই একমাত্র দুষ্কর্ম। এই মত দৃঢ় করিতে হইবে। কাহারও পেটে ব্যথা হইলে উহা খুলিয়া বলায় লজ্জা নাই। কেহ ব্যভিচার করিলে তাহা বলায় লজ্জা বোধ হয়। পেটের ব্যথা যেমন একটা রোগ, তেমনি উহাও একটা রোগ। আমাদের দেশে মহাপাতকের মধ্যে সোনা চুরি এক মহাপাতক। বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে সঞ্চিত সোনার উপর আঘাত করিলে যে সমস্ত জীবনের উপার্জনকে ভাঙিয়া ফেলা হয়। এইরূপে মদ্যপানকেও মহাপাতক গণ্য করা হয়। ব্রাহ্মণ হত্যাও। আমরা বলি, মদ্যপান বা ব্রহ্মহত্যা অতখানি পাপ নয় যতখানি পাপ অসত্য। ব্রহ্মহত্যা আদি সমস্তই দোষ, তাহা তো নয়, কিন্তু সে সমস্ত গোপন করার প্রবৃত্তি মানুষের এমন হয় যে অসত্য অপেক্ষা ইহাদের আরও হেয় বলিয়া মানুষ মনে করে। আমরা বিস্তর দোষ লুকাইয়া রাখি। যতদিন ইহা চলিতে থাকিবে ততদিন আমাদের ছেলেমেয়েরা সঙ্গসঙ্গ পাইয়াও কাপুরুষ হইয়া যাইতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, সজ্জন সঙ্গ পাইয়াও লোক এমন হইতে পারে। আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন বাপুজী বলিলেন, আমাকে উপবাস করিতে হইবে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা। আমি এমনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উপবাসের কারণ কি? তিনি বলিলেন, আমার মধ্যে সত্য নাই। আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি তাহা কি করিয়া বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, আমার আসে পাশে যদি কোন ভুল চুক হয় আর তাহা যদি আমার নিকট পরিষ্কার না হয় তাহা হইলে বলিব, আমার মধ্যে পূরা সত্য থাকিলে তাহারা আমার নিকট নিজেদের কথা খুলিয়া বলিত। একথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাহারা নিজেদের বন্ধু বান্ধবের কাছে তো বলিয়া থাকিবে, তাহা হইতে কি বুঝিতে হইবে যে তাহাদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বেশি সত্য আছে? আপনি ইচ্ছা করিলে একথা বলিতে পারেন যে আমার মধ্যে প্রেমের অভাব আছে, তাই আমি উহাদের বিশ্বাসভাজন নই, কিন্তু একথা যদি বলেন যে আমার মধ্যে সত্যের অভাব আছে তবে সে কথা স্বীকার করা কঠিন। একথা লইয়া বিস্তর আলোচনা হইল, তাহার এখানে উল্লেখ করিব না। কিন্তু লোকে আমার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে, আমিও লোকেদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখি, এসব প্রক্রিয়া সজ্ঞানে সম্মতিতেও চলিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে অন্য দোষ যতখানি ঘৃণা করি অসত্যকে তেমন ঘৃণা করি না। এই মূল্য পরিবর্তন চাই। দুনিয়াতে অসত্যের মত ঘৃণার বস্তু আর কিছুই নাই। যদি কখন কেহ অতিভোজনের ফল মারাই পড়িল, এই কঠোর পরিণাম সত্ত্বেও তাহার প্রতি ঘৃণা হয় না, দয়াই হয়। আমরা মুখে বলি বটে যে লোকটা এত বেশি না খাইলে বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু তবু আমাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয় না। যাহা নৈতিক দোষ বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা বোঝা উচিত। এসমস্ত দোষ ঘৃণার্হ নহে, দয়ার্হ। দয়ার্হ বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ সংশোধনের বিস্তর সুযোগ পাওয়া যাইবে, দোষ আর বাড়িতে পাইবে না। মানুষের আর কোনও রোগ হইলে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু মহারোগ হইলে তাহা প্রকাশ করে না, তাহা লুকাইয়া রাখে। যদি না লুকাইয়া প্রথম হইতেই প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে কিছু চিকিৎসা করিলে রোগ দূর হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু লুকাইয়া রাখে বলিয়া পরে আর কিছু করা যায় না। এইজন্য লুকাইয়া রাখে যে সমাজ উহা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ অন্যান্য নৈতিক অবস্থতি অপেক্ষা এই মহারোগও যেন ঘৃণ্য বলিয়া মনে

করে। উহা লুকাইয়া রাখিলে সমস্ত নীতির প্রতি শ্রদ্ধাই চলিয়া যায়, সংশোধনের কোনও চেষ্টাই আর থাকে না। নৈতিকতা আর মাথা তুলিতে পারে না। লুকাইবার প্রবৃত্তি কি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়? আর কেন তাহা পরিতৃপ্ত হয় না? এই জন্য বেটেনা যে, আমার ভুল মূল্য স্বীকার করিয়া লইয়াছি।

এখানে এমন এক চিন্তাধারা আছে যাহার ফল রাজনীতি ক্ষেত্রেও হইবে। রাজনীতিতে মেজরিটি মাইনরিটি অর্থাৎ বহুমত অল্পমত লইয়া যে বিতণ্ডা চলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। উহা লইয়াই সমস্ত ভুবনে দলাদলি হইয়াছে, ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বীকার করিয়া লইতেছি যে রাজ্য পরিচালনের জন্য বহু সংখ্যার পক্ষ চাই, আর অল্প সংখ্যা লইয়া বিরোধী পক্ষও চাই। এই যে সমস্ত কল্পনার জাল বুনিয়াছি, উহা হইতেই সমস্ত নির্বাচন প্রবৃত্তির মূলে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। সারা দেশে যাহা চলিতেছে তাহা তো ছেলেখেলা। সকলেই স্বীকার করে, একজনের বুদ্ধি অন্যজনের বুদ্ধির মত নয়। বুদ্ধির কমবেশি আছে, তবু দেশময় নির্বাচনের খেলা চলিতেছে। কাজকর্ম চালাইবার সময় মাথা গণতি করা হয় এ জিনিসটা মিটাইয়া ফেলা উচিত। না হইলে দুনিয়ার ঝগড়া মিটিবে না। আর তাহার আরম্ভ শিক্ষা হইতেই হওয়া উচিত। আমাদের যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের বলা হইয়াছে যে একজনের মত লইয়া কাজ চালাও; কিন্তু আজকার অবস্থায় আর আজকার মনের গতি অনুসারে উহা যেন কঠিন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেক ভাবিতে হইবে। আমরা এদিকটা মোটেই চিন্তা করি নাই। ভাগবতের কথা যখন হয়, তখন চোখ বুজিয়া স্বীকার করা হয়। এ তো তেমন নয়, এখানে ভাবিতেই হইবে। আমরা চাই যে সকলে খুব ভাবুক, চিন্তা করুক, কিন্তু নির্ণয় করিবার সময় একমত অনুসারেই নির্ণয় করুক। এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই।

অসত্যকেই প্রধান দোষ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। অন্য সব দোষ গৌণ বলিয়া ধরিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা আছে। অনেক দিন হইতে কথাটা আমার মনে লাগিয়া আছে, একদফা আমি উহার উল্লেখও করিয়াছি। শিক্ষার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আছে। এইজন্য আমি বলি যে আমরা যেন অনিন্দা ব্রত গ্রহণ করি। অহিংসাতে অনিন্দার ব্রত গ্রহণ করিবার কথা আসে। কিন্তু অহিংসা বলাই যথেষ্ট নয়, উহার জন্য স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাহারা কর্মী তাঁহাদের নিকট এই কথাটা কিছু কঠিন মনে হইবে। তবু আমাদের এই ব্রত লওয়া চাই। আমাদের ইহা খুব প্রয়োজন আছে। ইহা না হইলে আমাদের কর্মীরা এবিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। আজকাল দেখিতেছি, বৃথা নিন্দা খুব চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে মিথ্যা অপবাদ, মন কষাকষিও বাড়িতেছে। সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া এই সব হইতেছে, ইহা হাস্যাস্পদ। এজন্য আমাদের স্বতন্ত্র বৃত্তি লইতে হইবে। প্রত্যেকের মধ্যে দোষ তো আছে। কাহারও অসাক্ষাতে কিছু বলিলে তাহার গুণই বলিতে হয়। অন্যথা আমাদের মৌন তো আছেই। ভগবানের গুণগান করিবার জন্য আমাদের বাণী দেওয়া হইয়াছে। গুণ যাহা, তাহা আত্মার, দোষ যাহা তাহা শরীরের: এজন্য আমরা যেন দোষের কথা উচ্চারণ না করি, গুণের কথাই বলি। দোষের কথা যদি বলিতেই হয় তবে সেই ব্যক্তির সামনে বলিতে হইবে, প্রেমভরে বলিতে হইবে।

৫

শেষ কথাটি বলি। দাতার সাল আসিতেছে। স্বরাজের এক তৃতীয়াংশ ৫৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের কি করা চাই? উহার পরে

তো অনন্ত পথ পড়িয়া আছে। কিন্তু ১৭ সালের মধ্যে এক তরফ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। সেজন্য আমাদের সকল শক্তি ইহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এই কথাটি লক্ষ্য পথে আসিলে যাঁহাদের চিন্তাধারা সর্বোদয়ের অভিমুখী তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের ভাবিতে হইবে, আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকিলে কি ভূদান পরিচালনা করিতে পারিব? উহা হইতে ভূদানের কাজে সুবিধা হইবে কি? যদি হয় তাহা হইলে ঐ স্থান ছাড়িব না। কোনও রাজনৈতিক দলে, বা গঠন কর্মে বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে যে কেহই থাকুন, যদি মনে হয় যে সেখানে থাকিলে ভূদানের কাজ ঠিকমত হইবে না, তাহা হইলে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করুন এবং 'জয় জগৎ' বলিয়া এই কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।

কাল একটা প্রশ্ন লইয়া কথা উঠিয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, আর সব কথা তো ঠিক, কিন্তু নয়ী তালিম নিজেই যে বৈপ্লবিক শক্তি। তাই নয়ী তালিমের কর্মীদের নিজের নিজের জায়গায় দৃঢ় হইয়া থাকা উচিত, ছাড়া উচিত নয়। ইহাতেও ভাবিবার কথা আছে। বৃক্ষের পুষ্টির জন্য জল যেমন, নয়ী তালিমও কি তেমনই? তাই যাঁহারা বৃক্ষের পুষ্টির কথা বলিতেছেন তাঁহারা জল দানের বা জল সিঞ্চনের কথায় আপত্তি করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে বৃক্ষের পুষ্টির জন্য জল সিঞ্চন গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সুতরাং জল সিঞ্চনের বিরোধিতা কখনও করিতে পারেন না। এই তুলনাটি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে দেখিব, কথাটি সত্য। কিন্তু আজ আমাদের যে সব প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, যাহাতে আমরা আটকাইয়া পড়িতেছি, যাহার বহু বিষয়ে আমাদের লড়াইতে হয়, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবিতে হয়। সম্প্রতি সর্বোদয়ান্তে নয়ী তালিমের সম্মেলন হইয়া গেল। বুঝিতে পারি না যে হিন্দুস্থানের সর্বস্থান হইতে লোকে সর্বোদয় সম্মেলনেও আসে আবার নয়ী তালিমের সম্মেলনেও আসে, দুই জায়গায় গিয়াই আলোচনা করে। এই কথাটাই বুঝিতে পারি না। সিঞ্চনবিভাগ আর বৃক্ষের পরিপোষণ, দুইয়েরই আলোচনা করিতে হইবে; তবে বৃক্ষের পরিপোষণ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা পুরী সর্বোদয় সম্মেলনে যাইবেন। সিঞ্চন বিভাগের কথা যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা যাইবেন সনোসরায়। এরূপ তো ঘটে না। কিন্তু যখন এরূপ ঘটে তখনকার দাবি এই যে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু সমান, কিছু কিছু প্রভেদ আছে; যতখানি প্রভেদ তাহা দূর করা হোক, যতখানি সমান আছে তাহা অবশ্য রক্ষা করা হোক। বলা যায় যে নয়ী তালিমে সমস্ত আবহাওয়াই হউক অহিংস বিপ্লবের, সে বিপ্লবের প্রধান হইল প্রায়োজন, তাহার মূলে থাকিবে ভূদান-যজ্ঞ। যদি এই যজ্ঞের জন্য সাক্ষাৎ সাহায্য করা হয়, পালাক্রমে বা দূর হইতে নয়, তাহা হইলেই ঠিক হইবে। দূর হইতে সাহায্য করিবার চেষ্টা এই দুই বৎসরের জন্য বন্ধই থাকুক। •

• হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘ হইতে পরিচালিত 'নয়ী তালিম' পত্রিকায় যে সংখ্যায় প্রকাশিত পুরী সর্বোদয় সম্মেলনে প্রদত্ত বিনোবাজীর অভিভাষণ।

সার্থকতার পথ

শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত

মহেন্দ্র একটী আদর্শ বিদ্যালয় খুলিয়া, এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাজসংস্কারে ব্রতী হইলেন, তিনি দেখিলেন, সমাজের চারিদিকে ঘুণ ধরিয়াছে, এই সমাজকে বাঁচাইতে হইলে, সমাজের যাহারা ভবিষ্যৎ কর্ণধার হইবে তাহাদের প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। আজ যাহারা শিশু তাহারাই ভবিষ্যৎ সমাজের জনকজননী হইবে। তাই এই শিশুদের যদি মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা যায় তবে ১৪।২০ বৎসরের মধ্যে সমাজে উপযুক্ত লোকের আর অভাব হইবে না। আর সমাজও ক্রমে উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে।

মহেন্দ্র তাই তাঁহার সমস্ত শক্তিসামর্থ্য লইয়া আগাইয়া আসিলেন এই বিরাট পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য। তিনি তাঁহার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া এই কাজে অগ্রসর হইলেন, এই কাজে তাঁহার সঙ্গীও জুটিয়া গেল দশ বারোজন, সকলেই মহেন্দ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া এই কার্যে নিজেদের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন।

মহেন্দ্রের যেমন ছিল গুণ, তেমনি ছিল রূপ, মহেন্দ্রকে দেখিলে সহজেই মানুষের মস্তক অবনত হইয়া আসিত। তিন চার বৎসরের মধ্যে মহেন্দ্রের বিদ্যালয়ের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, মহেন্দ্র ও তাহার সহকর্মীদের চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের এতটা উন্নতি হইল যে, প্রতিবৎসরই এই বিদ্যালয় হইতে কোনরা কোন ছাত্র বৃত্তি পাইত। বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রসংখ্যাও এক হাজারের উপর। প্রতি বৎসরই দেড়শত হইতে দুইশত ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়। মহেন্দ্রের আনন্দের সীমা নাই, তিনি মনে করিলেন, আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার ছেলেরাই সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। মহেন্দ্র আরও বিগুণ উৎসাহে তাঁহার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার মনে কত আশা, কত ভরসা, আর কিছুদিন পরেই তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন, তাঁহার ছেলেদের মধ্যেই বড় বড় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইন্‌জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হইয়াছে, আর মহেন্দ্র কল্পনালোকে দেখিতে লাগিলেন—সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মহেন্দ্রের কাজের বিরাম নাই, এইভাবে অক্লান্ত চেষ্টায় সুদীর্ঘ কুড়িটি বৎসর চলিয়া গেল।

একদিন মহেন্দ্র তাঁহার নির্দিষ্ট কক্ষটীতে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় রবীনের পিতা বিনোদ বিহারী আসিয়া মহেন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন রবীনের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্য। মহেন্দ্রের জন্যই যে রবীন আই-সি-এস পাশ করিয়া মাত্রকুল ছাব্বিশের পর প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ যে আশেপাশে গ্রামের বড় বড় লোকেরা পনের বিশ হাজার টাকা পণ দিয়াও রবীনকে জামাতা করিবার জন্য ব্যগ্র, রবীনের এই সমস্ত কৃতিত্বের মূলে রহিয়াছে মহেন্দ্রের বেদনাময় অক্লান্ত পরিশ্রম। যদিও বিনোদবিহারী সব প্রলোভন ত্যাগ করিয়া অবশেষে মাত্র দশহাজার টাকা পণ নিতে রাজী হইয়া পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার ধূর্জটী সেনের পরমা সুন্দরী ও বিদুষী প্রথমা কন্যা অনুপমাকেই পুত্রবধূ করিবার মানস করিয়াছেন—সবই মহেন্দ্রকে বলিলেন। মহেন্দ্র সব শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি ধীরে বলিলেন—বিনোদবাবু, আমার এ বিবাহে যাওয়া সম্ভব হইবে না। অনেক

কাকুতি মিনতি করিয়াও যখন মহেন্দ্রকে রাজী করাইতে পারিলেন না তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া বিনোদবাবু ফিরিয়া গেলেন।

মহেন্দ্র অনেকক্ষণ একই ভাবে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখেন। সূর্য কখন অস্তাচলে গমন করিয়াছে, তিনি দারোয়ানকে দরজাটি বন্ধ করিতে বলিয়া আর কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী নদীর তীরে চলিয়া গেলেন। আজ মহেন্দ্রের কোন সঙ্গ ভাল লাগিল না, তাই একাকী বিষণ্ণ মনে নদীর তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই মহেন্দ্র চিনিতে পারিলেন, এ যে তাঁহারই প্রিয় ছাত্র অজয়। এতদিন পরে অজয়কে পাইয়া মহেন্দ্রের বিমর্ষটা অনেকটা কাটিয়া গেল, অজয় এখন কলিকাতা থাকিয়া এম, এ পড়িতেছে, তাহার নিকট তিনি বিমল, সমর ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের সংবাদ জানিতে চাহিলেন।

অজয় বলিল, সমরবাবু এখন মস্তবড় কনট্রাক্টর —এবারও কিছুদিন হইল প্রায় দেড়লক্ষ টাকার এক কনট্রাক্ট পাইয়াছেন, ইহাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁহার লাভ থাকিবে। ব্যবসাতের জোর, তাই কনট্রাক্ট দেওয়ার ভার ছিল এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার, আপনারই প্রিয় ছাত্র বিমল রায়ের উপর। যদিও বিমলবাবু প্রথমে সমরবাবুকে চিনিতেন না, আপনার ও আপনার স্কুলের পরিচয় দেওয়ায় বিমলবাবু অতি সহজেই মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় এই বিরাট কনট্রাক্টটি তাঁহাকে দিয়া দেন। এবং ভবিষ্যতেও যাহাতে এইরূপ আরো কনট্রাক্ট পাইতে পারেন—তাহার চেষ্টা করিবেন বলিলেন। আমাকেও সমরবাবু পড়াশুনা ছাড়িয়া তাঁহার কনট্রাক্টের মধ্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন—বলিলেন, স্কুলের বন্ধুদের ভিতর থেকেই তিন চার জন লোক নিয়েছি কিন্তু একজনকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। একজন বিশ্বাসী লোকের নিতান্ত প্রয়োজন, তুমি আসলে আমি কতকটা বেঁচে যাই।

মহেন্দ্র অজয়কে দেখিয়া যতটা আনন্দিত হইয়াছিলেন এখন এই সমস্ত শুনিয়া একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িলেন। মহেন্দ্রের আজ বারবার মনে হইতে লাগিল তাঁহার বালাবন্ধু সুহৃদের কথা। যখন মহেন্দ্র স্কুল স্থাপন করে তখন সুহৃদকে তাহার সঙ্গে যোগ দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছিল। সুহৃদ্ বলিয়াছিল—মহেন্দ্র, শিক্ষা দিব কাকে। মহেন্দ্র তখন সত্যিই সুহৃদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, আজ কিন্তু সুহৃদের কথাই সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সুহৃদের খবর কিছুদিন পূর্বেও সে পাইয়াছে। সুহৃদ্ আছে সেই অজ পাড়াগাঁয়ে একটি নগণ্য গ্রামে, সেখানে মহেন্দ্র বিশ বৎসর পূর্বে একবার গিয়াছিল। এমনি নগণ্য গ্রাম যে, মহেন্দ্র একদিন বই দুইদিনও সেইখানে টিকিতে পারে নাই! আজ বার বার সুহৃদের কথা তাহার মনে হইতে লাগিল— মহেন্দ্রের মনে হইল এখনই ছুটিয়া যান সুহৃদের নিকট। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া কলটুকু পর্যন্ত তিনি স্পর্শ করিলেন না, কাহারো সঙ্গে বিশেষ কোন কথা পর্যন্ত বলিলেন না, সকাল সকাল শুইতে গেলেন। সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না, খুব ভোরে উঠিয়া তাঁহার সহকর্মী নিত্যানন্দবাবুকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে স্কুলের ভার দিয়া তিনি সেই অজ পাড়াগাঁ সুহৃদের জন্মভূমি বিশালাক্ষী গ্রামের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে পথে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য নষ্ট করিয়া তিনি কি করিলেন—তাঁহার এত চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও অন্যান্য বিদ্যালয় হইতে এই বিদ্যালয়ের তফাৎ রহিল কোথায়? তিনি অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়াও বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। শুধু এইটুকু বুঝিলেন, এই বিদ্যালয়ের ছেলেরা পরীক্ষায় ভাল ফল করে আর বড় বড় চাকুরি লাভ করে। এই বিদ্যালয়ের ছেলেদের দিয়া সমাজের মঙ্গল তো একবিন্দুও বিদূরিত হইল না বরং ইহাতেই সমাজের মঙ্গল আরো বাড়াইয়া তুলিতেছে।

কখন যে ষ্টীমার বিশালাক্ষী গ্রামের নিকট আসিয়া পড়িল মহেন্দ্রের সেদিকে খেয়ালই ছিল না, তিনি তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গোছগাছ করিয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন, এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া বিশালাক্ষী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। যখন সুহৃদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, সুহৃদ্ তখন একখানি ছবির সম্মুখে বসিয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে সান্ধ্য প্রার্থনায় রত ছিল। ছবিখানির সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখিয়া মহেন্দ্রেরও মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছিল, তিনিও চুপচাপ তাহাদের মধ্যে এক কোণে বসিলেন, কতক্ষণ যে তিনি এই ভাবে বসিয়াছিলেন তাঁহার সেদিকে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সুহৃদের চীৎকারে তাঁহার সম্বিৎ ফিরিল, তিনি চক্ষু খুলিয়া দেখেন সুহৃদ্ তাহার বিশাল বাহু দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে,—কি যে একটা ভাব, কি যে একটা আনন্দ, মহেন্দ্র আজ অনুভব করিলেন, তাঁহার জীবনে কোনদিন এইরূপ অনুভব করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। এতদিন পরে মহেন্দ্রকে এইরূপে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়াতে সুহৃদেরও যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্তি তাহা তাহার হাবভাব ও মুখের চেহারাই বলিয়া দিতেছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মহেন্দ্রের মনে হইল, এ যেন সে এতদিন পরে আপন মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। আদর্শ মায়ের কথা সে অনেক শুনিয়াছে, বইয়ে অনেক পড়িয়াছে কিন্তু নিজে সে কোন দিন দেখে নাই। নিজের মাকেও তাহার কতকটা মনে পড়ে কিন্তু স্পষ্টভাবে ঠিক করিয়া মনে করিয়া উঠিতে পারে না, তবে এইটুকু মনে হয় তিনিও বোধ হয় পরের ছেলেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমনি করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিতেন না। সুহৃদের মায়ের সঙ্গে অল্প সময়ের আলাপেই মহেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে—এ সাধারণ মা নয়, এ মা যেন শুধু সুহৃদের মা নয়, এ সকলেরই মা। একেই বলে জগৎ জননী। মহেন্দ্র মায়ের মুখে সুহৃদের খবর অনেক কিছু পাইল। সুহৃদ্ দিন রাত তাহার সেবা করিয়া যাইতেছে, সুহৃদের চেষ্টায় এই বিশ বৎসরে গ্রামে রাস্তা ঘাট, স্কুল, পাঠশালা, হাট, বাজার, দাতব্য চিকিৎসালয় সবই একের পর এক গড়িয়া উঠিয়াছে।

আজ গ্রামে যেমন কোন ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি নেই। সামান্য যা কিছু মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাও সুহৃদের এক কথায় মিটমাট্ হইয়া যায়। গ্রামবাসী ছোট বড় বৃদ্ধ যুবক সকলেই সুহৃদ্‌কে প্রাণ দিয়া ভাল বাসে।

সুহৃদের চেষ্টায়ই

"এক আদর্শে চলে যায়।
তাদের নিয়ে সমাজ গড়া"

মহাপুরুষের এই বাণী সার্থক হইতে চলিয়াছে। মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন—আমি আমার দশ বারো জন সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ সহকর্মী লইয়া এই বিশ বৎসরে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজের কোন মঙ্গল করিয়া উঠিতে পারি নাই কিন্তু সুহৃদ্ একা এসে কেমন করিয়া সত্যিকারের এমন সুন্দর, এমন আদর্শ একটি সমাজ গড়িয়া তুলিল?

সুহৃদ্ যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত দশটা। তখন দুইজনে খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িল। পরদিন সুহৃদ্ খুব ভোরে উঠিয়া মহেন্দ্রকে জাগাইয়া তুলিল। মহেন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়া

দেখিল তাহাদের অবতরণের প্রস্তুত। জলযোগ শেষ হইলে সুহৃদ্ মহেন্দ্রকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই তাহার চোখে যাহা পড়িল তাহা দেখিয়া মহেন্দ্র অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিল। বিশ বৎসর পরে আসিয়া আজ সে যাহা দেখিতেছিল তাহা তাহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ যেন এক স্বপ্নপুরীতে মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তা ঘাট, বাড়ী ঘর সবই যেন এক নূতন ধরনে সজ্জিত। যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি ঝকঝকে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত, রাস্তার দুইধারে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী। প্রতিটি বাড়ী কয়েক বিঘার উপর স্থাপিত। কোন বাড়ীর সীমানাই এক বিঘার কাছে হইবে না। প্রতিটি বাড়ীতে শয়নঘর ব্যতীত একটি করিয়া বৈঠকখানা, শিশুপাঠাগার, শিল্পাগার, একটি করিয়া লেবরেটরী ঘর, চেঁকিশালা, গুদাম ঘর ইত্যাদি। প্রতিটি বাড়ীতে ফুল বাগান, সব্জীর বাগান, আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি ফলের বাগান। প্রতিটি বাড়ীতেই মহেন্দ্র দেখিতে পাইল শিশু, বৃদ্ধ, যুবা এমন কি বাড়ীর মেয়েরাও অতি ভোরে উঠিয়া যার যার বাগানে কাজ করিয়া যাইতেছে। কিছুদূর ঘুরিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া সুহৃদ্ একটি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সুহৃদ্ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, বাড়ীর সকলে ছুটিয়া আসিয়া সুহৃদ্‌কে ও মহেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিল। তাহাদের অভ্যর্থনা দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে হইল কত যুগ পরে যেন তাহারা তাহাদের ঘরের ছেলেকে তাহাদের মধ্যে পাইয়াছে। মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, সুহৃদ্ কি মন্ত্রবলে লোকগুলিকে এমন আপনার জন করিয়া, এমন আদর্শনিষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে? সুহৃদ্ তাহাদের সকে তাহার বাল্যবন্ধুর পরিচয় করাইয়া দিল। তাহারা মহেন্দ্রকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন আপনার করিয়া নিল যে, মহেন্দ্রের মনে হইল তাহাদের সহিত মহেন্দ্রের যেন কত দিনের পরিচয়। মহেন্দ্র তাহাদের সঙ্গে দুই চার কথাতেই বুঝিতে পারিল যে, এই গ্রামের লোকেদের চাকুরির জন্য বড় বাহিরে যাইতে হয় না। যার দুই চার জন বিদেশে চাকুরি করে। তাহারা সকলেই বড় বড় চাকুরে। প্রত্যেকে অন্তত বৎসরে একবার করিয়া দেশে আসিবেই, আর তাহাদের বিবাহাদি যত উৎসবই হউক না কেন তাহারা এই দেশের বাড়ীতে আসিয়াই সম্পন্ন করিবে। এই গ্রামের প্রত্যেকেরই কিছুনা কিছু ধানের জমি আছে। আর শুরিতরকারি তাহারা তাহাদের বাড়ীতেই জন্মায়। প্রত্যেক গৃহেই কিছুনা কিছু গৃহশিল্প আছে, কোন বাড়ীতে তাঁত চলিতেছে, কোন বাড়ীতে বেতের কাজ, কাঠের কাজ হইতেছে. কোথাও গেঞ্জীর কল চলিতেছে আবার কোথাও ছোবার কল আছে, এছাড়াও ছুতার, কামার, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, ধোপা, নাপিত, চিত্রকর ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব এই গ্রামে নাই। এখানে কেহই কাহাকেও ঘৃণা করে না, সকলেই তাহারা ভাই ভাই। ইহা সবই সম্ভব হইয়াছে তাহাদের এই সুহৃদ্‌দার জন্যই। তাহার অদম্য চেষ্টায় এই নগণ্য গ্রামটিতে কোন কিছুরই অভাব নাই। এমন কি এখানে বিরাট একটি ছাপাখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার শীঘ্রই একটি কলেজ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। মহেন্দ্র মনপ্রাণ দিয়া সমস্ত শুনিতেছিল আর ক্রমেই অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিল এও কেমন করিয়া সম্ভব হইবে?

সুহৃদ্ বলিল "ভাই, এ সমস্ত কিছুই আমি করিনি, এই গ্রামের সকলের আপ্রাণ চেষ্টায়ই এটা সম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এছাড়া আমরা আমাদের নিজেদের খেয়ালবাফিক কিছুই করিনি ভাই, আমরা একজন আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চেষ্টা করছি মাত্র। তাঁহার খেয়ালকে পূর্ণ রূপ দিতে চেষ্টা করেছি সকলে মিলে, আপ্রাণ হয়ে। যা কিছু দেখ্‌ছ

সবই· তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে, তিনি আমাদের নিজের সন্তানের মত ভাল বাসেন—যে ভালবাসার তুলনা নাই। এ গ্রামের সকলেই তাঁর ভালবাসার মুগ্ধ. তাই তাঁকে খুসি করার জন্যই গ্রামের লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টায় এই সমস্ত গড়ে তুলেছেন। আর তাঁকে খুসি করতে গিয়েই সকলে যেমন কর্মঠ তেমনি বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে, আর তাদের অভাব অনটনও ক্রমই দূর হয়ে যাচ্ছে। এখানে লোকেরা জানে :

"মানুষ আপন টাকা পয়
সবার আগে মানুষ নয়।"

এরা মানুষ ভালবাসে, এরা মানুষকে আপন করে নিতে চায়। এদের দৃষ্টি টাকার দিকে নয়—মানুষের দিকে, তাই এদের মানুষেরও অভাব হয় না, সঙ্গে সঙ্গে টাকার অভাব নেই এখানে, দরকার হলে এখান থেকে হাজার হাজার টাকা তুলে দিতে পারি, একদিন কি দুইদিনের ভিতর। নীচতা হীনতা এদের ভিতর নেই, এরা জানে শুধু তাঁকে খুসি করিতে, আর তাঁর কাজ কি জান? শুধু মানুষকে ভালবাসা, আর এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা। মহেন্দ্র নীরবে শুনিতেছিলেন। সুহৃদের কথায় হঠাৎ বাধা দিয়া বলিলেন, আমি ও আমার সহকর্মীরাও তো ছাত্রদিগকে ভালবেসে তাদের মানুষ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সে চেষ্টা এমন করে ব্যর্থ হল কেন?" সুহৃদ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল "সাধারণত আমরা কোন জায়গাতে ভুল করি, জান মহেন্দ্র? আমরা স্কুল কলেজে কতকগুলি ভাল ভাল পুথি পড়িয়ে ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে, ছাত্রদের মানুষ করতে চাই। কিন্তু স্কুল কলেজ দিয়ে যে শিক্ষার পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চাই, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষার পরিবেশ প্রথমে সৃষ্টি করতে হবে গৃহে, প্রতিটি পরিবারে। তোমরা কতক্ষণ তোমাদের ছাত্রদের সংসর্গে থাকতে পার? কতটা তাদের মনকে আকর্ষণ করতে পার? যতটা সময় তোমরা ছাত্রদের সংস্পর্শে থাক বা তাদের উপদেশ দাও, তার অধিকাংশ সময়ই ছাত্রদের মন পড়ে থাকে তাদের গৃহ প্রাঙ্গনে, আর সেখানকার আপনজনের ছোট, বড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের সঙ্গ লাভের জন্য তাদের প্রাণ আকুপাকু করে ওঠে। তাই স্কুলের বা কলেজের ছুটি হলে তারা একটা বিরাট মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দ কোলাহল করতে করতে ছোটে আপনার প্রিয় পরিবেশের দিকে। তুমি যে কোন স্কুল কলেজের দ্বারে ছুটির সময় একটুখানি দাঁড়াবেই যেন উপলব্ধি করতে পারবে, এই কিশোর প্রাণগুলি যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে বন্দী ছিল। তবেই দেখ, কেবল স্কুল কলেজকে তোমরা শিক্ষার বাহন করতে চেষ্টা করেছ, কিন্তু ছাত্রদের জীবনের কেন্দ্রে প্রিয়তর পরিবেশ রয়েছে তোমাদের স্কুল কলেজের বাহিরে, সেখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জান না, কিছুই খবর রাখনা। এমন হয়তো হতে পারে তোমরা যে পুস্তক পড়ালে যে উপদেশ দিলে, ছাত্রদের পারিবারিক পরিবেশের আবহাওয়া সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। তোমরা যা গড়তে চাও সেখানে গিয়ে তা ভেঙ্গে যায়। আমার কিন্তু ধারণা অন্যরূপ। আমি স্কুল কলেজকে কখনই শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি নাই। যদি সত্যি সত্যি মানুষ গড়ার শিক্ষা দিতে চাও, তবে তার প্রথম ভিত্তি হবে পরিবার গঠন করা। তোমরা যে বয়সে ছাত্রদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর, চরিত্র গঠন করার উপদেশ দাও, তার প্রকৃত শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের মূল উপাদানগুলির বীজ রোপিত হয়েছে বহুদিন পূর্বে তাদের আপন গৃহেই। এই পারিবারিক জীবনকে শুদ্ধ, সবল ও প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলতে না পারলে তোমাদের শিক্ষার

আংশিক প্রচেষ্টাও কখনও সফল হতে পারেনা। তাই আমি আরম্ভ করেছি কতকগুলি পরিবার গঠন করার এই ক্ষুদ্র আয়োজন। আমার এই প্রচেষ্টার কয়েক বৎসর পরে আরম্ভ করেছিলাম এই বিদ্যালয়টি। এই বিদ্যালয়ের গঠন কেবল ছাত্রগুলিকে নিয়ে নয়। আমার আদর্শ পল্লীর সমস্তগুলি গৃহস্থকে নিয়ে। বিদ্যালয় ও তার অন্তর্গত পরিবারগুলি একসূত্রে বাঁধা। সদাচারনিষ্ঠা, সেবা ও সততা ছাত্রেরা কখনও বই পড়ে শিখতে পারে না। মৌখিক উপদেশেও সে শিক্ষা হয় না। সে শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। তোমরা একথাটা ভালই বোঝ কিন্তু কাজের বেলায় অবহেলা কর। শিশুমনস্তত্ত্বে এই মূল সত্যটিকে উপেক্ষা করার জন্যই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ভুল হয়ে গিয়েছে। আমরা এখানে কিন্তু তা করি নাই। আজ যে পল্লীবাসীর সন্তানসন্ততিগণ আমাদের স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তাদের শিক্ষার আয়োজন করেছি আমরা দশ দিন বৎসর পূর্ব হতে, দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে। তাই এখানকার বিদ্যালয়ে যে উপদেশ আমরা দিই শিশুরা বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তারই আলোচনার মধ্যে সেখানে দেখে তাদের অতীত দিনের একটা বাস্তবরূপ। আমাদের ছাত্রদের কখনও কোন বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় না, বরং পারিপার্শ্বিক থেকে সর্বদাই পাচ্ছে উৎসাহ উদ্দীপনা ও বাস্তব কর্মে তার শিক্ষার পরিশোধন এবং চরিত্র গঠনের উপাদান। এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন গ্রাম থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তাই আজ এখানে একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। তুমি আমাদের শিল্প-কেন্দ্রগুলি দেখেছ, এখানকার গৃহস্থরাই এখন চাইছে নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, চাইছে সন্তানদিগকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে। তাদের সমবেত আগ্রহে জীবনের কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে যে কলেজ গড়ে উঠবে তাই হবে এই ক্ষুদ্র পল্লীসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। এখানকার ছাত্রেরা হবে যার যার নিজ গৃহের শিল্প-কলার পরিচালক, নিজের গৃহেই পাবে তাদের কর্মের সংস্থান, শিক্ষা সমাপ্ত করে তারা বেকার হয়ে পড়বেনা। চাকুরীর উমেদারী করবেনা, তাদের নিজ পরিবার ত্যাগ করে পল্লীজীবনের এই অনাড়ম্বর, সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া পরিত্যাগ করে কলকারখানার কলুষিত পরিবেশে প্রবেশ করতে হবেনা। মানুষ গড়ার অত্যুগ্র আগ্রহে আমরা যদি জীবনের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র পারিবারিক পরিবেশকে অবহেলা করি, মানুষের বাস্তব জীবনের চাহিদার পরিপূরক শিক্ষা যদি আমরা না দিতে পারি তা হলেই সৃষ্টি হয় কতকগুলি অসহায় বেকারের। তোমরা যে শিক্ষা দিচ্ছ তা কলেজ পরিচালনায়। আমার ন্যায় আমার আরো কয়েক-জন সতীর্থ এই আদর্শকে মূর্ত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে কাজে লেগে গেছেন। তাদেরও পল্লী পরিবেশে গড়ে উঠছে অনেকগুলি বিদ্যালয়। এই সব বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদিগকে আমরা পাব আমাদের কলেজে। ক্রমে এই ভাবে অনেকগুলি কলেজ যদি আমরা করতে পারি তবেই আমাদের বাস্তব প্রয়োজন হবে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি পরি-চালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়।"

মহেন্দ্র মুহূর্তের প্রতিটি কথা অত্যন্ত মনো-যোগের সহিত শুনিতেছিল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে এতদিনের একটা জমাট কুজ্ঝটিকা যেন ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। মুহূর্ত বলিল "সমাজই বল আর জাতিই বল, তার উপাদান হল প্রতিটি পরিবার। এই পরিবারগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা আকাশ-কোলা একটা সমাজ বা জাতির কল্পনা করতে পারিনা। তাই সমাজ সংস্কার, জাতি

গঠন প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা আমার মনে ভাল লাগে না। আমার কর্মক্ষেত্রের সম্মুখে পাচ্ছি আমি আমার প্রতিবেশী কতকগুলি গৃহস্থকে, তাদের আশা-আকাঙ্খা, তাহাদের জীবনধারা আমি জানি। আমি যাঁর কাছে উপদেশ পেয়েছি তিনি আমাকে বলেছিলেন এই পরিবারগুলিকে সেবা দিতে আর সেবা মানে তাই যা মানুষকে সুস্থ, সবল, আনন্দিত ও উন্নত করে তোলে। আমার সেই বাস্তব সেবা থেকে কতকগুলি শাখা-প্রশাখা আপনি গজিয়ে উঠেছে যেমন এখানকার কৃষি, শিল্প, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিজ্ঞান কলেজ।

"তুমি যে সততা, নিষ্ঠা ও কর্মপ্রেরণা নিয়ে শিক্ষা প্রসারে ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলে তা যদিও এক হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে তোমার ক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই। তুমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছ, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার যথেষ্ট মূল্য আছে। তোমার নিজেরই এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, তাই আমি তোমাকে ততটা নিরুৎসাহ করি নাই, তখন নিষেধ করলেও তুমি শুনতে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষার গলদ্ কোথায় তা তুমি বুঝতে না।

"আমার সামনেও তখন কোন বাস্তব প্রমাণ ছিলনা। এখন এই বিরাট বাস্তব বিদ্যালয় রয়েছে তোমার সম্মুখে, তাই আজ তোমাকে এত কথা বললাম, তুমি নিরাশ হয়ো না। এই নূতন শিক্ষায় মানুষের বাস্তব সেবায় ব্রতী হবার জন্য তোমার অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হও। আর মনে রেখো আদর্শ একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণ ছাত্র না হলে, শিক্ষক হওয়া যায় না। তুমি যতদূর উঠবে নিষ্ঠার সেবার উন্নয়নে যোগ্যতায়, ততদূর তোমার ছাত্রকেও ওঠাতে পারবে, নিজে ঘুমিয়ে থাকলে অপরকে জাগানো যায় না। আজ যে জাগবার ডাক এসেছে, কায়মনোবাক্যে তাতে সাড়া দিতে হবে। নিজের সততা বিক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খল আত্মাভিমানকে এক আদর্শ শিক্ষকের চরণ তলে সুবিন্যস্ত করে একাগ্র হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে আমাদের নিজের, পরিবারের, আমাদের পারিপার্শ্বিকের দেশের আত্মনিয়োগ করতে হবে। চল আমরা সেই আদর্শ শিক্ষকের ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য আত্মোৎসর্গ করে জীবন সার্থক করি।

———

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি দেশের মধ্যে শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহা নগণ্য মাত্র। যে দেশে শতকরা এগার জন মাত্র লিখন পঠনক্ষম, সে দেশে বৎসরে মাত্র ১০৪৮৩৯৪ জন প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার ব্যবস্থা (যেমন ১৯৪১ সালের রিপোর্টে পাওয়া যায়) লজ্জার বিষয়। প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার উপযুক্ত বয়সের সকল ছাত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা দেশে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে।

যতদিন না দেশে শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব সরকার বহন করিবেন, ও শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হইবে ততদিন একদিকে যেমন শিক্ষার বিস্তার হইবে না, অপর দিকে শিক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া নানারূপ বৃত্তিব্যবস্থার মধ্যে সুপরিচালিত করিয়া দেশের সেবায় ও অর্থ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

প্রাচীন ভারতে পারিষদের নিয়ন্ত্রণ শিক্ষাকে এরূপ নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছিল যে নিঃশুল্ক ব্যাপক শিক্ষা নানা বৃত্তিমুখিনী ছিল। বর্তমান জগতে প্রায় সকল দেশেই শিক্ষার বিস্তার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া চলিতেছে ও যে যে দেশ একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহারাই শিল্প, অর্থ, সব বিষয়েই উন্নতি করিতেছে। আমরা শতাব্দী পূর্বের বৃটেনের ব্রাত নীতির দ্বারাই এখনও পরিচালিত হইতেছি। এই নীতি বৃটেনও পরিত্যাগ করিয়াছে কিন্তু আমরা আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও বর্তমান জগতের অন্য দেশের সহ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সমানই অন্ধ রহিয়াছি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অবশ্য একটা কথা বলিবার আছে। জার্মানীর নাৎসী বা রাশিয়ার সাম্যবাদী দলের ন্যায় নিয়ন্ত্রণ হানিকর। ইহার দ্বারা যে রাজনৈতিক দল যখন সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করিবে, তাহারাই আপনাপন মতবাদ সুকুমারমতি ছাত্রের মনে চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করিবার প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে দলীয় প্রচারের ক্ষেত্র করিবে এরূপ আশঙ্কা আছে।

অতএব আমাদের শিক্ষানিয়ন্ত্রক বিধি এরূপ করিতে হইবে, যাহাতে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা রাষ্ট্র হইতে কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ সংস্থাকে রাজনৈতিক দল হইতে দূরেও রাখিতে হইবে। বর্তমান দলীয় রাজনীতির যুগে এই পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে।

বর্তমান জগতে কয়েকটি সাম্যবাদী দেশ ছাড়া প্রত্যেক দেশেই দলীয় রাজনীতির প্রভাব থাকিলেও প্রত্যেক দেশ আপন আপন নিজস্ব উপায়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যান্টস্ কমিটি এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান যাহা রাজনীতিনিরপেক্ষ। ফ্রান্সের ষ্টেট্ একাডেমি ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এইরূপে রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। ভারতকেও তাহার নিজস্ব প্রণালীতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ধর্ম যে দেশের প্রাণস্বরূপ সে দেশে কোন ধর্ম সংস্থা এই কাজ সম্পাদনে সফল হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, অতীত দুশের পৃথিবীতে ধর্ম যে

স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, বর্তমান পৃথিবীতে তাহার সে স্থান আর নাই। ভারতে নানা ধর্ম প্রচলিত, ইহার মধ্যে একটির হস্তে তো শিক্ষার ভার সমর্পিত হইতে পারে না। আবার বিভিন্ন ধর্মসংঘকে শিক্ষা-কার্যে নিয়োজিত করিলে একতা দূর হইবে। তাহা ছাড়া অন্ধ বিশ্বাস ধর্মের মূল সূত্র হওয়ায় বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ধর্মসংঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রণালী প্রগতির সহিত খাপ খাওয়াতেই অসমর্থ হইবে।

সৌভাগ্যের বিষয়, রাষ্ট্রের শক্তিতে শক্তিমান অথচ নিরপেক্ষ এরূপ প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক দেশেই আছে, তাহা ন্যায়বিচারালয়। আমাদের দৈহিক স্বাধীনতা ও পার্থিব সম্পত্তি রক্ষার ভার তাহারই উপর। যদি শিক্ষাক্ষেত্রেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান কল্পনা করিতে পারি তাহা হইলে তাহার হস্তে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও জ্ঞানের সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। প্রতি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষার বাহন মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ এইরূপ একটি বোর্ডের অধীন করিতে হইবে। ইহার সভাপতি দেশের রাজ্যপালের মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ্ হইবেন। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকসম্প্রদায়ের তিন জন প্রতিনিধি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এক একজন বিশেষজ্ঞ, ব্যবস্থাপক সভার দুই জন প্রতিনিধি, সরকার-মনোনীত অর্থবিশেষজ্ঞ ও সেক্রেটারি এবং একজন মহিলা লইয়া এগারো জন এই বোর্ডের সদস্য হইবেন ও পাঁচ বৎসর কাল পূর্ণ বেতনে ইহাতে সর্বক্ষণের জন্য (whole time) নিযুক্ত থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভা নির্বাচন হইতে নির্বাচন করিলে উপনির্বাচনের দ্বারা রিক্ত স্থান পূর্ণ করিবেন। কারণ প্রতিনিধি হইবার পর তিনি ব্যবস্থাপক সভার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিবেন। শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও পাঁচবৎসরের জন্য আপনাপন প্রতিষ্ঠান হইতে বিনা বেতনে ছুটি পাইবেন।

উচ্চ শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয়ের বা বৃত্তিমূলক) এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রীয় বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে, যাহার গঠন পূর্বের অনুরূপ (অর্থাৎ সভাপতি রাষ্ট্রপতির মনোনীত ও লোকসভা ও রাজ্যসভার এক একজন প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার স্থানে) হইবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট আয়, এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন (যথা ইনকাম্ ট্যাক্সের এক তৃতীয়াংশ, আবগারী শুল্কের অর্ধেক ইত্যাদি) হইবে ও তাহার দ্বারাই ব্যয় নির্বাহ হইবে। তবে অতিরিক্ত অর্থের আবশ্যক হইলে কেন্দ্রীয় বোর্ড লোকসভার ও রাজ্যের বোর্ড ব্যবস্থাপক সভার দ্বারস্থ হইবেন ও প্রস্তাবিত নীতির সমালোচনাও উক্ত সভা করিতে পারিবে। এইরূপে ব্যবস্থাপক সভা হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও বোর্ড জনসাধারণকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। প্রত্যেক শিক্ষক ও পরিদর্শক ও বিদ্যালয় এই বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন। বর্তমান ভারতে এইরূপ বোর্ডই শিক্ষা বিস্তারে সমর্থ হইবে।

শিশুর শিক্ষায় অনুকরণবৃত্তির প্রভাব

শ্রীনীহারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সময় মানবসন্তান কতকগুলি সহজাত বৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইহার মধ্যে অনুকরণপ্রবৃত্তি একটি প্রধান সহজাত বৃত্তি। অনুকরণের মাধ্যমেই শিশু ভবিষ্যৎ বৃহত্তর কর্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষার প্রাথমিক উপায় হিসাবে অনুকরণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশুর অভিজ্ঞতা থাকে সীমাবদ্ধ তাই জ্ঞান বাড়াইবার জন্য অনুকরণ প্রয়োজন।

শৈশবে শিশুর যখন চিন্তাশক্তির পুষ্টি হয় নাই তখন সে অনিচ্ছুক ভাবেই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অনুকরণ করিয়া থাকে—এই ভাবেই সে প্রথম হাঁটিতে ও কথা বলিতে শিক্ষা করে

তিন চারি বৎসর বয়সে শিশুর মনে অভিনয় প্রতিভা জাগে, সে তখন অভিনয় ও খেলার মধ্য দিয়া তাহার পরিবেশের ঘটনাবলীকে অনুকরণ করে। তাই এই সময় দেখা যায় যে শিশু পুতুল লইয়া বা সাজিয়া খেলা করে, গুরু মহাশয়কে শাসন করিতে দেখিয়া নিজেও সেইরূপ অনুকরণ করে।

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে শিশুর মনে চিন্তাশক্তির উদয় হয়, তখন সে চিন্তা করিয়া নিজের ইচ্ছায় অনুকরণ করিয়া বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিতে, সুন্দরভাবে লিখিতে, হাতের কাজ, সূচীশিল্প, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি করিতে চেষ্টা করে। বারো তেরো বৎসর বয়সে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে নানাপ্রকার ভাববৃত্তি ও কল্পনার উদয় হয়। সেই সময়ই তাহার চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট সময়, তখন কোন না কোন আদর্শ গ্রহণ করিয়া সে তাহার জীবন পথে অগ্রসর হইতে চায়। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের কর্মজীবন পর্যন্ত যেন এক অন্তহীন অনুকরণের দ্বারাই চালিত হইতেছে সময়ে অনুকরণকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিলে ইহার কতকগুলি উপকারিতা দেখা যায়। শৈশবে শিশু অনৈচ্ছিকভাবে অনুকরণ করে, তখন তাহার শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষাদাতা তাহাকে ভালভাবে উচ্চারণ করিতে, সুষ্ঠুভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে শিখাইলে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে ভবিষ্যতে শিশু শুদ্ধ উচ্চারণে ও পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হয়। শিশু অনুকরণ করিয়া যে অভিনয় ও খেলা করে তাহার মধ্য দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। মাকে সংসারের সেবা যত্ন করিতে দেখিয়া সেও পুতুলের সেবা যত্ন করে। সৈন্যদল লইয়া শিশু কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহার উদাহরণ আমরা দেখিতে পাই নেপোলিয়ান ও কামাল পাশার মধ্যে। তাহাদের অন্তরের সুপ্ত প্রতিভার বীজ শৈশবে অনুকরণ দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছিল।

চেষ্টামূলক বা স্বৈচ্ছিক ভাবে যখন শিশু অনুকরণ করে তখন তাহার মনোযোগ, চিন্তাশক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলির অনুশীলন হয়। হাতের কাজ, আবৃত্তি, সূচিশিল্প, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি অনুকরণের দ্বারা শিশুর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে শিল্পীরা বহু প্রাচীন অজন্তা, ইলোরা হইতে তাঁহাদের শিল্পের সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও প্রথম প্রথম কবি বিহারীলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন। তবে এই

ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে অনুকরণ করিয়া তাহার সহিত আপনার বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত করিলেই অনুকরণের সুফল লাভ করা যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির কৈশোরাবস্থায় কবি বিহারীলালের অনুকরণ করিয়াছিলেন তথাপি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত করিয়া আপন প্রতিভা বিকশিত করিয়াছিলেন।

সামাজিক পরিপুষ্টির জন্য অনুকরণ প্রয়োজন। অনুকরণ দ্বারা অল্পবুদ্ধি বালক মেধাবী ও উদ্যমী বালকের অনুসরণ করে ও নিজের উন্নতি করিতে সমর্থ হয়। সামাজিক রীতি নীতি ও ব্যবহার এই অনুকরণের দ্বারাই প্রত্যেকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। অনুকরণের ফলেই মানবসভ্যতার গতি যুগ যুগ কাল অবধি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে ও উন্নত হইতেছে। অনুকরণের দ্বারাই সৃষ্টিকারিণী শক্তির পুষ্টি হয়।

অনুকরণের সময় উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিলে শিশু আপনার জীবনকে সুগঠিত করিতে পারে। আদর্শের অনুকরণে শিশুর জীবনে স্বদেশপ্রীতি, মানবতা প্রভৃতি কতকগুলি সুমহান গুণের আবির্ভাব হয়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে নেতাজীর আদর্শে বা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা লক্ষ লক্ষ নরনারী আপনার জীবনকে তুচ্ছ করিয়া, ধন সম্পত্তি ও নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বদেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। তথাপি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে অনুকরণ গ্রহণযোগ্য হইলেও ইহা সুপথে পরিচালিত না হইলে কতকগুলি অপকারিতাও দেখা দিতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে শিশুমন অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং সর্বপ্রকার মুদ্রাদোষ এবং সকল রকমের কুঅভ্যাসই শিশুদের নিকট হইতে সযত্নে ও অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে প্রত্যাহার করিয়া চলিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুগণের মন এতই কোমল বৃত্তি, ভাব ও প্রেরণার দ্বারা গঠিত যে যত্রতত্র দেখা যায় তাহারা নিজ অভিভাবকগণ অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাকে অধিকতর আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য বলিয়া মনে করে এবং তাঁহাদের আচরণ অনুসরণে প্রয়াসী হয়—তাহাদের নিকট শিক্ষক শিক্ষিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুতরাং অভিভাবকগণ অপেক্ষা শিক্ষক শিক্ষিকার দায়িত্ব অনেক বেশী এবং এই কারণেই তাঁহাদের সংযমের প্রয়োজনও একান্ত গভীর।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুকরণ করিতে করিতে শিশুর মন অনুকরণের দাস হইয়া পড়ে এবং সে আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। অন্ধভাবে অনুকরণ করিতে শেখে, যাহার ফলে চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি ও আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যায়—তাহাতে উন্নতির ও বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যাহাতে এইরূপ অবস্থা ঘটিতে না পারে সে দিকে শিক্ষক শিক্ষিকাকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচালনা করিতে হইবে। শিশুদের মনের এই অনুকরণপ্রিয়তাকে এমন সযত্ন সতর্কতার সহিত চালনা করিতে হইবে যাহাতে তাহারা অনুকরণের দাস হইয়া না পড়ে; বরং এই অনুকরণবৃত্তিকে নিজ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া প্রতিভার সুউচ্চ শিখরে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হয়। শিশুমনের এই অনুকরণবৃত্তিকে লৌষ্ঠবময় ও সার্থক করিবার একদিকে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ, অপরদিকে তেমনি শিশুর প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণের মনস্তত্ত্বের উপর গভীর দায়িত্ব রহিয়াছে।

———

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণা করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৮৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, বর্তমানে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য শ্রীনির্মল কুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আগামী ১লা আগষ্ট কার্যভার গ্রহণ করিবেন। আশা করি তাঁহার কার্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব দিকে উন্নতি হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিজের, ইহার জন্য দরদ তো তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। বাহিরের অভিজ্ঞতা ও অন্তরের সহানুভূতি লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে ফল অবশ্যই শুভ হইবে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীগণ, অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সকলের সহযোগিতা তিনি নিজগুণে অর্জন করিবেন। তাঁহার কর্মকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ হউক ইহাই আমাদের কামনা!

শ্রীশিক্ষায়তন

মফস্বলে অবস্থিত মাড়োয়ারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একটি শাখা দক্ষিণ কলিকাতায় আজ দুই তিন বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান অধ্যয়নলিপ্সু ছাত্রীদের অভাব আংশিকভাবে পূরণ করিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ কলিকাতার শাখাটির নাম হইয়াছে শ্রীশিক্ষায়তন। সম্প্রতি এই উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি কলেজ খোলা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্রীদের সংখ্যা এখনও খুব বেশি হয় নাই, কিন্তু যেরূপ বাড়িয়া বাড়িয়া অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে ফল ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশিক্ষায়তনের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, খ্যাতনামা শাস্ত্রবিদ্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। মঙ্গলাচরণের পর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, শ্রীশিক্ষায়তনের শ্রী এই কলেজের ছাত্রীদের উপরই নির্ভর করিবে। এই শিক্ষায়তন যেন ছাত্রীদের

শরীর ও মনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করে। ইহার উদ্দেশ্য যেন মুখ্যতঃ চরিত্রগঠন হয়। এখানকার মেয়েদের সহবৎ শিক্ষা ও আচার আচরণের মধ্যে যেন বিশিষ্টতা থাকে। এখানে সহশিক্ষা থাকিবে না। ছেলে মেয়েদের শিক্ষার এই সময়ে ব্রহ্মচর্য পালন করা কর্তব্য, তাহাতেই বিদ্যাও আয়ত্ত হয়, চরিত্রও গঠিত হয়। কিছু বৈশিষ্ট্য না থাকিলে কেবল স্থান-সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে দশবিশটা কলেজ খুলিলেও দেশের প্রকৃত অভাব মোচন হইবে না। কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকগণ যদি একপ্রাণ হইয়া এক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া আদর্শ শিক্ষায়তন রচনার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তবেই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনা সার্থক হইবে।

নতুন বি. টি. কলেজ

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গে "শিক্ষিত" অর্থাৎ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। যে কয়টি কলেজে বি. টি. পড়াইবার ব্যবস্থা আছে তাহাতে ট্রেনিং লইতে ইচ্ছুক সকল ছাত্র-ছাত্রীর স্থান হয় না। এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৫—৫৬ সালের মধ্যে হুগলিতে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শুনিতেছি, বর্তমান বর্ষের জুলাই মাস হইতে কলেজের কাজ চালু হইবে। হুগলি মুনিসিপাল শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের গৃহে আপাততঃ কলেজটি বসিবে। সম্প্রতি কেবল কলাবিষয়ের স্নাতকদের শিক্ষণ দেওয়া হইবে। আমরা আশা করি, নূতন কলেজটিতে বহু ছাত্রছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যখন শিক্ষকতা গ্রহণ করিবে, তখন উন্নততর প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ের এক নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে।

সিটি কলেজের নূতন পরিকল্পনা

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম কলিকাতার সিটি কলেজে ছাত্রদের পাঠ্য তালিকার মধ্যে বর্তমান বর্ষে শিক্ষণ-বিদ্যাকে একটি নূতন বিষয়রূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বি, এ অনার্সে ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ের মত শিক্ষণবিদ্যাকেও অন্যতম বিষয় রূপে নেওয়া যাইবে।

যাদবপুরে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ

যাদবপুরে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং আমরা শুনিতেছি রাজ্য বিধান সভার আগামী অধিবেশনে তাহা পেশ করা হইবে। এক হাজার হইতে দেড় হাজার ছাত্রের জন্য যাদবপুর এলাকায় একটি নূতন কলেজ স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন অনুমোদিত কলেজ থাকিবে না তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে কতগুলি ফ্যাকাল্টি থাকিবে। কলা ও বিজ্ঞানে স্নাতক কোর্সের তিন বৎসরের জন্য বিশেষ সিলেবাসও প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৫৬ সনের জুন মাসে কলা ও বিজ্ঞানে স্নাতক পরীক্ষার জন্য নূতন কলেজ খোলা হইবে। এই নূতন কলেজ ব্যতীত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যাদবপুর পলিটেকনিক ও স্কুল অফ প্রিন্টিং টেকনোলজি এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

এই সব পরিকল্পনার জন্য স্থানের প্রয়োজন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাছে ১৭২ বিঘা জমি চাওয়া হইয়াছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের অনুরোধ কর্পোরেশন আশা করি রক্ষা করিবেন এবং অবিলম্বে এই সব পরিকল্পনা কাজে পরিণত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার নূতন বোর্ড

আমরা পরম্পরায় শুনিতেছি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার শীঘ্রই একটি নূতন

বোর্ড গঠন করিবেন। মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিলেও তাহা পশ্চিমবঙ্গে কি ভাবে কার্যকরী করা যায় তাহা এতদিন বিবেচনার বিষয় ছিল। শুনা যাইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক যাহাতে বোর্ডে রীতিমত ভাবে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইতেছে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি সুসংবদ্ধ কার্যকরী বোর্ড গঠনের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনাধীন আছে।

এই সুপারিশে বলা হইয়াছে যে বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হইবেন একজন সরকারী কর্মচারী এবং পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকিবে। বোর্ড প্রধানতঃ উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবে আমরা একথাও শুনিয়াছি যে একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট করিয়া তাঁহার উপর কোন কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রদানের কথাও নাকি সরকার বিবেচনা করিতেছেন। যাহাই হউক, মীমাংসাটি শীঘ্র হইয়া গেলেই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর হয়।

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে মূল নীতি

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিকল্পনাকে আরও স্পষ্ট রূপ দিয়াছেন। তাঁহাদের স্থায়ী সমিতি (ডাঃ জাকির হোসেন, খাজা সাহেব কালেলকার, অবিনাশলিঙ্গম চেট্টি প্রমুখ মনীষি লইয়া গঠিত) স্থির করিয়াছেন যে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালকবালিকার জন্য সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা থাকিবে না।

তাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষায় এই রূপান্তরের প্রভাব শিক্ষার মূলনীতির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যেও যাহাতে স্থায়ী হয় তাহা দেখিতে হইবে, এবং ইহারও যেন ১০বৎসর বুনিয়াদি শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা-কালে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবেনা, মাধ্যমিক শিক্ষা-কালেও অনুসরণ করিতে হইবে।

আবাদী কংগ্রেসের বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক, শিক্ষায় এই অগ্রগতি আশা ও আনন্দের কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সম্প্রসারণ

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার বিভাগগুলি সহরের চারিটি স্থানে ছড়ানো এবং সেই চারিটি স্থানের প্রত্যেকটিতেই স্থানাভাব। গবেষণার ও বিজ্ঞানপাঠে ইচ্ছুক আরও হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিন শতকে গত বৎসর ভর্তি করা সম্ভব হয়। ভালো অনার্স লইয়া পাশ করিলেও অনেকের ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় নাই। শুনিতেছি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা ও বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভে উৎসুক এই বহুসংখ্যক ছাত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিজ্ঞান কলেজের সংশ্লিষ্ট পনেরো বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া একটি ত্রিতলা গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করিতেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে এজন্য এক-কালীন বিশেষ সাহায্য হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা চাহিতে হইবে বলিয়া প্রকাশ। উপযুক্ত অর্থসাহায্য লাভ করিয়া এই বিভাগটি সম্প্রসারিত হউক ও দেশে বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি হউক।

বিদ্যালয় পরিদর্শন

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রধান কর্তব্য কি এ নিয়ে নিজের মনকে অনেক দিন বিব্রত করেছি। কর্মজীবনে প্রায় ছেষ-রেখা টেনে আসার দিন এসে গেছে। বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে কি করার ছিল, কতটুকু করতে পেরেছি এ প্রশ্ন যেন আজ মনকে বড় পীড়িত করে তুলেছে।

আমার এ রচনায় বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিবরণী থাকবে। আমার নিজের মনে যে প্রশ্নগুলো জেগেছে—সেগুলোও হয়তো এখানে উঠে পড়বে। ব্যক্তিগত কোনও কিছু উল্লেখের জন্য পূর্বেই ত্রুটি মার্জনা করি।

কবিগুরু মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বাড়ী 'দামিন্যা' বিদ্যালয় পরিদর্শন দিয়ে সুরু করি।

শ্রাবণ মাসে দামিন্যা বিদ্যালয়ের সম্পাদক চণ্ডীবাবু অফিসে এসে দেখা করেন। তাঁর অনুরোধ, যে কোনও প্রকারেই হউক তাঁর বিদ্যালয় পরিদর্শন করে—মন্তব্য যেন উপর অফিসে পাঠান হয়। তাঁদের বিদ্যালয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মান রয়েছে—সপ্তম মান ও অষ্টম মান খুলবেন। কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরি পাওয়া প্রয়োজন।

আমি বলেছিলাম, "খরস্রোতা দামোদর—এখন তার পূর্ণবেগে চলেছে। নদীর ওপারে যাওয়াই কষ্ট—তারপর একবার ওপারে গেলে এপারে আসাও কষ্ট। নদীতে বান এলে পারাপার বন্ধ হয়ে যাবে। তখন এপারে ওপারের কোনও সম্পর্ক থাকবেনা।"

চণ্ডীবাবু বল্লেন—"সে ভাবনা আমার। আপনাকে যেতে হবে, পারাপারের বিষয় আমি দেখব।"

অতএব শুভদিনে শুভক্ষণে শুভচণ্ডীর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। প্রথম ১৮ মাইল রেলগাড়ী তারপর ১৬ মাইল বাস—তারপর দামোদর নৌকা-যোগে—কতদূর জানিনে।

নৌকায় নদীর ঝিরঝিরে বাতাসে প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে গেল। এপার ওপারের তফাৎ বেশী নয় কিন্তু দামোদরের খরস্রোত রীতিমত ভীতিজনক। শুনেছিলাম—ঘূর্ণিতে পড়ে গেলে রক্ষা পাওয়া রীতিমত কষ্ট।

নদী দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। এবার সামার পালা। হেঁটে যেতে হবে মাইল ছয়—নদী নালা খাল বিল পেরিয়ে।

মাঝী বারবার বলতে লাগলেন, "স্যার আপনার কষ্ট হবে। অভ্যাস তো নেই।"

আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে আমি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী; জলকাদায়ই মানুষ। আমার মনে বরং বেশ আনন্দই হচ্ছে।

জুতোজোড়া হাতে—প্যান্টটি আঁট করে অগ্রসর হচ্ছি। গ্রামের নিকট পৌঁছে গিয়ে দেখি—গ্রামে ঢোকার পথ রুদ্ধ, কতকটা পরিখার মত গ্রামের চারদিকে ঘিরে রয়েছে। এ জলটা পার না হলে গ্রামে যাওয়া যাবেনা। অতএব আবার হাঁতড়ে প্যান্ট ভিজিয়ে কতকটা নাস্তানাবুদ হয়ে ওপারে পৌঁছা গেল। সঙ্গের থলে হতে আর একটা প্যান্ট বের করতে করতে প্রশ্ন করি—"আপনাদের এ বিদ্যালয়ে কতদূর হতে ছেলে আসে?" উত্তর শুনি—"দুতিন মাইল তো হবেই। দশ হতে ষোল বছরের ছেলেরা এ বিদ্যালয়ে পড়ে। প্রতিদিন এরকম কষ্ট করেই আসতে হয় ওদের। তবুও তো আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের মঞ্জুরি পাইনে। এত

কষ্ট করতে হয় বলেই ছেলেরা লেখাপড়ায় প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। আমাদের পাঁয়ে বছরে অন্তত ছয় মাস এরকম দামোদরের জল ঢুকে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন না বাড়ীগুলো কি রকম উঁচু লেভেলে করা হয়েছে।"

সংগ্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। দামোদর বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল—এ সমস্ত স্থানে শিক্ষার আলোর বিন্দুমাত্রও বিচ্ছুরণ দেখতে হলে কত কষ্ট করতে হয়। দেশের শিক্ষা পেছনে পড়ে রয়েছে— এর মূলে উপযুক্ত পথঘাটের অভাব একটা উপেক্ষণীয় কারণ নয়।

অবশেষে বিদ্যালয়ে পৌঁছা গেল। বেলা তখন ১২॥ টা।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন—কিছু জলযোগের জন্য। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম সত্য—কিন্তু জলযোগের নামে আতঙ্ক উপস্থিত হল। পল্লীগ্রামে বিশিষ্ট পরিদর্শক গেলে জলযোগের নামে যা করা হয়—তা রীতিমত বিয়েবাড়ীর বরযাত্রের জলখাবার। খেয়ে কাজ করা কষ্ট। আর খেতে গেলে যে সময়টুকু নষ্ট হবে তার মূল্য এক্ষেত্রে কম নয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে—বিদ্যালয়ের হিসাব কিতাব দেখা, শিক্ষকদের যান নির্বাচন করা। এ সময়টা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত চিত্তে অপেক্ষা করেন—দুই চারটি কথা বলে পরিদর্শক প্রভুর যেভাবটি মাঝে পরীক্ষা করতে থাকেন। দুইজন লোক হাতে পাখা নিয়ে এগিয়ে এলেন—"স্যার একেবারে ঘেমে গেছেন—কি কষ্ট হয়েছে।" আমার সম্মুখে তখন হিসাবের খাতা। পাখা দিয়ে বাতাস সুরু করার পূর্বেই বলি—"আমি তো এমনি কীণকায়—আপনাদের জানালা দিয়েও যথেষ্ট বাতাস আসছে। সবচেয়ে বড় কথা আমার বাড়ীতেও আমি কারো হাতে পাখার বাতাস খেতে রাজী নই। আমি মনে করি প্রত্যেকের নিজের কাজ নিজেরই করা ভাল। পাখা রেখে দিন—আমি নিজেই প্রয়োজন মত বাতাস করে নেব।"

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা রীতি মত ক্ষুণ্ণ হলেন।

হিসাবের ভিতরে কোনও গোলমাল ছিল না, কিন্তু ঘণ্টা তাতেই কেটে গেল। এ প্রসঙ্গে আমার মনে দুটো প্রশ্ন জেগেছিল। একটা হচ্ছে—সত্যি সত্যি ঘণ্টা হিসাব নিয়ে আমার মাথা-ব্যথার কতটুকু প্রয়োজন ছিল? মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড হুকুম দিয়েছে—সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের হিসাবই—সনদপ্রাপ্ত হিসাবপরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। আমরা কি চার্টার্ড একাউন্টেন্টের চেয়ে ভাল হিসাব দেখতে পারি? এর সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নটাও বারবার মনে জেগেছে—"আমি বিদ্যালয় পরিদর্শক—আমার প্রধান কাজ বোধ হয় অধ্যাপনা দেখা এবং দেখানো। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা।" আমাদের সহকর্মীদের অনেকের মুখেই শুনেছি—এ হিসাব পরীক্ষাটির কাজেই পরিদর্শকগণের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। ওঁরা এতে এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন যে শ্রেণীর অধ্যাপনা দেখার ও দেখানোর নামে বড় জোর ২০ মিনিট সময় কাটান। আমি এর মনস্তত্ত্বও অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছি। টাকা পয়সার, হিসাবের গলদ—একটা প্রতিষ্ঠান তন্ন তন্ন করে খুঁজলে কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই। আর, কোনও প্রকারে যদি কারও ত্রুটির বিন্দুমাত্রও ধরা যায়—তাতে সে অহীনস্থ লোকটি একেবারে চিরদিনের জন্য কুপোকাত। অতএব পরিদর্শকগণের প্রধান লক্ষ্য থাকে এদিকেই—যাতে ত্রুটি ধরা যায়। তাতে তাঁদের 'প্রেস্টিজ' বাড়ে।

এবার শ্রেণী পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ি। অষ্টম শ্রেণীতে প্রবেশ করি। শিক্ষক মহাশয়ের টেবিলের উপর একখণ্ড ছিন্নবস্ত্র—উহার নাম নাকি 'ডাষ্টার।' সম্পাদক মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন। তিনি অফিস ঘর হতে আসল ডাষ্টার এনে দেখালেন। শিক্ষক

মহাশয় বলেন—তাড়াতাড়িতে ভাল ডাষ্টার আনা হয়নি। কিন্তু ডাষ্টারটি এত ছিন্ন হয়ে গেল কেন—ও'র সদুত্তর পাইনি।

সাধারণত আমি শ্রেণীতে ঢুকেই—ছাত্রদের কাছ থেকে খাতা গুলো চেয়ে নেই। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম করিনি।

পাড়া-গাঁয়ের খাতা-পত্র সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট কয়েকটা ধারণা হয়ে গেছে—

এরা খাতা পত্রের প্রতি কোনও যত্নই নেয় না। সাধারণত একখানা খাতা দিয়েই সমস্ত বিষয়ের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন খাতার পয়সা বা কাগজ অর্থাপিকত অপব্যয়কর মনে করেন না। খাতাগুলির মধ্যে মুলক্রমেও মার্জিন লাইনের বালাই নেই। আর খাতার শুদ্ধি যদৃচ্ছ ভাবেই চলে। আমি অনেক বিদ্যালয়েই দেখেছি—খাতার যাবখানে শিক্ষক-মহাশয় তাঁর একটা দাঁতবিচুনি-ওয়ালা ভোঁতা পেন্সিলের দন্তক্ষত দিয়েই তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেছেন মনে করেন। শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে এসম্বন্ধে লালকালি, মার্জিন, খাতার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে—মার্জিনের মধ্যেই দস্তক্ষত রাখার বিষয়ে এবং গৃহকার্য (Home task) দেওয়ার বিষয়ে আলাপ করেছি। আমি দেখেছি—তাঁরা যেন তাঁদের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়েই সমস্ত খণ্ডন করতে চান। শিক্ষার ভিত্তি যে ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান উচিত একথাটা তাঁরা কিছুতেই মানতে রাজী নন। পাড়াগাঁয়ের বিদ্যালয়ে—খাতা পত্রের এ উদাসীনতা আমার মনকে বড় পীড়িত করেছে। অতীতে ভাল ছাত্র বেরিয়ে গেছে—এ অজুহাত কি শিক্ষকের দায়িত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি করা যায়? এবার পড়ানোর কথায় আসি।

শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন—'রেখো মা, দাসেরে মনে'—কয়েকটি ছাত্রকে পড়তে বলা হল। ছেলেরা বই দেখেই পড়লে—কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি কোনও সম্মান সে পাঠরীতির মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নেই। কবিতা পড়ানোর সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষকের কোনও ধারণাই নেই। তাছাড়া পড়ানোটা যাতে আরও ভাল হয় তার জন্য কোনও চেষ্টাও নেই। বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক মহাশয়দের যখন দেখেছি অত্যন্ত সংকীর্ণ জ্ঞান নিয়ে পাঠ প্রদানের চেষ্টা করেন—তখন নিজেকেই এর জন্য দায়ী মনে করেছি, কেননা আমরাই তো এদের উপযুক্ত বেতনের বন্দোবস্ত করতে পারিনি—আর এদের মনের ক্ষুধা মেটাবার উপযুক্ত পুস্তকও বিদ্যালয়ে সরবরাহ করতে পারিনি। হয়তো অতীতে এই শিক্ষকই ছিলেন স্কুল বা কলেজের সেরা ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তারপর বহুবৎসর চলে গেছে—দুর্ভিক্ষ, অভাব, মহামারির তিক্ত দিয়ে—মরচে পড়ে গেছে সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডারে। আমরা এর মধ্যে বিদ্যালয়ে পড়াবার উপযুক্ত বই কেন, সামান্য দৈনিক সংবাদ পত্রও পর্যন্ত সরবরাহ করতে পারিনি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার লক্ষ্য করলে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,যে যৎসামান্য পুস্তক আছে, তাহা কেবল মাত্র ছাত্রদের জন্যই। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পুস্তক যদিই বা ভাগ্যক্রমে দুচারখানা জোটে তবে সেটা হবে সাধারণত হালকা ধরণের উপন্যাস, নয়তো গুরুগম্ভীর - শাস্ত্র ব্যাখ্যা। বিদ্যালয়ে পুরোহিতদর্পন দেখেছি। আবার 'বিয়ের রাতে' ধরণের পুস্তকও দেখেছি। শিক্ষকদের জন্য যে গ্রন্থাগারে পুস্তক রাখা দরকার—এ সত্যটা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আদৌ মানতে রাজি নন। আজ এ পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গ যদি পাঠক পাঠিকাদের রুচিতে না বাধে—তবে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

———

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রস্তাবিত সংস্কারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার। এদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বয়স ৭ হইতে ১৪ অবধি রাখাই সঙ্গত। সাত বৎসরের পূর্বে গ্রামাঞ্চলের বালক বালিকার বিদ্যালয়ে আসা দুষ্কর হইবে। চৌদ্দ বৎসরের পর একদিকে যেমন বালিকারা বিবাহ যোগ্যা হওয়ায় তাহাদের স্কুলে রাখিতে সাধারণত রক্ষণশীল গ্রামের অনেক পিতামাতার আপত্তি হইতে পারে, তেমনি অনেক পুত্রের পিতা পুত্রকে ঐ বয়সে অর্থকরী কার্যে নিয়োজিত করিবেন। হিসাব করিলে দেখা যাইবে, এইরূপে ছয় কোটি বালক বালিকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। ইহা বর্তমানে যত ছাত্র প্রাথমিক শ্রেণী গুলিতে পড়ে, তাহার তিনগুণেরও অধিক। পড়াশুনার সুবিধার জন্য প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ধরিয়া প্রতি কক্ষে গড় পড়তায় ৩০ জন ছাত্রের পাঠ সম্ভব। অর্থাৎ বিশ লক্ষ প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষক আবশ্যক। ১৯৪১ সালে ভারতে ৫৩১৪৬৭ জন প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে হয়ত ছয় লক্ষ শিক্ষক হইতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে চৌদ্দ লক্ষ শিক্ষক সৃষ্টি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবে আমরা যদি প্রাতঃকালে তিন ঘণ্টা ও অপরাহ্নে ৩ ঘণ্টা করিয়া স্কুল রাখি ও এক-জন শিক্ষককে অল্প বেতন দিয়া মোট ছয় ঘণ্টা পড়াইবার বন্দোবস্ত করি, তবে প্রত্যেক শিক্ষক প্রাতঃকালে ত্রিশ ও বৈকালে ত্রিশ মোট ৬০ জন ছাত্র পড়াইবেন। তবে দশ লক্ষ শিক্ষকের দ্বারা কাজ চলিতে পারে। এ উপায়ে ছাত্রদের অনেক সময় বাঁচিবে, এই সময় তাহাদের পিতা মাতার সাহায্য কার্যে ব্যয় করিলে শিক্ষার প্রতি অশিক্ষিত সমাজের যে বিরাগ ও ভয় আছে তাহা যেমন দূর হইবে অপরদিকে দশ লক্ষ শিক্ষককে গড়পড়তা ৮০৲ বেতন (৬০-১০০৲ স্কেলে) দিয়াও আমাদের বাৎসরিক খরচা শিক্ষকের বেতন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, পাঠন সামগ্রী ইত্যাদির জন্য—১২০ কোটি টাকা আন্দাজ পড়িবে। ইহা বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় হয় তাহা হইতে ৮০ কোটি টাকা অধিক। প্রাথমিক শিক্ষার সময়-সঙ্কোচে আমাদের প্রতি পিরিয়ড্ ২৫ মিনিটের করিয়া চারি পিরিয়ড্ পুস্তক দিয়া ও তিন পিরিয়ড্ প্রতিদিন হস্তশিল্পে প্রদান করিলে ও মুনিয়াদী মতে শিক্ষা দিলে পাঠনের সময়সঙ্কোচ লাভজনকই হইবে, কারণ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে ত্রিশ মিনিটের পিরিয়ড্ অতি দীর্ঘ।

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ছয় ঘণ্টা পরিশ্রমের পর কোন প্রাথমিক শিক্ষক এই শিক্ষায় তার মনকে সমর্থ হইবেন না। ছোট ছেলে-দের পড়ানোর রীতি ও বয়স্কদের পড়ানোর রীতি বিভিন্ন। বয়স্কদের শিক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব। Sargent সাহেব তো বয়স্কদের জন্য ১০০ ঘণ্টা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন! তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। যদি আমরা ইহাকে বাড়াইয়া ৩০০ ঘণ্টা করি তবে হয়ত অক্ষরপরিচয় ও আঙ্কজ্ঞানের পর নাগরিক শাস্ত্রের মূল সূত্র ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কিছু আবশ্যকীয় তথ্যও শিক্ষা দিতে পারিব। বয়স্ক লোকেরা প্রত্যহ এক ঘণ্টার অধিক পাঠন কার্যে ব্যয় করিতে অসমর্থ হইবেন। সে কারণ একজন শিক্ষক একসঙ্গে ছয় দলে ২১০ জন বয়স্ককে শিক্ষা দিতে পারেন (প্রতি দল ৩৫ জন

বহিলে)। তবে বয়স্কদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার চর্চা রাখিবার জন্য লাইব্রেরীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যত বেশি ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইবে, ততই লাইব্রেরীর চাহিদা বাড়িবে। অপর পক্ষে সকলের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, শিক্ষক বেকার হইয়া পড়িবেন। এই উভয় সঙ্কট দূরীকরণের নিমিত্ত যদি আমরা শিক্ষকদেরই লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করি ও প্রথম বৎসরের পর তাঁহার পাঠন ঘণ্টার সময় ক্রমশ কমাইয়া লাইব্রেরীর সময় বাড়াইতে থাকি, তবে একদিকে যেমন তাঁহার বেকার হইবার সম্ভাবনা রোধ হইবে, অপর দিকে তেমনি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী রাখিতে সামর্থ্য হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, শিক্ষক প্রথমে বর্ষে ছয় ঘণ্টায় ২১০ জন ছাত্র পড়াইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে পাঁচঘণ্টায় ১৭৫ জন পড়াইয়া এক ঘণ্টা লাইব্রেরীর কাজ করিবেন। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বর্ষে চারি ঘণ্টায় ১৪০ জন পড়াইয়া দুই ঘণ্টা লাইব্রেরীর কাজ করিবেন। সপ্তম হইতে দশম বর্ষে তিন ঘণ্টায় ১০৫ জন পড়াইয়া তিন ঘণ্টায় লাইব্রেরীর কাজ করিবেন। একাদশ হইতে চৌদ্দ বর্ষে দুইঘণ্টায় ৭০ জন পড়াইয়া ৪ ঘণ্টা লাইব্রেরীর কাজ করিবেন, পনেরো হইতে কুড়ি বর্ষ এক ঘণ্টায় ৩৫ জন পড়াইয়া পাঁচ ঘণ্টা লাইব্রেরীর কাজ করিবেন ও তাহার পর সমস্ত সময় লাইব্রেরীতে দিবেন। এইরূপে এক একজন শিক্ষক কুড়ি বৎসরে ২১০০ ছাত্র পড়াইতে পারিবেন। সমগ্র ভারতে সাড়ে দশ কোটি ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্ক নিরক্ষর পুরুষ পাওয়া যাইবে। যদি স্ত্রীশিক্ষায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা হইতে আপাতত বিরত হই (কারণ শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব) তাহা হইলেও পাঁচ লক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন ও তাহাদের বেতন ইত্যাদিতে বৎসরে আট কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বিশ বৎসর পরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের ফলে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের মধ্যে নিরক্ষরতা অনেক অংশে দূর হইবে, শিক্ষিকাও পাওয়া যাইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। ছয় কোটি ছাত্র সাত বৎসর পড়িলে সপ্তম বর্ষের ছাত্র সংখ্যা মোটামুটি ৭৫ বা ৮০ লক্ষ হইবে। ইহার অষ্টমাংশ যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তবে অন্তত দশ লক্ষ প্রতি বর্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বারো বৎসর ধরিলে মাধ্যমিক শ্রেণীর ভাগে পাঁচ বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্র পড়িবে। সকলেই কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা লইবে না। যদি তিন লক্ষ ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য যায়, (সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার প্রতি ১২০০ লোকের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কমও নহে বেশিও নহে) তবে উচ্চ শিক্ষার ছাত্র সংখ্যা ঠিক মত রাখিতে বৎসরে এক লক্ষ অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে পাঁচ লক্ষ ছাত্রই যথেষ্ট। অকৃতকার্যতা ইত্যাদির জন্য কিছু হাতে রাখিলেও সাত বা আট লক্ষ ছাত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা এরূপ হওয়া উচিৎ যাহা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া কাজে লাগিবে। মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষায় প্রতি ছাত্র অন্তত ছয় ঘণ্টা ব্যয় করিবে। এবং ইহাতে নানারূপ বৈত্তিক বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে। ইহার বন্দোবস্ত করিতে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত ১:১৬ র অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব ৪০,০০০ শিক্ষকের আবশ্যক। তাহার মধ্যে অর্ধেক উচ্চ শ্রেণীর অর্থাৎ ১৮০-৩০০ টাকা ও অপর অর্ধেক নিম্নশ্রেণীর, অর্থাৎ ১২০-২০০ টাকা বেতনের অধিকারী হইবেন। সমগ্র ব্যয় সাড়ে বারো কোটি টাকা পড়িবে (গড়পড়তা ২৫০৲ ও ১৬০৲ উভয় শ্রেণীর শিক্ষকের জন্য ধরিলে প্রতি ৪০০ ছাত্রের হিসাবে একটি বিদ্যালয় ও প্রতি বিদ্যালয়ে এক একজন প্রধান শিক্ষক (৩০০-৪০০৲ গড় পড়তা ৩৫০৲) এক একজন কেরানী (৬০-

১০২ গড়পড়তা ৮০৲) ও তিন জন মৃত্য (৩০-৪০ গড়পড়তা-৪০৲) ধরিয়া ও বিদ্যালয়ের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি ধরিলে পনের কোটি টাকা ব্যয় অর্থাৎ সর্বসমেত প্রাদেশিক সরকারের দেয় ১৯৫ কোটি টাকা বৎসরে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে ৬১ কোটির স্থলে এই ১৩৪ কোটি অতিরিক্ত ব্যয় ও বিদ্যালয়গুলি স্থাপনে কম পক্ষে ইহার দ্বিগুণ ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইলে ভূমি রাজস্ব বড়াইতে হইবে। এবং ইনকাম ট্যাক্সের ভার বাড়ান ও অন্যান্য বিভাগে ব্যয় সংকোচ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহার দ্বারা আমরা প্রত্যেক ৭-১৩ বয়সের, ১৫-৪৫ প্রত্যেক নিরক্ষর পুরুষের ও ১৩-১৯ জন বিশেষ নির্বাচিত ছাত্রের অবৈতনিক অথচ পর্যাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

১

পাঠে ছেলেদের পরিচালনা

সুধীরচন্দ্র রায়।

পুরনো ইস্কুলের পড়ানো-পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি ছিল, সে কথা অনস্বীকার্য। একটি ত্রুটির কথা তো স্পষ্টই মনে পড়ে। অষ্টম শ্রেণীর আগে পাঠ্য কবিতার লেখকের নামটি আমরা আগ্রহভরে দেখে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। এমন কি পাঠশালা থেকে পড়ে পড়ে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কবি, তাঁর সম্বন্ধে যে কিছু জানতে হয় তা সপ্তম শ্রেণী না ডিঙিয়ে বুঝতে অনেকেই পারিনি। অথচ কবিতার মর্মার্থ লিখেছি, মোহিনী দেখে 'বিশ-বি-ক্তি' প্রভৃতি পদ-পরিচয় ঠিক ঠিক মতো করে নিয়েছি।

ইস্কুলের শিক্ষার এই ত্রুটিকে আজকালকার শিক্ষণ-শিক্ষক নিন্দা যে করবেন এবং করা উচিত তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু নিন্দার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চিন্তা আসা উচিত, আমরা সে ত্রুটি কত খানি সংশোধন করতে পেরেছি।

একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত ধরা যাক। বর্তমান পাঠ পরিক্রমায় দ্রুত-পঠন বলে কোন কোন বিষয়ে অতিরিক্ত পুস্তক আছে। কিন্তু দ্রুত পঠনের রীতিটি কি আমরা সকলেই অনুসরণ করি? আর্থিক-অনুবিধার দরুণ আমরা শিক্ষকেরা এ বিষয়ে মন দেই না, সে যুক্তি কিন্তু সত্য নয়। কারণ, দ্রুত-পঠনের উদ্দেশ্যটি আমরা ঠিকমতো অনুধাবন করিনি। শিক্ষকেরা তো অনুধাবন করেনইনি, পাঠ্য-তালিকা রচয়িতারাও অনুধাবন করেন না।

আমাদের দেশের শিক্ষাজগৎ ইংরেজকর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত। তাই পরীক্ষার মারফৎ আমরা শিক্ষণ-পদ্ধতিকে এখনও নিয়ন্ত্রণ করছি। দ্রুতপঠনে সেই পরীক্ষা-রীতিই কতটুকু আছে দেখা যাক। দ্রুতপঠন-পুস্তক থেকে সাধারণত গদ্যের বা প্রবন্ধের সারাংশ প্রশ্নপত্রে চাওয়া হয়। ব্যাখ্যা থাকে না, শব্দার্থ থাকে না। প্রধান পাঠ্যপুস্তক থেকে দ্রুত-পঠন-পুস্তকের ঐটুকুমাত্র পার্থক্য। কাজেই, শিক্ষকেরাও বুঝে নিয়েছেন, তাঁদের কর্তব্য কি। ঐ সারাংশ লেখানো। তা হলে দ্রুতপঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, (ক) ছেলেদের সংক্ষিপ্তকরণ শেখানো, (খ) আর-একটু বেশি পড়ানো (গ) এবং, যাহাতে সংক্ষিপ্তকরণ একটু সহজে আয়ত্ত হয়, তাই পরীক্ষাকে একটু সহজ করা।

সন্ন্যাসী যে চোর একথা আমরা হলফ করে

বলতে চাইনে, কিন্তু দ্রব্য তাঁর কাছে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ দ্রুতপঠনের উদ্দেশ্য যে উপরোক্ত নির্দেশগুলি তা 'তিন মাত্রি' করে না বলতে পারলেও, ফলশ্রুতিতে এইরূপই পাওয়া গেল। 'আরও বই পড়' এই উদ্দেশ্য কিন্তু দ্রুত পাঠ্যতালিকা রচনার গোড়ার দিকে ছিল না। উপরে যে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বিশ্লেষণ করেছি, তার প্রথম দুটি যে সাধারণ পাঠ্যক্রম থেকেই সবাবা কথা যায় সেকথা বলাই বাহুল্য। পরীক্ষা-পদ্ধতিতে তৃতীয় অংশটি গেল যে সুস্থতা নয় তাও আমরা জানি।

এই প্রবন্ধ দ্রুত-পঠন পুস্তকের উদ্দেশ্য নিরূপণ করবার জন্যে নয়। শিক্ষণ ও পাঠনার রীতিতে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী সন্নিবিষ্ট করার আগ্রহ যে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম, অথচ ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছি সেই দুর্ঘটনারই একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছি দ্রুতপঠন পুস্তকের বার্থ শিক্ষণ। অতএব শিক্ষাবিজ্ঞানের সেই আধুনিক নীতির কথাই এইবার বলা যাক।

ইস্কুলের পড়ানোর পুরনো রীতিতে দেখা গেছে, ছেলেরা কতগুলো সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠ্য অংশ থেকে শব্দের অর্থ শেখে, শিক্ষক বা অর্থপুস্তকের নির্দেশ মতো কোন অংশের ব্যাখ্যা করতে শেখে। লেখাপড়ার অর্থ ছিল জ্ঞান-রাজ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণটুকু আয়ত্ত করা। এই আয়ত্তীকরণ তাদের ঘটত পরনির্ভর হয়ে শিক্ষকের উপর নির্ভর করে কিংবা সহায়ক গ্রন্থ থেকে। পড়াশোনার মধ্যে এই যে হিসাব-নিকাশ এই ব্যাপারটি এমন হয়ে দাঁড়াল যে পড়াশোনায় আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা বয়স বাড়ে বই দেখলেই তাদের 'পিত্তি চটে' যেতে থাকে। ইস্কুলের ছেলে-মেয়ে যখন নাগরিক হল তখন হয়ত বা কেউ গল্প উপন্যাস পড়বার অভ্যাস বজায় রাখল, কিন্তু কবিতা বা প্রবন্ধকে তারা পাগলা-ঘোড়ার লাথির মতোই মনে করতে থাকে। সেই যে গল্পটি আছে, বাবা ছেলে গেছে তাদের বাঘের সঙ্গে ভেট করতে। বাঘ রাজা, তাই আত্মীয় হলেও কুর্নিশ করতে হয়। ছেলে মেজে মাড়িয়ে তাকে কুর্নিশ করল। বাঘ মশাই খপ্ করে ছেলে চেপে ধরে টানতে থাকেন। বাবা ছেলে বলে 'এ কী রীতি তাদের', তাতে বলেন, আরে বাবা এই তো নিয়ম।

ছেলেরাও এই নিয়মের জন্যে ইস্কুল পালায়, শিক্ষক-কে মনে করে যমদূত, পরীক্ষাকে মনে করে লটারী। পড়ানোর মধ্য দিয়ে এমন কোন্ নিয়ম অনুসরণ করলে মনের এই অসুস্থতা দূরীভূত করা যায়? শিক্ষাবিদেরা ভেবে ভেবে গবেষণা করে স্থির করলেন, (ক) পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে হবে, (খ) পাঠের অভ্যাস তৈরি করাতে হবে (গ) পড়া যে মজার বিষয় ছেলেদের চরিত্রে এই প্রতিভাস সৃষ্টি করতে হবে, (ঘ) পাঠ-করা উদ্দেশ্য-ধর্মী হওয়া চাই।

কিন্তু এই চারটি অংশ মানবার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন আছে, পাঠ অভ্যাসের অর্থ-চিন্তনের সবগুলি অংশ সর্বদিক দিয়ে কাজে লাগানো। ১৯০৮ সালে ম্যাকমারী এই রকম একটা বিশ্লেষণে পৌঁছলেন। আর, সেই নীতি ১৯২০ এর আগেই অন্যান্য দেশে মেনে নিল। ইওয়াকাম প্রভৃতি শিক্ষাবিদ ম্যাকমারীর অস্পষ্ট নীতি-কে মূর্ত করে ইস্কুলের কাজে কী ভাবে লাগানো যায় তা স্থির করে দেখলেন, কাজ করার মধ্য দিয়ে যেমন একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য থাকে আর থাকে মনের কর্মনিষ্ঠা, পড়ার মধ্যেও ঠিক তেমনি চরিত্র-সৃষ্টি করতে হবে। পড়াশোনার এই চরিত্রে থাকবে—(১) পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার (২) অভ্যাসিক শিক্ষা (৩) অনুধাবন প্রণালীতে মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার শিক্ষা (৪) সমস্যা-সমাধান করবার শিক্ষা।

কেউ কেউ মনে করলেন, এই সব ব্যাপার ছেলেদের স্বাধীন আর নীরব পাঠের মধ্য দিয়ে সবাবা

হয়। আচরণ বা সংযোগবাদী মনোবিদ্‌দের সেই 'চেষ্টা আর ভুল-করা' নীতির উপর নির্ভর করলেন তাঁরা। সেই যে কথাটি আছে, ছেলেকে মা বললেন, 'পড় তা হ'লেই জানবে'। সেই কথাটি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মানলেন এঁরা।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে অনাবশ্যক সময় নষ্ট হয়। কালক্ষেপণ নিয়ম পড়াশুনার পক্ষে খুব সুবিধার লক্ষণ নয়। সময়কে কমিয়ে আনা ও ভালোপদ্ধতির একটি গুণ। তা ছাড়া এই স্বাধীন আর নীরব পাঠের একটা ত্রুটির দিক নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝি।

কোন এক সময়ে প্রধান শিক্ষক স্থির করলেন—ছেলেদের পড়ায় আগ্রহ বৃদ্ধি করবার জন্য কার্যতালিকার একটি ঘণ্টায় পরিচালনামূলক প্রথাগারে পুস্তক পাঠ অভ্যাসের (Supervised Library Reading) ব্যবস্থা থাকুক। সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। কতগুলি বই স্থির করে নেওয়া হল। সেই বইগুলির থেকে ছেলেরা প্রতিদিন বেছে নিয়ে ক্লাসের মধ্যে নীরবে পড়তে থাকবে। যেখানে আটকাবে সেখানে তারা উপস্থিত শিক্ষকের কাছে থেকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

এ ব্যাপারে সবজান্তা শিক্ষকের দরকার। সৌভাগ্যবশতঃ আমিও এই শিক্ষকের মধ্যে পড়ে গেলাম। সপ্তাহ দুই কাটল। তারপর 'বৌদ্ধ বাবা' হয়ে ক্লাসে বসে থাকা এক নিপীড়ন বলে মনে হতে থাকে। ফলে, বই ভাঙতে থাকি অর্থাৎ কোন্ ছেলে কেমন বই নেয়, কতখানি করে তারা পড়ে, পড়ায় কেমন আনন্দ পায় প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখতে থাকি। মাস কয়েক পরে দেখা গেল, কোন ছেলেই একখানা বই দুদিন নেয় নি। অথচ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা ঐ ঘণ্টাটি কাটায়। খাতায় কিছু কিছু টুকেও নেয়।

ত্রুটিটা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু এর কারণ কি আর তার সংশোধনের উপায়ই বা কি তা তখন বুঝতে পারিনি। সারাঘণ্টা খাটুনির পর একটু বিশ্রাম পাই, ঐটুকুই তখন লোভের বিষয় ছিল, যেমন ছয় মৌসুমে রচনালিপি আর হাতের-লেখার ক্লাসের শিক্ষকের।

এই শিক্ষা-পরিচালনা বিষয়টি তখন বুঝতে পারিনি। আর বুঝতে পারিনি, স্বাধীন পাঠ অর্থ শিক্ষক মাঠে বসে বাঁশী বাজাবেন তা নয়। কি করবেন তবে? দেখে নিতে হবে, এই পড়ার উদ্দেশ্য কি? জোয়েল স্নাফ্-এর বিশ্লেষণ থেকেই কিছু তুলে দিই। তাঁর নির্দেশানুসারে নীচের প্রশ্নের ধারা বেয়ে পড়া পরিচালনা করতে হবে:

(ক) কোন বিশেষ পড়া আরম্ভ করবার আগে এই পড়ায় তোমার কর্তব্য কি ঠিক মতো বুঝতে পেরেছ?

(খ) লিখবার সময় সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করে থাক কি?

(গ) পড়া এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু ঠিক মতো আয়ত্ত করে নাও তো?

(ঘ) বইয়ের মধ্যেকার চিত্র প্রভৃতি ঠিক মতো বুঝতে পার কি?

(ঙ) অধ্যায়ের শেষে পাঠ থেকে স্বাভাবিক ভাবে বিশ্রাম নাও তো?

(চ) পড়বার সময় কিছু কিছু টুকে রাখ কি না?

(ছ) কোন বিষয়ের সূত্র বা পাঠ-বিষয় নীতির সঙ্গে মিলিয়ে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে শেখ কি?

(জ) পড়বার আনুষঙ্গিক যে সব সহায়ক পড়া দরকার তা কর কি?

(ঝ) এই ঘণ্টায় যে সব পাঠ আয়ত্ত করে থাক তা অপর ঘণ্টা-ভেও প্রয়োগ করে থাক কি?

(ঞ) পাঠ্যবিষয় যতক্ষণ না বুঝতে পার

ততক্ষণ বিষয়টি ভেঙে পৃথক ভাবে পড়ে যাও কিনা।

এই দশটি প্রশ্ন শুধু প্রশ্নই নয়, প্রত্যেক পাঠনায় এই প্রশ্ন কয়টি যেন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ঠিক ঠিক মেনে চলা হয়। ছেলেদের এই বিষয়েই পরিচালনা করতে হবে। সে নীরব পাঠই হোক, আর সরব পাঠই হোক; দ্রুত পঠনই হোক, আর আবর্তিক পাঠই হোক।

কিন্তু কেমন ভাবে ছেলেদের কাজ করিয়ে পাঠের এই অভ্যাস তৈরি করানো যায় তার একটু নির্দেশ না দিলে শিক্ষকদের কাছে পদ্ধতিটি ধোঁয়া হয়ে থাকবে। পাঠ-পরিচালনার সময় নীচের নিয়মগুলো ছেলেরা যাতে মেনে চলে তা বলে দিতে হবে।

(১) প্রবন্ধ বা বিষয় বস্তুর নামটি পড়।

(২) অধ্যায়টির সারাংশ কর।

(৩) এমন প্রশ্ন তৈরী কর যার উত্তর ঐ পাঠ্য-অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

(৪) প্রথমে সমস্ত অধ্যায়টিই পড়ে নাও।

(৫) মন লাগিয়ে পড়। অর্থাৎ কোন শব্দার্থ জানতে হবে তাই-ই নয়, পাঠ্য অংশের স্তবক বা অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটি থেকে বুঝতে চেষ্টা কর অনুচ্ছেদের ভেতরে কোন্ বক্তব্য লেখকের পক্ষে বিবৃত করার সম্ভাবনা।

(৬) অধ্যায়টি নিজে নিজে পড়ে বই থেকে চোখ সরিয়ে বক্তব্যগুলি অনুধ্যান করে দেখ ঠিক মনে আছে কিনা।

(৭) দৃষ্টান্ত, তালিকা প্রভৃতি বুঝে দেখ।

(৮) নতুন শব্দগুলি মন দিয়ে দেখ।

(৯) মুখস্থ করো না।

(১০) অলঙ্কার আর বাড়তি কথা বাদ দিয়ে অধ্যায়টি সারাংশটা করে লেখ। বিশেষ বিশেষ বাক্যাংশ, এবং গূঢ়ার্থে দাগ দাও।

(১১) যা পড়লে সে সম্বন্ধে নিজের একটা পরীক্ষা নাও।

এইভাবে ছেলেদের পাঠ পরিচালনা করে পরিশেষে ঐ সব বিষয়ে আর কোথায় কোথায় নির্দেশ পাওয়া যাবে তার একটা হদিস শিক্ষক ছাত্রদের খুঁজিয়ে দেবেন। এই সময়েই গ্রন্থাগার ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন।

এই নিয়মগুলি অনুসরণ করাকেই বলে ছেলেদের পাঠে পরিচালনা করা পদ্ধতি। শিক্ষক যদি এমনি করে পরিচালনা করেন, তবেই ছেলেরা ভবিষ্যতে বড় হয়ে নিজে স্বাধীনভাবে পাঠ করবার অভ্যাস আয়ত্ত করবে।

এই পরিচালনামূলক পাঠের পরিণতি হচ্ছে ছেলেদের পাঠে আগ্রহ-সৃষ্টি, আর পাঠ-অভ্যাস চরিত্র গঠন।

দ্রুত-পঠন পুস্তকেরও এই-ই উদ্দেশ্য। কিন্তু পরীক্ষায় সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বসেছে। বর্তমান লেখকের মনে হয়, দ্রুত-পঠন পুস্তক বিষয়ে বাইরের পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। ঐ বিষয়ে কিছু নম্বর থাকবে তবে সেই নম্বর দেওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষকেরই থাকুক। দৈনিক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষক তাঁর ছাত্র সম্বন্ধে এই পরিচয়-মূলক নম্বর দেবেন। সেই নম্বর সম্পূর্ণ পরীক্ষায় সঙ্গে যোগ হোক।

তবে এই নম্বরকে অবিশ্বাস করবারও কারণ থাকতে পারে। শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব অনেক অংশে এই নম্বর দেওয়ার মধ্যে থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োগ-পরীক্ষায় (practical examination) যেমন দুজন পরীক্ষক থাকেন, বাইরের আর ভিতরের, ইস্কুলের এই পরীক্ষাতেও তেমনি বাইরের পরীক্ষক নিযুক্ত করে দেখতে পারেন। অবশ্য এখানেও এক প্রশ্ন থাকল। এই রকম পরীক্ষা নিতে হলে প্রায় হাজার ছেড়েক পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হয়।

খরচের ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে প্রথম-প্রথম একটু খরচের মধ্যে পড়তে হবে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, খরচ কেমন করে কমান যায়। খরচ কমানি যায় যদি আমরা হেতু-নির্ণায়ক পদ্ধতি (Diagnostic method) প্রয়োগ করি। এইখানে শিক্ষাবিদ্‌দের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ করবার সুযোগ থাকল। আমেরিকাতে হিল্‌ড্রেথ যেমন করেছেন তেমনি আমরাও এখানে সেই ব্যবস্থা করতে পারি। হিল্‌ড্রেথের ব্যবস্থাটি জানা যাবে তাঁর A bibliography of Mental tests and Rating scales গ্রন্থে।

এই রকম ব্যবস্থার মধ্যে আছে, অভিধান-অভীক্ষা, পাঠ-অভ্যাস, চরিত্র অভীক্ষা, পাঠ-অভ্যাসের প্রশ্ন-অভীক্ষা, গ্রন্থাদি ব্যবহার-শিক্ষার অভীক্ষা প্রভৃতি।

এই সব অভীক্ষা যতদিন না হচ্ছে ততদিন উপযুক্ত শিক্ষকের উপর আস্থা স্থাপন করাই ভালো। কারণ নম্বর দেওয়ার অতিরুচিকে নিযুক্ত পরীক্ষকও তো বাদ দিতে পারে না! বিশেষ করে ক্রত-পঠনে বর্তমানে যে প্রশ্নধারা থাকে তার থেকে ইস্কুলের শিক্ষকের নম্বর দেওয়া একেবারে যারাত্মক হবে বলে আমরা মনে করি না।

ভূগোল শিক্ষা

শ্রীবকুলমালা সেন

(৪)

গ্রামের জীব জন্তু

পশুপাখি ছাড়া বাঙলার গ্রাম অসম্পূর্ণ, সুতরাং গ্রামের সঙ্গে ছাত্রীদের পরিচয়ে সম্পূর্ণতা আনতে হলে এদের সঙ্গেও যথাসম্ভব পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া পশুপাখি ও জীব জন্তুর সম্বন্ধে শিশু ও বালক বালিকাদের স্বাভাবিক কৌতূহল আছে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তির অনুকূলতা শিক্ষাগ্রহণের সহায়ক। এ জন্যও জীব-জন্তু সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা আছে।

বাঙলার পল্লীতে পশুপাখি প্রভৃতির প্রকার ভেদ অজস্র। ছাত্রছাত্রীদের ধারণাশক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরিচয় উপযুক্ত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত ছড়াগুলির সাহায্যে আবৃত্তি, গান ও সম্ভবপর স্থলে নৃত্যের মাধ্যমে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ও রুচিকর করে তোলা যেতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যানুসারে প্রত্যেক জাতীয় পশুপাখীর ভূমিকা এক বা একাধিক বালক বা বালিকা গ্রহণ করতে পারে। তারা ভূমিকা অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের পোষাক বা চিহ্ন ব্যবহার করবে অথবা মাথে লেখা টিকিট এঁটে অভিনয়ে যোগ দেবে।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা গ্রহণকারী দুটি বালকবালিকা শিক্ষয়িত্রীর আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। ক্রমশঃ একে একে পশুপাখির দল ছড়া গান বা আবৃত্তির সঙ্গে ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হবে। প্রথমে গৃহ-পালিত তারপর বন্য পশুর দল নিজ নিজ অংশ অভিনয়ের পর পশ্চাদ্দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে সারি বেঁধে বসবে। তারপর প্রবেশ করবে অন্যান্য জীব

ও পাখিরা দল। তারা নিজেদের ছড়া গান বা আবৃত্তির পর দুই পাশে সার বেঁধে দাঁড়াবে।

আলিক অভিব্যক্তি সহ ছড়া গান ও আবৃত্তি।

বালিকা—দেখছো ভাই, একে একে আসছে ওরা কারা?

বালক—হায় রে কপাল,
এদের দেখেই ভয়ে হলি সারা!
দেখনা চেয়ে ভাল করে ছাই,
এদের মোদের লক্ষ্মী বুঝি নাই।

বক—লক্ষ্মী বুঝি নাই আমি, লক্ষ্মী বুঝি নাই,
গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে খাঁটি দুধ যোগাই।

ছাগল—বাংলা দেশে গো-দুধেরই চলন
সবার বেশি, কেন্না জানে,
ছাগ-দুধে দুধ বলি করে না কেউ গণন
দুঃখ তো তাই মনে।

মহিষ—তোমার কথা সত্য অতি ছাগল মহাশয়,
আমার পানে তাকাও যদি দুঃখ হবে ক্ষয়।
মোষের দুধে পুষ্টি আছে যত,
গোরুর দুধে নাই;
তবু সবাই পক্ষপুটে গো-ব্যাখ্যানের রত,
যোগ্য আদর পেয়ে কি মোরে তাই?
যমের বাহন আমি, কারণ মম আমার দেহ!
গরুর মত মহিষ-মাতা কয় না মোরে কেহ।

হাতী—যত বড় দেহের কিবা করছো অহঙ্কার?
দেখছো চেয়ে আমার দিকে,
কি বিরাট আকার!
মুগোল পেশল শুঁড়টি দেখ কেমন চমৎকার,
তাল-পত্র কর্ণ দুটি এমন আছে কার?

মহিষ—দুঃখের কথা বলছি শুধু তাও সহে না প্রাণে?
মিথ্যে তোমার চতুর বলি সর্বলোকে মানে।
গর্ব দেখে লাজে মরি ছি ছি ছি ছি,
আমার যেমন শিং-এর বাহার,
এমন আছে কি?

ভেড়া—শিং-এর গরব করছো দেখে
এগিয়ে এলাম তাই,
যতই বল, আমার মত শিং কাহারও নাই।
খাঁড়ার মত শিংএ তোমার নাই ছিরি
নাই ছাঁদ,
আমার শিং-এ দেখছো কেমন
কুণ্ডলিনীর বাঁধ?

ঘোড়া—কতই রকম অস্ত্র বাহার দেখালে তাই সবে,
আমার মত ছুটতে পার,
বাংলার কই তবে।
গাড়ি টানি, সওয়ার লয়ে দূরের পথে যাই,
সৈন্যদলের সাথে সাথে রণাঙ্গণেও যাই!

গাধা—নির্বিরোধে বইতে বোঝা আমার মত কে?
(এমন) গা কাঁপিয়ে উচ্চনাদে গাইতে পারে কে?

শূয়োর— ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ,
সব নির্বোধ।
জানে না আমার কীর্তি কি লেখে ভারত।
আজকে আমি গৃহ-পালা ছোট্ট জানোয়ার,
যুগান্তরে আমিই ছিলাম বরা-অবতার!

কুকুর—কইলে কথা কথা বাড়ে তাই আছি চুপ চাপ,
শূয়োর বুড়োও আদর জমায়, একি মনস্তাপ!
বিনয় আমার অলঙ্কার কই না কিছু তাই,
আমার মত প্রভুভক্ত কোথাও কেহ নাই।
সারা রাত্রি সজাগ থাকি, দুই লোকের ত্রাস,
প্রাণের মায়া তুচ্ছ করি বিপদ করি নাশ।

বিড়াল— মিউ মিউ মিউ ম্যাও,
ভুলো ভায়া একটুখানি এদিক পানে চাও।
ঘরের বাইরে যতক্ষণ
তোমার আদর ততক্ষণ,
তার বেশী আর নয়।
আমি কিন্তু গৃহবাসী
বিলীয়মান বাঘের মাসী,
খোকা খুকুর খেলার সাথী
সকল স্থানেই আমার গতি।
স্বাধীন অতিশয়।

বালক—গৃহপ্রতিপালা এরা বড়ই উপকারী,
এদের ছাড়া দিন কাটানো
কষ্ট হতো ভারি।
বালিকা সত্যি কথা বলতে কি ভাই,
কৃষি কাজের তরে
আজও মোরা ভরসা করি
ইহাদেরই পরে।
গাই-বলদে খেতে খেতে লাঙল চষে ভাই
ধনবাসীর দুধার অন্ন সোনার শস্য পাই।
বালক—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়,
দেখছিস নে ধারা?
একেবারে ফেলবে গিলে,
পড়বি প্রাণে মারা।
বালিকা—তাই তো বটে, ও বাবা গো!
এদিক পানেই আসছে যে গো।
বাঁদর—ভয় পেয়োনা, ভয় পেয়ো না,
আমি বনের বাঁদর,
ত্রেতাযুগে রামের তরে
ডিঙিয়েছিলাম সাগর।
তোমাদেরই পূর্বপুরুষ পণ্ডিতেরা কয়,
স্নেহ-প্রীতির পাত্র অতি, শত্রু মোরা নয়।
প্রথম শেয়াল—হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।
দ্বিতীয় শেয়াল—ক্যা হুয়া ভাই, ক্যা হুয়া?
প্রথম শেয়াল—দিল্লীপর বাদশা হুয়া ভাই।
দ্বিতীয় শেয়াল—যোগ্য রাজা আর বুঝি কেউ নাই?
প্রথম শেয়াল—
সিংহ আছে অনেক দূরে, ব্যাঘ্র সোঁদর বনে,
গাঁয়ের কোপে জঙ্গলে কে আঁটবে আমার সনে!
সজারু—সজারু আমার নাম, কাঁটা ভরা দেহ,
প্রণিপাত মহারাজ, নমস্কার লহ।
খটাস—কোপে ছাড়ে শাস মোর আড়ালে আবডালে
পশুপাখীর ছানা ধরে খাই যাকে পেলে।
চতুরমনি হুক্কা হুয়া, বললে খাঁটি বাত,
বন-বাদাড়ে শেয়াল রাজা তোমার প্রণিপাত।

বালক-বালিকা—
বাপরে বাপ, একি পেরো, হাড় ছেড়ে আর বাঁচি,
বিদায় হল বন্য পশু তাক্‌দিমাদিম্ বাচি।
বালক—হায়রে কপাল এ আবার কি!
আসছে কারা দেখছো নাকি?
বালিকা—
চিমি চিমি কতক যেন লাগছে মনে ভাই।
গোসাপ—
তোমার কথা সত্য অতি, কিঞ্চিৎ ভুল নাই।
গোসাপ আমার নাম,
আমার চামড়ার তৈরী জিনিস, অনেক তাহার দাম।
ব্যাঙ— আমি ব্যাঙ,
ব্যাঙের ঘাঃ,
জলায় থাকে বাস।
বর্ষা পেলেই গলা সাধি মিটিয়ে মনের আশ।
আমার দিক-মাতানো তানে,
ডাকে—সুরের তোরায় প্রাণে,
সমঝদারের অভাবে তার মূল্য হল নাশ।
সাপ— ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস,
ক'রো না আফসোস।
তোমায় ডাকে এলাম দিতে সাড়া।
এঁকে বেঁকে দ্রুত চলি
দাঁতে লয়ে বিষের থলি
ক্রুদ্ধ হলেই কামড়ে দেব, পাবেনা কেউ ছাড়া।
আমার—প্রিয় খাদ্য ব্যাঙ,
খাসা—গাইতে প্যাঙোর প্যাঃ,
আহা করো না আফসোস,
ফোঁস ফোঁস ফোঁস।
সেউজ—
সাবাস সাবাস সাবাস ভাই, বলে ভাল কথা,
এলাম তোমার দুই প্রহরের কেরে!
যদ্ধ যুদ্ধে ডাকছি এস, বাঁচাও দেখি মাথা,
দিচ্ছি এবার সমস্ত বিষ ঝেড়ে।

নেউল আমি, চিনতে কি গো পার ?
ব্যাঙ গিলবার ছুরাশাটি একেবারে ছাড়ো।

কাঠবিড়ালী—
ফুরুক ফুরুক নেচে বেড়াই চপলমনা অতি,
নেউল দাদা, তোমার পায়ে হাজার হাজার নতি।

টিকটিকি— টিক টিক টিক,
যা বলেছো খাঁটি কথা, ঠিক ঠিক ঠিক।

বাঁদর, শেয়াল, খট্টাস, সাপ :
আমরা বনবাসী সবে আপন মনে বাস করি,
আঘাত যখন করে কেহ পরান পণে তখন লড়ি।
নইলে মোরা শিষ্ট অতি,
করি নাকো কারও ক্ষতি,
মিছিমিছি ভয় পেয়োনা পাখির ছেলে মেয়ে,
নাচে গানে হাস্যরোলে ভুবন কেলো ছেয়ে।

ব্যাঙ—আমায় তানে মিলাও দেখি তান
মেঘ-মল্লারে— কেমন পারো ?

কাঠবিড়ালী— নাচো দেখি ফুরুক ফুরুক ধাম্
তুর্কী নাচন—কেমন পারো ?

টিকটিকি— টিক টিক টিক,
খোকা খুকু ভয় পেয়েছে, করো না কেউ টিক।

বালক—তোমরা সবে মহৎ অতিশয়
সন্দেহ কি তায়।
তবু কেন লাগছে মনে ভয়।
বলতে কথা জিব শুকিয়ে যায়।

বালিকা—একটু যদি পথ ছাড়ো তাই সবে,
আসছে দেখ বুনো পাখির ঝাঁক,
দেখবে কেমন সুধা-মধুর রবে
পত্তর বেলায় লাগিয়ে দেবে তাক।

টিকটিকি— টিক টিক টিক।
চলো সবে পথ ছাড়ো, ক'রো নাকো দিক।

কাক—আমি কাক, গেরস্থদের নিত্য সাথী পাখি,
মধুর রবের আশা করলে পড়বে নেহাৎ ফাঁকি।
বিশ্বাস হবার নাই কো তাতে কিছু,
সুধা-কণ্ঠ পাখির দলে আসছে পিছুপিছু।

কোকিল—কুহু কুহু কুহু,
পাপিয়া—পিউ পিউ পিউ পিয়া,
উভয়ে—আমরা এলাম বসন্তকে নিয়া।

দোয়েল—দোয়েল আমি,
শ্যামা— শ্যামা আমি,
উভয়ে—
মোদের সুরের মোহন মায়ায় মরণ আসে নামি।

বালক বালিকা—
তোমাদের ঐ কণ্ঠস্বরে বাজে ব্রজের বাঁশী,
সকাল সাঁঝে শুনতে মোরা বড়ই ভালবাসি।

বুলবুলি—যে বুলবুলি গান গেয়েছে,
গাল ফুলিয়ে গান গেয়েছে,
আমিই যে সেই বুলবুলি,
টাপার ডালে রোজ দুলি।

টুনটুনি—যেখন তুলতে কাঁটা ফুটলো নাকে,
দুঃখের কথা জানাই বল কাকে।
আমিই যে সেই টুনটুনি,
মিষ্টি সুরের জাল বুনি।

মাছরাঙা—
রাঙা বঙ্কের রঙে রাঙা দেহের বাহার দেখছো কি ?
জলের ধারে মাছের ধ্যানে কাটাচ্ছি কাল,
জানছো কি ?

কাঠঠোকরা— ঠুক ঠুক ঠুক,
নেয়ে খেয়ে দিন গেল কি আছে রে সুখ !
দিন রাত আমি শুধু খাটছি,
পুট পুট কুর কুর কাটছি,
কঠিন গাছের গায়
ক্ষুদ্র ঠোঁটের ঘায়
মনোমত নীড় খানি গড়ছি।
বেছে নিলে অলসের ধর্ম,
জানিলে না শ্রমিকের মর্ম।

কিংডে— কুচ্‌কুচে মোর রংটি
ফুরুৎ ফুরুৎ ঢংটি।

টেলিগ্রাফের তারের পরে
হঠাৎ দুরেক আরাম ভরে
ল্যাজ দুলিয়ে বসছি এই।
আমার তালে তাল রেখে
সোনালী রোদ গায় মেখে
খোকা খুকু নাচো না ভাই, তাক্ ধিনাধিন্
তা বিনে নেই।

বালক বালিকা :
নাচে গানে কর্মে কাজে
কে তোমাদের জুড়ি আছে,
আমরা কি তাই পাখি এমনতর ?
ছড়া গান আর রূপকথাতে
খুসির বানে পরাণ মাতে,
তোমরাই তো কুঞ্জ সেথায় গড় !

কবুতর— বক বকম কম বক,
খোকা খুকু ঠিক করেছে বলছি কথা হক।

চিল— আমি দূর আকাশে
ভেসে থাকি বাতাসে।
চোখ থাকে তাগাড়ে
দানে তথা পগারে।
খাঁচার চেটা
না করে কি শেষটা
মারা যাব বেঘোরে, বল তো ?
আমি ছাড়া আর কাকে
নির্জন মেঘ-লোকে
পাখা মেলে উড়ে যেতে মানাতো।
আকাশে বুড়ির সাথে প্রাণে প্রাণে মিতালি,
দুপুরের রোদ্দুরে যোগ করি গীতালি।

শালিক—
মাবটি আমার জড়িয়ে আছে ভারত-মাথার সাথে,
আমি জীবটি বুঝি কম ?
আমি
কপট পাখার নাটের গুরু যমের দোসর যম।

বক—বক-ধার্মিক বলে আমায় দুষ্ট লোকের দল,
তাবে তারা যা কিছু নোরা সবই বুঝি ছল।
এ কেমন অবিচার !
জলার ধারে মাছের ধ্যানে রয় না কেহ আর ?
বড়শি হাতে খোকা খুকুর বাবা কাকার দল
কি করে তা বল ?
আমি কিন্তু মেঘের কোলে ঘরে
হেসে বেড়াই পদ্ম-মালার মত,
রসিক জনে কেনা তাহা করে
কবির মনে কাব্য জাগে কত !
মিথ্যে তা তো নয় ?
আমার রূপে কাব্য লোকে সুরা-স্রোতে বয়।

হাঁস—তোমার কথা সত্য অতি বলছি আমি হাঁস,
সবই আমার জানা, আমি থাকি জলের পাশ।
দিনমানের বেশীর ভাগই সাঁতার কেটে বেড়াই
মাঝে মাঝে কানা খুঁচে শামুক গুগলি খাই।
রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বেলেহাঁসে মিলে
কভু থাকি ডুবে আর কভু থাকি বিলে।

বালক বালিকা —দুঃখু কেন ভাই,
মনের কথা বললে আজি জানতে পেলাম ভাই।
পাড়াগাঁয়ের শোভা তোমরা মনের সুখে থাকো,
যার যা খুসি ভাল মন্দ বলুক লাখো লাখো।

ডাহুক—ডাহুক আমি,
চাতক— আমি চাতক,
ছাতার—ছাতার মোরা, সাত ভায়েতে বড়ই
মোদের মিল,
কাকেও ছেড়ে কেহ মোরা থাকি না এক তিল।

শালিখ ও চড়ুই—
শালিখ পাখি, চড়ুই পাখি
তরুণ আলোর স্বর্ণ মাখি
রোজ সকালে তোমার দ্বারে আসি,
তোমাদের ঐ শিউলি তলায়
শিশির ভেজা ফুলের বেলায়
লুটোপুটি খেলতে ভালবাসি।

ভোরের আলোয় পাই তোমাদের ঘুম
ভাঙানো গান,
শয্যা ছাড়ো খোকা খুকু, রাত্রি অবসান।

খঞ্জনা—

কিচিও মিচির সাথে তোমাদের তাতেই এত ফাঁকি?
নৃত্য চপল মন আমার লাগিয়ে দেবে তাক।

চোখ গেল—

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল।
কিবা ছাঁদ চলনের,
ঠাঁট দেখ বলনের,
দেখে ফাঁকি ফুল্লের দন্তের চোখ গেল।

ময়ূর—

কৌতুকের কৌ, পহরের পর পহর গেল মিছে,
বাজে কাজে কাল কাটানো অনুতাপ হয় পিছে।
আপন আপন ব্যাখ্যানায় কেউ কারো নও কম,
সর্বে ভরা বাক্যাবলী করছেছে ময়ূর।
এবার একটু পরের পানে চাও,
যাহার যাহা প্রাপ্য আছে, প্রাণ খুলে তা দাও।

বৌ কথা-কও—ময়ূর তারা ঠিক বলেছ,
পাখির দলের ভুল ভেঙেছে।
ঘরের কোনে চুপটি করে কে তুমি গো
বৌ-কথা-কও।
তোমাদেরই ছেলে মেয়ে
মনের মত ভ্রোতা পেয়ে
বাজে কথায় ভরলো ভুবন, ও বৌ কেন চুপ
করে রও।
অন্তঃপুরের অন্তরালে সকাল সাঁঝে কতই না সও!
ও হারা বৌ, ঘোমটা তুলি পরাণ খুলি
সেই কথাটি কও।

পেচা— ঘুত ঘুতোম তো,
শঙ্কর শম্ভো!
হুম্যি মামা বসলো পাটে
সাঙ্গ দিয়ে দিনের নাটে
ঘরে যাও হে বোদার পুরে যাহার যত পক্ষ,
শঙ্কর শম্ভো।

বালক-বালিকা।
জেনেছি আজ অনেক কথা, অনেক ছল শেখা,
পাখির যত পক্ষ পাখির পেলাম দেখা দেখা।

পক্ষির দল—
আমরা পাঁখির পক্ষ জানোয়ার,
দেখা থাকবো নাকো আর।
গৃহে যাব গৃহবাসী যারা,
বনবাসী পক্ষ দলের পারে না আর সাড়া।
খোকা খুকু, সুখে থাক ভাই,
পরাণ খুলে বল এবার যে যার ঘরে যাই।

পাখির দল—
আকাশচারী কেউ বা মোরা, কেউ বা ভূবিচর,
অনুমতি কর এবার যাব যে যার ঘর।
খোকা খুকুর ছুটোছুটি চপল মধুর হাসি
তৃপ্তি-ভরা চোখে মোরা দেখতে ভালবাসি।
ভোর না হতে কাঁকে কাঁকে
তাই তো আসি ছুটি,
ল্যাজ ঝোলা কেউ, সাতরঙা কেউ,
কারও মাথায় ঝুটি।

পাশ্চাত্য দেশে ইতিহাস লেখার ক্রমবিকাশ

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

প্রাচীন সভ্যতার লেখার আবিষ্কারের সাথে সাথে ঐতিহাসিক দলিল লিখিত হইতে আরম্ভ করিল। মেসোপটেমিয়া, চীন এবং মিশরে আমরা ইহার পরিচয় পাই। মিশরের প্রাচীনতম অক্ষর ছিল তীরের ফলা এবং পাখীর ছবি। এই লেখার নাম ছিল হিরোগ্লিফিক, (Hieroglyphic) তীরের ফলার আকারের লেখা সম্ভবতঃ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকায় প্রথম প্রচলিত হয়। চার প্রকারের তীরের ফলক দাগ দিয়া ইট বা পাথরের উপর লিখিত হইত। ইহাকে কিউনেই-ফরম (Cuneiform) লেখা বলে। মন্ত্রের পরিবর্তে প্রাচীন ব্যাবিলন ও এসিরিয়ার লেখায় এই প্রকার অনেক তীরের ফলকের চিহ্ন থাকিত। রাজারা অন্যদেশে উন্নসিত হইয়া ভবিষ্যতের মানুষকে তাহা জানাইবার জন্য তাহাদের দিগ্বিজয় ও ছোট-বড় নানা প্রকার ঘটনা লিখিতেন। লিখিবার ভারপ্রাপ্ত সভাসদ্‌গণ অনেক সময় তাহার উপর রং ফলাইয়া দিতেন—এ যেন "রাজা যত কহে, সভাসদ্ কহে তার শতগুণ।" ইতিহাসে কাদেশের যুদ্ধ (Battle of Kadesh) সর্বপ্রথম লিখিত যুদ্ধের বিবরণ। লেখার রূপ হইতেই বুঝা যায় যে ভারপ্রাপ্ত সভাসদ্ মহাশয় মনিবের পরাক্রম ও যুদ্ধ কৌশল দেখাইবার জন্যই যেন যুদ্ধের বিবরণ লিখিতেছেন। যতদিন ধরিয়া ইতিহাসে রাজাদের কার্যবিবরণ লিখিত হইয়াছে ততদিন এইপ্রকার কলাকৌশল গ্রহণ করা হইয়াছে, আমাদের দেশেও হইয়াছে,—অশোক হইতে ত্রিপুরার রাজবংশ পর্যন্ত। পূর্বপুরুষদের গৌরবের ঘটনা, এবং ক্রমানুগ বংশতালিকা রক্ষা ও তাহাদের কার্যের বিবরণ রক্ষা করাও এইসব লেখার উদ্দেশ্য ছিল। আবার ধর্ম, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া ধর্মের কথা প্রচার করার প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও দেখা যায়। বাইবেলের Old Testament-এ দেখা যায় যে মানুষের অস্তিত্ব ও কার্যাবলীর ভিতর ভগবানের ইচ্ছা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গ্রীকরাই আধুনিক ইতিহাস লেখার প্রবর্তক। হেরোডোটাসকে (৪৮৪—৪২৪ খৃঃ পূঃ) প্রথম এবং আধুনিক ঐতিহাসিক বলা যাইতে পারে। তাঁহার লেখায় বিশেষ ঘটনাবলী, তাহার উল্লেখযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের কাজের উপর কি করিয়া প্রভাব বিস্তার করে, তাহার সব কিছুরই বর্ণনা আছে। কার্য-কারণের মূল উপাদান বড় স্পষ্ট। তিনি তাঁহার লেখায় নৈতিক উপদেশ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য হেরোডোটাসের লেখার মধ্যে অনেক অনৈসর্গিক কাহিনী আছে, লেখাও বৈজ্ঞানিক ভাবের নয়, বিষয়বস্তু ভিন্নাইয়া তিনি নানা দিকে গিয়াছেন। সময়ানুক্রম (Chronology) বড় অস্পষ্ট। এত দোষ থাকা সত্ত্বেও ভুলিলে চলিবে না যে ইতিহাস লেখায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত।

ইহার পর যে ঐতিহাসিকের কথা উল্লেখযোগ্য তিনিও একজন গ্রীক, নাম থুকিদিদিস (৪৬০ ৪০০ খৃঃ পূঃ)। তিনি পেলোপনেসাস-এর যুদ্ধের কাহিনী লেখেন। কাহিনীর মধ্যে থাকে শুধু যুদ্ধ এবং যুদ্ধে লিপ্ত দেশের কথা,—সময়ানুক্রমের (Chronology) উপর তিনি জোর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি কি লিখিতেছেন তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়।

তিনি এই যুদ্ধের সময় বাঁচিয়া ছিলেন, নিজে সব দেখিয়াছেন। এজন্য তাঁহার লেখার মূল্য অনেক বেশী। এই যুদ্ধ হইতে কি শিক্ষা লাভ করা হইল তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পর তৃতীয় প্রধান ঐতিহাসিক জেনোফোন। তিনি ইতিহাসের বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে মন হইতে লিখিয়াছেন। এই বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে বর্তমান ইতিহাস রচনায় এই বর্ণনাই প্রধান।

রোমান যুগের দুইজন প্রধান ঐতিহাসিক পলিবাস এবং ডিয়ন ক্যাসিয়াস। তাঁহারা থুকিডিডিজ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক নিতি জেনোফনকে অনুসরণ করিয়া বর্ণনামূলক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ট্যাসিটাসও থুকিডিডিজকে এক দিকের অনুসরণ করিয়াছেন, তবে তিনি রোমান সমাজে যে অবনতি হইয়াছিল সেই অবনতির কারণের উপর জোর দিয়া নৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। ইতিহাস লিখিবার মূল উপাদানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে বই লিখিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি আদি এবং অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক। আধুনিক কালে মমসেন একজন বড় ইতিহাসিক। তাঁহার রোমের ইতিহাসে ভাব এবং ভাষার প্রাধান্য। তিনি অনেক সময় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে মূল উপাদানের সহিত সম্পূর্ণ মিল নাই। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সাহিত্য ইতিহাস, ইতিহাসও সাহিত্য হইতে পারে। ভাষা প্রাণবন্ত না হইলে ইতিহাস নীরস হয়। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন যে, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নয়, তাহা ঠিক। ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে, উৎসাহ পাওয়া যায়, এবং রচনা উদ্দেশ্যমূলক হইলে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। কিন্তু সত্যের মূল যেখানে বিকৃত, যেমন রাজসিংহে, সেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিও বিকৃত হয়। খাঁটি ইতিহাস যদি প্রাণবন্ত ভাষায় লেখা হয় তবে তাহা সাহিত্য জগতেও আদরনীয় হয়। ইংরাজী ভাষায় সিলি, লর্ড ব্রাইস, গিবন এবং বাংলা ভাষায় আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের লেখা এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থল, তাঁহাদের লেখা ইতিহাস সাহিত্যও বটে।

মধ্যযুগে দুই শ্রেণীর ইতিহাস দেখা যায়। এক সার্বজনীন (Universal) ইতিহাস, আর এক, কালক্রমানুসারে (Chronicle) লেখা ইতিহাস। ইহার পথপ্রদর্শক সেন্ট অগাষ্টাইন। সমাজ বিষয়ে তাঁহার মত ও একটি নূতন ব্যবস্থায় খৃষ্টান ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনদ্বারা ইহার পরিবর্তন দেখাইবার জন্য তিনি City of Gods লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য রোমের পতন হইয়াছে এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা এই বইয়ে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত উৎকলবাসী বলেন যে দেশবাসী চৈতন্যদেবের প্রেমের ধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ; কারণ ইহার জন্য ওড়িয়াগণ ক্ষাত্রবীর্য হারাইয়াছিলেন। সে মত যে ভুল তাহাও প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। শৌর্যবীর্যে ভারতীয়েরা গ্রীক বা তুর্কীদের চাইতে কম ছিল না, অথচ তাহাদের পরাজয় হইয়াছে। যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতি এবং সৈন্যচালনার নৈপুণ্য যুদ্ধজয়ের একান্ত সহায়ক। ইহার অভাবে মধ্যযুগে তুর্কীদের হস্তে ভারতীয়দের পরাজয় হইয়াছে। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ সে কথা পরিষ্কার বলিয়াছেন। এই ভুলটি শুধরে জন্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সাধ্যায় খ্রিষ্টিক ইংরাজদিগকে রোমের উত্তর আফ্রিকার একাধিকবার হারাইয়াছেন। সেন্ট অগস্টাইনকে সমর্থন করিয়া স্পেনের অরোসিয়াস (৩৮৫—৪২০ খৃঃ অঃ) Seven Books of History against the Pagans লেখেন। বাইবেলের যে অংশে প্রত্যাদেশ (Revelation) আছে তাহার প্রত্যক্ষ

প্রমাণ দিবার উদ্দেশ্যে এই বইখানি পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়াছে।

কালক্রমানুগ বা কালক্রমানুসারে লেখা ইতিহাস স্থানীয় মঠের সন্ন্যাসীদের কাঁচা হাতের ঘটনাসর্বস্ব বিবরণ লেখা হইতে পাকা হাতের সুবিন্যস্ত লেখা পর্যন্ত হইতে পারে। ডেনমার্কের স্যাক্সো গ্র্যামাটিকাসের Historia Danicia, হোলি রোমান এম্পায়ারের সম্রাট ফ্রেডারিকের কাকা অটোর The Two Cities, সেন্ট এলবানসের সন্ন্যাসী রোজার ওরেন ডোডারের Flores Historiarum, তাঁহার সহকারী ম্যাথু প্যারিসের Chronica Majora পাকা হাতের লেখার আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল। ক্যাসিডোরাস গথ জাতির ইতিহাস এবং গ্রেগরি অব টুরস্ ফ্রাঙ্ক জাতির ইতিহাস আরও উদার ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মধ্য-যুগে মাত্র যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ দেখা গিয়াছিল এবং মাত্র তাঁহারাই লেখাপড়া জানিতেন। ফলে তাঁহাদের লেখাতে সংকীর্ণ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহা পক্ষপাত দোষে দোষী। রেনেসাঁসের যুগে এবং পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ এই প্রকার ইতিহাসের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রমাণ ব্যতীত ঘটনার কথা লেখা, অসত্যপূর্ণ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ, অপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাস ইত্যাদি দোষ যাজক-দের লেখায় বহু পাওয়া যায়। আটলান্টিকের শেষ নাই ইহাই তাহারা শিখাইতেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ। তাঁহারা স্বভাবতই নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেন। এত দোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকাংশে মূল্যবান্। সার্বজনীন এবং কালক্রমানুসারে লেখা ইতিহাস যাজক সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি। ইহার মধ্যে অনেক অখ্যাত বা অজ্ঞাত লেখক আছেন। সমসাময়িক ও প্রাচীনতম ঘটনার বিবরণ দেওয়া ব্যতীত তখনকার জাতের বিষয়ে তাঁহাদের কি ধারণা তাহারই পরিচয় আমরা এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক লেখার মধ্যে পাই। এইগুলি ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচারের পক্ষে বড়ই মূল্যবান। যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত বীড এর (৬৭৩—৭৩৫) লাতিন ভাষায় লেখা Ecclesiastic History of the English Nation এই যুগের (৫৯৭—৭৩১ খ্রীঃ অঃ) বিখ্যাত ইতিহাস, শ্রেষ্ঠত্বের কষ্টিপাথরে ইহার বিচার হইয়াছে।

মধ্যযুগের ক্রুসেডের নাইটগণের বীরত্বব্যঞ্জক বিবরণ উইলিয়ম অব টায়ার লিখিয়া গিয়াছেন। গ্রীক, তুর্কী ও আরবদের সংস্পর্শে আসিয়া লেখক তাহাদের মতামতও ইউরোপীয়দের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফলে খৃষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা উদার হইয়াছে। জানিয়া রাখা ভাল, এই উইলিয়ম ভূমধ্যসাগরের উপকূলে টায়ার শহরের আর্চবিশপ ছিলেন। ক্রুসেডের ইতিহাসের অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক যাজকসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, যেমন ফিলিপ ডি কমিনে, জীন ফ্রয়ইসার্ট এবং জীন অয়েনভীল।

এই যুগের আরব ঐতিহাসিকগণের দান কম নহে। তাবারি (৮৩৯—৯২৩ খৃঃ অঃ) কোরাণের একটি টীকা এবং পৃথিবীর ইতিহাস নিয়া একটি বই লিখিয়াছিলেন। কোরাণের টীকা (হাদিস) হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে কিংবদন্তী সংগ্রহের বৃহত্তম সংগ্রহ। পৃথিবীর ইতিহাসে একই ঘটনার বিভিন্ন পক্ষের বিভিন্ন বিবরণ দেওয়া আছে। আমাদের দেশে পুণার ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারতের বাছাই করা সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন মহাভারত হইতে লিখিত ঘটনা বিচার করিয়া, তুলনা করিয়া তারপর গ্রহণ ও বর্জন করা হইতেছে। মধ্যযুগের ইতিহাসে ঘটনার সমাবেশের আধিক্য দেখা যায়, বিচারের অবকাশ খুব কম। বাগদাদের মাসুদি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। লিখিবার উদ্দেশ্যে তিনি স্পেন,

হাসিয়া, ভারত চীন, সিরিয়া এবং মিশর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল দেশ সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিয়াছিলেন এবং দেখিয়া ছিলেন তাহা তিনি ইতিহাসে লিখিয়াছিলেন—নাম দিয়াছিলেন বিশ্বের ইতিহাস। আর একজন আরব ঐতিহাসিক ছিলেন ইবন্ সালদুন (১৩৩২—১৪০৬ খৃঃ অঃ)। তিনি গ্রানেডার যুদ্ধ রাজার দূত ছিলেন। তিনিও এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; প্রথম ভাগে মুসলমানের জীবন, দ্বিতীয় ভাগে আরবদের এবং তাহাদের চারিপার্শ্বের অন্যান্য জাতির ইতিহাস, তৃতীয় ভাগে উত্তর আফ্রিকার বিশদ বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ইহারা ভাবে না লইয়া তথ্য-নির্দেশ-বহুল প্রণালীসম্মত উপায়ে ইতিহাস লেখেন আধুনিক যুগে জীন মোবিলন ও জীন ম্যাবিলন (১৬৩২—১৭০৭)। ইংলণ্ডের বীডের ন্যায় ম্যাবিলন বেনেডিকটাইন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত Les Six Livres de la republique ইতিহাসকে বিজ্ঞান এবং দর্শনের মাপকাঠিতে বিচার করিবার প্রথম প্রচেষ্টা। ম্যাবিলনের De re diplomatica মূল দলিল যে প্রকৃত তাহার নির্ভরযোগ্যতা বিচার করিবার একটি মূল্যবান বই; ইহার আগে এই প্রকার চেষ্টা আর হয় নাই। মূল দলিল খাঁটি কি জাল তাহা নিখুঁত ভাবে বিচার না করিতে পারিলে সত্যের অপলাপ ঘটে। বাইজানটাইন সম্রাট প্রথম কন্‌সটান্‌ট.ইন-এর তথাকথিত দানপত্র (Donation of Constantine) যে জাল তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই জাল দলিলের সাহায্যে পোপ দাবী করিতেন যে ইটালী এবং রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের সার্বভৌম ক্ষমতা কন্‌সটান্‌টাইন তাঁহাকে এবং তাঁহার পরবর্তী সকল পোপকে দান করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে ইহার জন্য রোমান এম্পায়ারের সম্রাটগণ এবং পোপের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব হইয়াছিল।

ম্যাবিলনের পর হইতে প্রাচীন পুঁথি, দলিল এবং সকল প্রকার নিদর্শন সংগ্রহ করিবার ধুম পড়িয়া গেল। তাহা সম্পাদনা অথবা বিচার করিয়া বই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। আধুনিক ইতিহাসের পথ এই ভাবে তৈয়ারী হইল।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ ইতিহাসের লেখার একটি নূতন স্তর সৃষ্টি করিলেন। ভলটেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮ খৃঃ অঃ) শুধু যে ভ্রমশূন্যতার উপর জোর দিলেন তাহা নয়, তিনি ইতিহাসের সামাজিক ও নৈতিক দিকের অনুশীলন যে ইতিহাসলিখন বিদ্যার একান্ত অপরিহার্য তাহাই প্রচার করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ নিয়া লিখিত ইতিহাস যে প্রকৃত ইতিহাস এই সত্য তিনিই প্রথম প্রচার করেন। ১৭৭৬—৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গিবন (১৭৩৭ ৯৪ খৃঃ অঃ) ছয় খণ্ডে তাঁহার The History of the Decline and Fall of the Roman Empire বাহির করেন। লিপিচাতুর্য, সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা, এবং কাজের পরিমাণের বিশালতায় বই খানি পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। দুই শতাব্দী ধরিয়া বইখানি জ্ঞানী ও মনীষীদের বড়ই প্রিয়; চিন্তার বহু খোরাক ইহাতে পাওয়া যায়। এই বই চির নূতন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বইখানি পড়িতে দেখিয়া বাল্যে রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়া কূলকিনারা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেন না যে মহর্ষিকে পড়িতে কেহ যখন বাধ্য করে না, তখন অতগুলি খণ্ডে বাঁধানো অতবড় বই তিনি কেন পড়েন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে পুরাতত্ত্ব হইতে প্রত্নতত্ত্ব এবং গ্রীক রোমান যুগের মনীষা হইতে ভাষাতত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা আরম্ভ হইল। ইতিহাসের বিচারমূলক উদ্দেশ্য (objectivity) মতবাদের বিকাশের পক্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুইটি একান্ত আবশ্যক। লিওপোল্ড ফন রাঙ্কে (১৭৯৫—১৮৮০ খৃঃ অঃ)

এই মতবাদের স্রষ্টা। তিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুসন্ধান করিতেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান যেমন ছিল, ঘটনাগুলি যে ভাবে ঘটিয়াছিল, ঠিক তাহাই লেখা ছিল তাঁহার কাজ। তাহা লিখিতে গিয়া আগেই কিছু সিদ্ধান্ত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে লেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া তিনিই প্রথম গবেষণা করেন। জার্মানীতে তাঁহার সময়ে ধর্মস ও জাতীয় স্বার্থ ও উৎসাহের উপরে ভিত্তি করিয়া ইতিহাস রচনা করিবার প্রথা দাঁড়াইয়াছিল। এই জন্য হেগেল ও ডুয়সেন আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা শিখাইবার তিনি একদল ছাত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাঙ্কে যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহার চেয়ে এই ছাত্রতৈয়ারী কাজ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমেরিকার ফ্রেডরিক জ্যাকসন টার্নার মহাশয়কে তাঁহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিনিই প্রথম প্রচার করেন যে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী আমেরিকা ইউরোপের একটি সংস্করণ মাত্র, মধ্য ও মধ্য-পশ্চিম (Mid West) অংশই সত্যকারের আমেরিকা। ১৮৯৩ সালে American Historical Association-এ পঠিত তাঁহার প্রবন্ধটি ("The significance of the Frontier American History") জাতীয় ইতিহাস লিখিবার প্রধান সহায়ক হয়। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে আমেরিকার গণতন্ত্রের উপর সীমান্তের প্রভাব অসীম। সীমানা যতই পশ্চিমে হটিয়া গিয়াছে ততই আমেরিকানরা অধিকতর দুঃখ কষ্ট বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, ততই তাহারা ইউরোপের ভাবধারা, রীতিনীতি, অনেক কিছু বর্জন করিয়াছে। তিনি বেশি বই লেখেন নাই কিন্তু তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত একদল ঐতিহাসিক তাঁহার মতানুসরণ করিয়া আমেরিকার জাতীয় ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার পূর্বে Emerson বলিয়াছিলেন "Europe extends to the Alleghany (আটলান্টিকের তীর হইতে কিছুদূর একটি পর্বত), America lies beyond". কিন্তু Emerson ঐতিহাসিক ছিলেন না বা সীমান্তের প্রভাব বিষয়ে কিছুই লেখেন নাই। রাঙ্কে এবং তাঁহার পরবর্তী মমসেন ও ডুয়সেন ইতিহাস লিখিবার এবং শিখাইবার ও সমালোচনার প্রণালী নিয়মবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে ইতিহাস লিখিবার জার্মান মতের সৃজন হয় ও ইতিহাস লেখা একটি পেশার পরিণত হয়। এই মত ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসে দার্শনিক মতবাদের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের ঐতিহাসিকগণও ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অবশেষে সেখানেও দার্শনিক মতবাদের প্রাধান্য রহিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার দিকে ঝোঁক দেখা দিল এবং সেই ঝোঁক কিছু পরিবর্তনসহ বিংশ শতাব্দীতেও বর্তমান। নরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের প্রভাব কম নয়; সে জন্য ইতিহাসে নূতন ভাবধারা প্রবেশ করিয়াছে। ইতিহাস এখন শুধু ঘটনার বিবরণ নয়। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস এখন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজকাল ইতিহাস লিখিতে প্রমাণ-পঞ্জী প্রধান সহায়ক। প্রতি বিষয়ে প্রতি ঘটনা কোন বই, কাহার লেখা হইতে সংগৃহীত হইল তাহা ফুটনোটে লিখিত থাকে। যে ইতিহাসে যত বেশী ফুটনোট থাকিবে, যত বেশী প্রমাণ-পঞ্জী থাকিবে তাহা তত বেশী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রমাণ পঞ্জী দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ থাকিবে। প্রমাণপঞ্জী বিচারের কষ্টিপাথরে যদি না টেকে তবে তাহা দেওয়া প্রকৃতপক্ষে নিরর্থক হয়।

প্রাথমিক শিক্ষকের পত্র

প্রেরক "শিক্ষা" সম্পাদক, সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

১। আপনারা শিক্ষা নামক পত্রিকাখানা গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের নিকট নিয়মিতভাবে পাঠাইয়া থাকেন কিন্তু এগুলি ডাক বিভাগের গাফিলতির জন্য যাহাদের উদ্দেশ্যে পাঠান হয় তাহাদের হাতে ঠিকমত পৌঁছায় কি না সে বিষয়ে আমাদের যোরতর সন্দেহ আছে। আমার নিজের কথাই বলি, আমি এই পত্রিকাগুলি খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি এবং সাগ্রহে ইহার পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করি কিন্তু বহু সময়েই আমাকে এ বিষয়ে হতাশ হইতে হয়। গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরগুলি এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় অবস্থিত যে ডাক সংক্রান্ত চিঠিপত্র ঠিক ভাবে গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে আসিয়া উপস্থিত হয় না; এ সম্বন্ধে ডাক বিভাগে লেখালেখি করিয়াও কোন প্রতিকার হয় না। এ বিষয়ে যদি আপনারা আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে আলোচনা করেন তাহা হইলে ডাকসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া অবস্থার খানিকটা উন্নতি ঘটিতে পারে। গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরের উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা যদি না হয় তাহা হইলে এই সকল পত্র পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভার হ্রাস ও উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

যাহা হউক ডাকঘরের উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা যাহাতে হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিবার জন্য আপনাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

২। আর পল্লীঅঞ্চলে শিক্ষকতা করিতে গিয়া যে বিষয়গুলি আমাদের নিয়মিত ভাবে নজরে পড়ে সে বিষয়ে একটি কথা আপনাদের গোচরে আনা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি। গ্রামাঞ্চলের যারা বাসিন্দা, সত্য সত্যই কি তাহাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়াছে? এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে আমাদের হতাশই হইতে হয়। কি ভাবে গ্রামের চাষীর মনে শিক্ষাগ্রহণের স্পৃহা জাগে সে বিষয়ে আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে আলোচনা করিলে গ্রামের শিক্ষাব্রতীদের সমস্যার সমাধানের কথঞ্চিৎ আভাস ও ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

যারা গ্রামে বাস করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবি। ইহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শেখানো অপেক্ষা চাষকাজে ব্রতী যাওয়াই লাভজনক ও শ্রেয় বলিয়া মনে করেন।

আমি নদীয়া জেলার অনেক অনগ্রসর পল্লীর কথা জানি, এই সব পল্লীর চাষী বাসিন্দাদের ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার দিকে স্পৃহা আদৌ নাই। দেশের নিরক্ষর লোকের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ উদ্রেকের জন্য গ্রামাঞ্চলে জোর প্রচার কার্য চালানো আবশ্যক। অনেক সময়ে দেখা যায় চাষীর ছেলে মাঠে পিতার চাষের কাজে সহায়তা করিতে পারিবে না বা বিদ্যালয়ে আটক থাকিলে চাষীর পক্ষে চলানোর কাজে ব্যাঘাত ঘটিবে সে জন্যই চাষী ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে নারাজ। বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনের আবশ্যক নাই বলিয়া যাহারা অভিমত পোষণ করেন তাঁহারা পল্লী বাংলার বাস্তব ছবি সম্পর্কে বোধ হয় বিশেষ অবগত নহেন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানপ্রধান পল্লীগুলির মধ্যে বিচরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে শিক্ষা গ্রহণে আদৌ ইহাদের কোন আগ্রহ নাই। মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় যাঁরা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছেন তাঁহারাও এই সকল অশিক্ষিত মুসলিম বালক বালিকাদের যাহাতে শিক্ষার আলোক প্রাপ্তি ঘটে সে বিষয়ে সচেষ্ট নহেন। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকজন মুসলমান প্রধানদিগের নিকট পত্র লিখিয়াও সাড়া পাই নাই, এমন কি নিরক্ষর মুসলিম পল্লীর বালক বালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে তাঁহাদের কোন আন্তরিকতার আভাস দেখিতে পাই নাই। আশা করি আপনারা আমার এই পত্রের মূল বিষয় বস্তুগুলির প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি দিয়া যাহাতে রাজ্যের অনগ্রসর পল্লীর অভ্যন্তরে নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সাড়া জাগে এতদ্‌বিষয়ে সচেষ্ট হইবার জন্য এ রাজ্যের প্রধান দিগকে অগ্রণী হইবার জন্য আহ্বান জানাইবেন।

নিবেদন ইতি

বিনীত

মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

13th year 8th part 1/3/1962
waiting

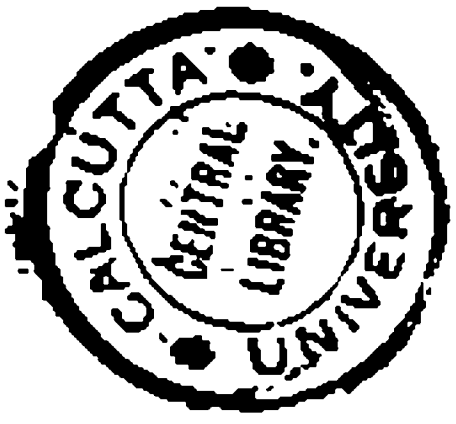

শিক্ষা

ম ধি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৬২ | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সর্বত্রই সকল ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে; মহলানবিশ পরিকল্পনা, না তাজার রায়ের পরিকল্পনা, না অন্য কিছু—এই লইয়া চিন্তা ও আলোচনা। আমরা শুধু ভাবিতেছি, এসবই তো খসড়া; আসল পরিকল্পনা কিরূপ হইবে, এবং সে আসলেরও আসল, অর্থাৎ রূপায়ন কিরূপ হইবে; সেই রূপায়নে শিক্ষা ও শিক্ষকের স্থান থাকিবে কোথায়? শিক্ষা যে জাতিগঠনের মূলে, আশা করি আমাদের চিন্তানায়কেরা সে কথা ভুলিবেন না।

কেরাণী ও শিক্ষক

সম্প্রতি একজন শিক্ষকের অবসর গ্রহণকালে তাঁহার জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, আপনি অবসর গ্রহণের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে কত পাইবেন? প্রাপ্তির পরিমাণ শুনিয়া কেরাণী বন্ধু হতাশ হইয়া বলিলেন, সে কি! আমরা তো উহার কম পাইব না, বরং কিছু বেশি পাইব, অথচ আমরা ম্যাট্রিকুলেশনও পাশ করি নাই। এই তারতম্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, এম্. এ ও বি. এ. ম্যাট্রিকে এখনও আমরা তফাৎ করি বটে, কিন্তু আয়ের বা সম্মানের সাম্য যদি হয়ই, তাহাতে বরং সন্তুষ্টই হওয়া উচিত। বিপদ হইতেছে এই যে, সাম্য রক্ষিত হয় না, বৈষম্যই সচরাচর হয়, এবং তাহাতেই আপত্তি ও অসন্তোষ।

বুনিয়াদি শিক্ষার মূল্য নিরূপণ

সম্প্রতি নিখিল ভারতে বুনিয়াদি শিক্ষা কি ভাবে ও কত দূর চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য ঐজন্য নিযুক্ত এক কমিটির সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন। কমিটির মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ গঠনকর্মী শ্রীরামচন্দ্রন্, বুনিয়াদ শিক্ষার অভিজ্ঞ শ্রীরামমূর্তি উপাধ্যায়, ও আমিনা মিলিয়ার ডক্টর আনসারি। আশা করি তাঁহারা বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসারকল্পে যে সব অনুমোদন করিবেন তাহা যথাযথ আলোচিত হইয়া প্রয়োজন বোধে গৃহীতও হইবে। ভারতের অন্যত্র যেমন এখানেও তেমন, শিক্ষার কাঠামো বুনিয়াদি হইবে বলিয়া স্বীকৃত

হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইবে, এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্য যখন এক, উপায় লইয়া বিশেষ মতভেদ হওয়ার কথা নয়। হাতের কাজের উপর বেশি নম্বর দেওয়া, শিক্ষক-শিক্ষণকাল বাড়াইয়া দেওয়া ও শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অবিলম্বে বৃদ্ধি করা—এ সবই তো হইল সর্বজনসম্মত উপায়। আশা করি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে বুনিয়াদি শিক্ষার গতি দ্রুত বর্ধিত হইবে।

উচ্চশিক্ষায় ভাগিদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. ক্লাসগুলিতে এ বৎসর ভর্তি হওয়ার জন্য যত আবেদন আসিয়াছে এবং ভর্তি হওয়ার জন্য যেরূপ জোর তাগিদ, এমনটি বিশ্ব নিকট অতীতে আর কখনও বোধ হয় দেখা যায় নাই। বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষার তাগিদ খুব বেশি; দুঃখের বিষয় এই সব শিক্ষার্থীর প্রবেশপথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। শিক্ষার গতি ফিরাইয়া দিলেও উচ্চশিক্ষার তাগিদ কমিবে না। তাই উচ্চশিক্ষার জন্য আরও প্রচুর ব্যবস্থা থাকা উচিত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাহা কি সম্ভব নয়?

পরলোকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্

স্বনামধন্য স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের কৃতী পুত্র ডক্টর অমরনাথ ঝা মহাশয়ের সম্প্রতি পরলোকগমনে শিক্ষাব্রতী সকলেই শোক অনুভব করিতেছেন। ডক্টর ঝা যৌবনে ইংরাজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন, তাঁহার অধ্যাপনা ও পাণ্ডিত্যের জন্য সমাজে প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। পরে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও আরও পরে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্য হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শিক্ষকদের আর্থিক দুর্দশা তাঁহাকে পীড়িত করে এবং এবিষয়ে দেড় বৎসর পূর্বে কলিকাতায় নিখিলভারত শিক্ষা-সম্মেলনে তাঁহার উক্তি যেমন যৌক্তিকতাপূর্ণ তেমনই সতেজ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে ৫৭ বৎসর বয়সে; তিনি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া বহু বৎসর শিক্ষার অগ্রগতির অনুকূলতা করিতে পারিতেন। তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

"দাও প্রেম, আরো প্রেম"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক মানুষ বিজ্ঞানচর্চার পথে কী প্রচণ্ড শক্তিকে উদ্ভূত করে তুলেছে! পরমাণু বোমার পরে হাইড্রোজেন বোমা। যবনিকার অন্তরালে আরও কত মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে, কে বলবে?

ইতিহাসের সেই আদিম যুগ থেকে বিশ্বসভ্যতার পথে শুরু হয়েছে মানুষের অভিযান। জড়প্রকৃতির বাধার পর বাধাকে সে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ধূলায়। অতীতের অসহায় আরণ্যজীবনের বর্বরতাকে সে ফেলে এসেছে কত দূরে। কত প্রাচীন বনভূমি তার সুতীক্ষ্ণ কুঠারের মুখে হয়েছে নিশ্চিহ্ন; কত দুরন্ত নদীর জলধারাকে সে বেঁধেছে পাষাণ-শৃঙ্খলে; ভূগর্ভের অন্ধকারে কত খনিকে সে করেছে আবিষ্কার; কত অজানা সমুদ্রে অকুতোভয়ে সে দিয়েছে পাড়ি; কত অনুর্বর ভূখণ্ডকে বিজ্ঞানের সহায়তায় সে করেছে শস্যশ্যামল। সংগ্রামের পর সংগ্রাম। পরাজয়ের পর পরাজয়! কিছুতেই রুখতে পারেনি তার দুর্নিবার গতিবেগকে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর শতসহস্র বাধাকে সগৌরবে অতিক্রম করে এসে হঠাৎ মানুষ এ কী সাংঘাতিক সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! জড়প্রকৃতির সমস্ত আক্রমণকে জয় করে গৌরবের চূড়ায় এসে আজ সে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। তার সম্মুখে অতল-স্পর্শী গহ্বরের নিঃসীম অন্ধকার। বিজ্ঞানের সহায়তায় নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবন মানুষকে স্বর্গজয়ের আশায় করেছিল উৎফুল্ল। মাটির বুকে সে রচনা করবে পার্থিব স্বর্গরাজ্য যেখানে থাকবে না দারিদ্র্য, থাকবে না ব্যাধি, থাকবে না দুঃখ!

হাইড্রোজেন বোমার করাল ছায়ায় এসে সে দেখছে তার স্বপ্নের স্বর্গভূমি ধূলিসাৎ হওয়ার মুখে! তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম করছে। মানুষের শত্রু আজ অরণ্যের হিংস্র জানোয়ার নয়, জড়প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণও নয়; মানুষের পরম শত্রু আজ মানুষ নিজেই। কবির সেই পুরানো সুর—What man has made of man! বাহিরের এত পর্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্নকে যে অতিক্রম করতে পারল—ভিতরের শত্রুবাহিনীর কাছে আজ সে কত শক্তিহীন! তার সভ্যতার এবং সংস্কৃতির দৌড় চামড়ার নীচে পর্যন্ত। অন্তরে সে আজও আদিমকালের সেই গুহাবাসী হৃদয়হীন বর্বর। অন্তরীক্ষ থেকে বোমা ফেলে হিরোশিমাকে শ্মশানভূমে পরিণত করতে তার কোনই কুণ্ঠা নেই।

ঐতিহাসিক টয়েনবী (Arnold Toynbee) তাই A Study of History-র নবম খণ্ডে বলেছেন, যন্ত্রের (technology) সঙ্গে মানুষের নীতিধর্মের সম্পর্ক আজ কী সঙ্কটময়! আজকে মানুষের চরম সমস্যা তো জড়প্রকৃতিকে শাসনে আনবার সমস্যা নয়। জড়প্রকৃতির ওপর দুর্গপ্রাকারে সগৌরবে উড়ছে তার জয়পতাকা! অন্তরীক্ষকে সে জয় করেছে পাখা দিয়ে! কিন্তু হায়, তার আত্মা ধূলায় অবলুণ্ঠিত পক্ষহীন বিহঙ্গমের মতো! ভালোবাসাই তো মানুষের আত্মাকে দেয় আকাশে উড়বার পাখা। এই ভালবাসার শক্তিরই নিদারুণ দৈন্য আজ দিকে দিকে। টয়েনবী বলছেন: মানুষের চরম সমস্যা আজ আধ্যাত্মিক, যান্ত্রিক নয়। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসার শক্তিকে সে যদি অর্জন করতে না পারে, যন্ত্রদানবের বুদ্ধির কলবৎ তাকে বিনাশের অন্ধকারের মধ্যেই নিক্ষেপ করবে। বিজ্ঞান যদি প্রেমের পাণিগ্রহণ না করে, জীবন

কখনও কল্যাণকর হবে না। বুদ্ধের সেই কথা, Let a man conquer anger by absence of anger. অক্রোধেন জিনে কোধং। ইংরেজীর সেখায় বুদ্ধের প্রতিধ্বনি।

ভবিষ্যতের মানুষের শিক্ষা-পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত হবে, তখন কি আমরা অতীত ও বর্তমান যুগের মনীষিদের কথা শুনে শিক্ষার প্রেমের জন্যে সুনির্দিষ্ট স্থান রাখবো না?

জগত্তারণ দাস

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

বহুদিন পরে প্রবাস হইতে দেশে ফিরিয়াছি। ম্লানমুখে বাণীভবন গৃহের তিন তলার ধীরে ধীরে উঠিতেছি—উঠিতে পা যেন চাহিতেছে না—পরিচিত কক্ষটির সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সবই ঠিক আছে;—দেওয়ালে বইয়ের তাকে বাঁকিয়া পড়া তাক সহ আলমারী ও বুক সেল্ফ্ গুলি, বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, চেয়ার, আয়না-কেদারা, সুইচের তলায় সাইড বোর্ড, টেলিফোন—এমন কি দেওয়ালে টাঙান আমারই ছোলা মাষ্টার মহাশয়ের এবং তাঁহার স্ত্রীর ফটোগুলি, শুধু নাই আরাম কেদারায় শায়িত সেই মানুষটি—যিনি আমার গলার আওয়াজ পাইলেই কেদারা হইতে লাফাইয়া উঠিতেন এবং আমাকে দুটা জানাইবার কোনওরূপ অবকাশ না দিয়াই স্নেহ-লিফনে বদ্ধ করিয়া কোর করিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসাইতেন—নাই তাহার পর স্নেহ-উজ্জ্বল কণ্ঠে বৃষ্টি-ধারার ন্যায় কুশল প্রশ্ন, এতদিন পরে পরে কেন ছুটি লইয়া আসি তাহার কৈফিয়ৎ দাবী, কারণে অকারণে গগন ফাটানো অট্টহাস্য, সপরিবারে তাঁহার ওখানে আহারাদি করিবার এবং যতদিন থাকিব ততদিন নিয়ম করিয়া তাঁহার নিকট সপরিবারে আসিবার সময়ের জ্ঞান বিরহিত সুমধুর দীর্ঘ আলাপ। মৃত আরাম কেদারার দিকে তাকাইয়া শোকার্ত্ত স্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, আর আমার দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন তাঁহার সহধর্মিণী।

আশ্চর্য, মাষ্টার মহাশয় যে আর আমাদের মধ্যে নাই ইহা নিশ্চিত জানিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। খালি মনে হইতেছে, কার্যোপলক্ষ্যে বাহিরে বুঝি গিয়াছেন, তাই দেখা হয় নাই, আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিলেই লোক পাঠাইবেন আমার খোঁজে। এখনই বুঝি তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল স্নেহোদ্ভাসিত মূর্তি দেখিতে পাইব। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে কি হারাইলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা বোধ হয় আজকালকার দিনের ছাত্রেরা ঠিক অনুধাবন করিতে পারিবে না। সেকালের আদর্শ শিক্ষকের মত তিনি আমাদের শুধু শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, আমাদের উপর তাঁহার দাবী অভিভাবকদের অপেক্ষাও বেশি থাকিত এবং আমাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে দায়িত্ববোধও তাঁহার ছিল অসীম। দশ এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। তাহার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে; আর আর অনেক

দিন পরেই তো বানপ্রস্থের চিন্তা করিবার সময় আসিবে। এই দীর্ঘকাল আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য ও পূত হইয়াছি। শুধু স্কুলেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক শেষ হয় নাই। আমাদের প্রতি যে তাঁহার ছিল অপত্য স্নেহ। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি আমাদের গতিপথ লক্ষ্য করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার উপদেশ আমাদের পথ দেখাইয়াছে, তাঁহার কল্যাণহস্ত আমাদের সাহায্য করিয়াছে। আবার কর্মজীবনে আমাদের সাফল্যের সংবাদ পাইলে তিনি যারপরনাই উৎফুল্ল হইয়াছেন। আমরাই ছিলাম তাঁহার আত্মীয়, আমরাই ছিলাম তাঁহার বন্ধু—রোগশয্যাতেও তিনি আত্মীয়স্বজনের অপেক্ষা আমাদের কথাই অধিক স্মরণ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া আমাদের কয়েকজনের নামই অধিক লইয়াছেন। আমাদের ভিতর দিয়া ছিল শিক্ষক-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবার তাঁহার সাধনা।

স্কুলে তিনি আমাদের বাংলা ও সংস্কৃতই প্রধানত পড়াইতেন—এজন্য আমাদের মধ্যে যাহাদের অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে সংস্কৃত ছিল তাহারা তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষাদানপ্রণালী অপূর্ব ছিল। আজিও যেন দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর আগেকার তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠ কানে বাজিতেছে—এমনই ছিল তাঁহার গম্ভীর স্বর। সেই গম্ভীর স্বরে তিনি সংস্কৃত বা বাংলা পাঠ্য আবৃত্তি করিতেন—আবৃত্তির গুণেই তাহা আমাদের অর্ধেক হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইত। তাহার পর হইত ব্যাখ্যা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার—পাণ্ডিত্যে সমৃদ্ধ অথচ প্রাঞ্জল। এমনভাবে তিনি পড়াইতেন যে গৃহে গিয়া আর তাহা পড়িতে হইত না। আবার শুধু স্কুলে পড়াইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না, আমাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার বাসায় গিয়া বহুনা দিতাম। তিনি তখন স্কুলের কাছে-পিঠে কোন মেসে একলা থাকিতেন। সেখানেও আমাদের এই উৎপাত হাসিমুখে সহ্য করিতেন এবং পড়াইয়া যাইতেন, কোনও রূপ ক্লান্তিবোধ না করিয়া। পরীক্ষায় আমাদের কৃতিত্বে তিনি এমন গর্ব বোধ করিতেন যাহা আমরা কখনও বোধ করি নাই।

মাষ্টার মহাশয় শুধু কি পাঠ্যই পড়াইতেন? এক একদিন খেয়াল হইলে অথবা আমরা অনুরোধ করিলে পাঠ্য পুস্তক সরাইয়া রাখিয়া সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী অথবা অন্য কোন সাহিত্যের যাহা যাহা অংশের আবৃত্তি শুনাইতেন, প্রাঞ্জল ভাষায় তাহার মর্ম আমাদের বুঝাইতেন। বাংলা ও সংস্কৃতের অনেক শ্লোকই তাঁহার কৃপায় সেই অল্প বয়সে চিমিতে শিখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি আমাদের গল্প বলিতেন—দেশবিদেশের গল্প, মহাপুরুষদের গল্প, দেশনেতাদের গল্প—এবং তখনকার দিনে যাহা শোনা পর্যন্ত গর্হিত বলিয়া উপর-ওয়ালারা মনে করিতেন, দেশপ্রেমিক শহিদদের গল্প। দেশানুরাগের প্রথম পাঠ আমরা পাইয়াছি তাঁহার মত কয়েকজন শিক্ষকের নিকট।

প্রথম যৌবনে মাষ্টার মহাশয় কংগ্রেসের সেবক ও দেশবন্ধুর পোঁড়া ভক্ত ছিলেন। দেশবন্ধুর প্রতি ভক্তি তাঁহার শেষ জীবন পর্যন্ত অবিচলিত ছিল। মনে পড়ে, দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পর যেদিন তাঁহার মরদেহ কলিকাতায় লইয়া আসা হইল, আমরা নগ্নপদে রুক্ষ স্নান করিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম তাঁহার প্রভাবে। "দেশবন্ধুর বজ্রবাণী" নাম দিয়া তিনি এক পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন—তাহাতে দেশবন্ধুর অগ্নিগর্ভ দেশ-প্রেমোদ্দীপক বাণীসমূহের সুন্দর সংগ্রহ ছিল। সেই বই আর আজ পাওয়া যায় না। বোটা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ছোট ছোট চুল ছাঁটা, চরণে পাম্প, হাতে লাঠি, মাষ্টার মহাশয়ের সেই

সমস্তকার মূর্তি আজিও চোখের সামনে ভাসিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া (আজকালকার নবম শ্রেণী) অন্যতম অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে সংস্কৃত লইবার পর তাঁহার লেখা একখানা পাঠ্যপুস্তক পড়িলাম—বইখানার নাম ঠিক মনে পড়িতেছে না, বোধ হয় "Additional Sanskrit Grammar and Composition"; সংস্কৃত শিখিতে, বিশেষ সংস্কৃত হইতে ইংরেজী ও ইংরেজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করা শিখিতে, এই বইটি বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। আমাদের ছাত্রাবস্থায় মাষ্টার মহাশয় এই বইখানি লিখিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। যতদূর মনে পড়ে ইহার পর প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্যের অর্ধপুস্তকই তাঁহার পরবর্তী প্রকাশিত বই। বহুদিন আগেকার কথা, আমার স্মৃতি অবশ্য অভ্রান্ত নাও হইতে পারে।

পড়াশোনা ছাড়া খেলাধূলার বিষয়েও তাঁহার উৎসাহ ছিল অসীম। আমাদের ছেলেবেলায় অভিভাবকেরা খেলাধূলাকে বেশ ভীতির চক্ষে দেখিতেন, খেলা ধূলা করিলে আমরা যে গোল্লায় যাইব তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিতেন। মাষ্টার মহাশয়ের প্রভাবে এই ধারণা তাঁহাদের অনেকটা বদলাইয়া যায়। স্কুলে খেলাধূলার চর্চাও তাঁহার চেষ্টায় শুরু হয়। তিনি নিজেও ছাত্র জীবনে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবলের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই সেদিনও তিনি লীগের ও আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা দেখিতে গিয়াছেন।

মাষ্টার মহাশয়ের সংগঠন শক্তি অদ্ভুত ছিল। এই শক্তি প্রথম প্রত্যক্ষ করি, স্কুলের রবিবাসরীয় "সংপ্রসঙ্গ সভা", পারিতোষিক বিতরণী সভা ও সরস্বতী পূজার ব্যাপারে। মনে আছে, সরস্বতী পূজার রঙনাদি ও ভোজের তদারকি করিবার জন্য কোমরে চাদর বাঁধিয়া লাগিয়া যাইতেন, আর আমাকে দিতেন তাঁহার লাঠিটি রক্ষা করিবার ভার। তাঁহার লাঠি আমার জিম্মায় থাকিত, ইহা ছিল আমার বড় অহঙ্কারের বিষয়। উত্তর জীবনে এই সংগঠনশক্তি একাধিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। অনেক সময়ে এই সমস্ত ব্যাপারে, বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়, তাঁহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাঁহার পুঁজি আরম্ভ সামান্যই ছিল;—এরূপ স্বার্থত্যাগ অসীম মনোবলেরই পরিচায়ক। প্রথম জীবনে যখন তিনি দেশসেবা করিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার কর্ম ও সংগঠন শক্তির প্রচুর পরিচয় পাওয়া গিয়া ছিল। পরবর্তী জীবনে সামান্য পুস্তক প্রকাশন সংস্থাকে প্রসিদ্ধ "বাণীভবন" রূপে দাঁড় করান কম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার পরিচয় নহে। কি কারণে তিনি শিক্ষকতা হইতে সরিয়া আসিয়া পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আত্মনিয়োগ করিলেন তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে অবান্তর। কিন্তু ব্যবসায়ে নামিয়াও তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের ভুলিতে পারেন নাই। প্রয়োজন হইলে তাহাদের দিয়া পুস্তক লিখাইয়াছেন, তাহাদের লেখা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, সময়ে অসময়ে যথাবিহিত সাহায্য করিয়াছেন। আবার, তাহারা অনুরোধ করিলে তাহাদের বিদ্যাদানও করিয়াছেন। শিক্ষক-জীবনে তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাই ছাত্রদের জীবনসংগ্রামের পথেও তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছেন যাহাতে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে। শুধু কি তাই? পুরাতন সহকর্মীদেরও তিনি বিস্মৃত হন নাই—সময়মতন আগাইয়া আসিয়াছেন সাহায্যের জন্য।

পাঠ্য ও অর্ধ-পুস্তক প্রণয়নে এককালে তাঁহার সমকক্ষ খুব কম লোকই ছিলেন। এই সকল পুস্তকে তাঁহার অসীম বিদ্যাবত্তা ও অনুকরণীয়

পড়াইবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই বইগুলি পড়িলে মনে হইত, যেন ক্লাসে না পড়াইয়া তিনি বইয়ের ভিতর দিয়াই আমার ছাত্রদের পড়াইতেছেন। পুস্তকের ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল। সেই অর্থ সদ্ব্যয়ে লাগাইতে কোন সময়ই তিনি দ্বিধা করেন নাই। দান ছিল তাঁহার অপরিমিত। আজ-অনাথা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হইতে সুরু করিয়া শিক্ষকজীবনের দুঃস্থ প্রাক্তন সহকর্মী, পুরাতন ছাত্র, অধীনস্থ কর্মচারিবৃন্দ, কেহই তাহা হইতে বাদ পড়িত না। এই মানুষটির এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যাহা অনন্যসাধারণ। বাহিরে তিনি ক্রোধের ভান দেখাইয়া খুবই তর্জন গর্জন করিতেন, কিন্তু অন্তর ছিল এতই কোমল যে মানুষের এতটুকু দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাইতেন। রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ভিখারীর ছেলেকে মানুষ করিয়াছেন;—তাহার চোখ কান মুটিলে সে পলাইয়া গেল,- তাহাতে মন খারাপ করিয়া তাঁহারা স্বামীস্ত্রী চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—এ এক অপূর্ব দৃশ্য! লোকে ঠকাইতেছে জানিয়াও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই,—"আহা, ও বড় গরিব, ওর ক্ষতি করলে ছেলেপিলেরা রাস্তায় দাঁড়াবে যে।" মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল তাঁহার অগাধ—ব্যবসাক্ষেত্রে বহু ব্যাপারে মুখের কথাই তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। এই বিশ্বাসের ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও তাঁহার এই বিশ্বাসের ব্যত্যয় ঘটে নাই। যাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব থাকিতেন—সুযোগ পাইলেই হইল। আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁহার কতটা বিশ্বাস ছিল বলা কঠিন, যদিও নিমন্ত্রিত হইলে সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন ও আচার-নিয়মাদি মানিয়া চলিতেন। তবে ভগবানে বিশ্বাস তাঁহার গভীর ছিল এবং মানুষের উপর ছিল তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা।

পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা বলিয়া বাহিরের অনেকে তাঁহাকে জানে—কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ও দখল ছিল, তাহা আমরা, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলাম, জানি। তাঁহার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা যে দেখিয়াছে সেই বুঝিবে তাহা কি উচ্চস্তরের! আমাদের পড়াইবার সময় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন তাঁহার পড়ানোর দ্বারা, আবার পরে সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন আমাদের লিখিতে উৎসাহ দিয়া, লেখা প্রকাশ করিয়া। তাঁহার গ্রন্থাগারে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যগ্রন্থের সংগ্রহ ছিল অতুল।

আমার যতদূর মনে পড়ে, সন ১৩০০ সালে তাঁর জন্ম। একষট্টি বৎসর বয়সকে খুব বেশি বয়স বলা যায় না। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা বারেকবার রোগের আক্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। আগের বার যখন কলিকাতায় যাই, তাঁহাকে অসুস্থ দেখিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম আমার এখানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিতে। ব্যবসায়ঘটিত কার্যে ব্যস্ত থাকায় অত্যন্ত আগ্রহসত্ত্বেও তখন আসিতে পারেন নাই, পরে আসিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; কেবল অনুরোধ ছিল, লইয়া আসিতে হইবে, কেন না একলা যাইতে ভরসা হয় না শরীরের জন্য, অথচ এই মানুষই একদিন বাংলার ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছিলেন, পাণ্ডু, গৌড়, পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আর এই সব ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, শুধু দেখার আগ্রহে নয়, জ্ঞান-পিপাসুর আগ্রহে। আমার অদৃষ্টে শেষ পর্যন্ত তাঁহার আসা আর ঘটিয়া উঠিল না। সেই অসুস্থ অবস্থাতেও দেখিয়াছি তিনি জ্ঞান আহরণে নিরত। বস্তুত, পড়িবার ও পড়াইবার তাঁহার সময় অসময় ছিল না। তাঁহার বিদ্যার কথা কি বলিব? এই বয়সেও মনে হইত, তাঁহার নিকট করযোড়ে এখনও অনেক কিছু শিখিতে পারি। ঘটি লইয়া সমুদ্র

যাপিবার প্রয়াস করিলে যেমন হাস্যকর হইবে, আমাদের পক্ষে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গেলে সেইরূপই অবস্থা হইবে। সংস্কৃত উপাধি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাশ হওয়া দিয়া বিচার করিলে চলিবে না। অদম্য জ্ঞানস্পৃহার ফলে অসাধারণ অধ্যবসায়ে তিনি নানা বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। শিখিবার তাঁহার এত আগ্রহ ছিল যে ছাত্রদের নিকট হইতেও কোনও বস্তু জানিবার থাকিলে তাহা জানিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। উত্তর-জীবনে তিনি পুস্তক ক্রয় করিয়া নিজের গৃহে বিরাট এক reference library গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই লাইব্রেরিকে আমরা কত পড়াশোনা করিয়াছি। আমাদের ছিল অবারিত দ্বার, যখন যে পুস্তক প্রয়োজন লইয়াছি, গৃহে আনিয়াছি, আমাদের সময় মত প্রত্যর্পণ করিয়াছি। জানি না, তাঁহার এই অতিপ্রিয় বইগুলির এখন কি দশা হইবে!

নানা কারণে একটু অধিক বয়সে তাঁহাকে সংসারী হইতে হয়। তখন আমরা সকলেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এই একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও আমাদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও নির্ভরতার পরিচয় পাইয়াছি—তিনি আমাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া তবে নিজের মন স্থির করিয়াছিলেন। সংসারী হওয়ার পর তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-বিয়োগ, পুত্র-কন্যার শোক সকলই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাঁহাকে ভাঙিয়া পড়িতে দেখি নাই। পত্রে মাত্র দুইছত্র লেখা, "অমুক তারিখে আমার বড় ছেলেটি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছে। এই বয়সে আমাকে পুত্রশোক সহ্য করিতে হইল।" তাহার পরই অন্যান্য কথা। সাক্ষাৎ হইলে, প্রশ্ন করিলে কেবল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। মনের শোক মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দৈনন্দিন কার্য করিয়া গিয়াছেন। এমন মনের জোর খুব কম লোকেরই দেখিয়াছি।

———

অনগ্রসর শিশু

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

শ্রেণীতে যে সমস্ত শিশু সর্বদা সাধারণ শিশুদের মান থেকে পিছিয়ে থাকে তাদের আমরা বলি অনগ্রসর শিশু। এদের নিজস্ব খেয়াল বা সখ বলে কিছু নেই; শ্রেণীতে সব সময় ম্রিয়মান অবস্থায় থাকে এবং অধিকাংশই খেলাধূলাতে কারও সাথে পেরে ওঠে না।

পশ্চিমে Nursery, Kindergarten School ও Clinic স্থাপিত হয়েছে। সেখানে শিশুদের জীবনকে সুপথে পরিচালিত করবার নানা উপায় আছে। Clinic-এ শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ লাভ করে এবং কাজের সাফল্য দেখে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য তাদের প্রশংসা করা হয়। প্রত্যেকটি শিশুকে যাতে ব্যক্তিগত ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তার সুবন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া যত দিন না তাদের মনোভাবের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তত দিন তাদের সেখানেই রাখা হয়। সেখানকার অভিভাবকেরা তাই শিশুদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত।

আর আমাদের দেশ? এখানে clinic-এর কথা চিন্তা করা আকাশকুসুম, কল্পনা। মোটা

পাড়ার ছিন্ন, মলিন পোষাকপরা অনাহারে দুর্বল শিশুদের নিয়ে আমাদের কারবার। সে দেশে অন্ধ হয় চক্ষুষ্মান, মূক হয় বাক্‌শক্তিসম্পন্ন, বধির পায় শ্রবণশক্তি ও পিছিয়ে-পড়া শিশু পায় অগ্রগতির প্রেরণা। আমাদের দেশে অন্ধ, মূক ও বধিরের দল যেন সমাজের জঞ্জাল। পিছিয়ে-পড়া শিশুর কথা চিন্তা করার অবকাশ আমাদের কোথায়? আমরা যে মেধাসম্পন্ন শিশুকেই অর্থাভাবে পিছিয়ে রাখতে বাধ্য হই। এই নিয়নদেশেই সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে টাকায় আট মন চাল বিক্রয় হতো। এই ঐশ্বর্যহীন দেশেই পর্তুগীজ যাজক মানুচি ও ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ার মোগল রাজত্বকালে যে সম্পদের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা আজ আমাদের কাছে রূপকথার গল্পের মত শোনায়। অথচ আজ এক গৌরবময় যুগে আমাদের শিশুরা এক ফোঁটা দুধ পায় না—অনাহারে বিদ্যালয়ে আসে। পিছিয়ে-পড়া শিশুর দল তাই তো আজ আমাদের এক বিরাট সমস্যা। এ কথা তো সত্য যে, পিতামাতার আর্থিক সংগতি ও সামাজিক মর্যাদাবোধ শিশুর বুদ্ধিবিকাশের সহায়ক। শিশুর চরিত্রও সুরুচি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এদিক দিয়ে বিচার করলে আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।

যেসব শিশু মানসিক বিক্ষোভের জন্ম পশ্চাৎপদ হয় তাদের মধ্যে একদলকে ভীষণ বেপরোয়া ও অপরদলকে তীব্র হীনম্মন্যতা-বোধ-সম্পন্ন হতে দেখা যায়। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকে অভিভাবক এবং অনেক শিক্ষক বিদ্রূপ করে বলেন, 'তোর দ্বারা কিছু হবে না—তুই একটা গোবর গণেশ।' শিশুমনে ঐরূপ বিদ্রূপ যে কি গভীর বেদনা দেয় তা তাদের প্রকাশ করা যায় না। বন্ধুরা খেলার সময় তাদের বাদ দেয়। এর ফলে শিশু মনে করে, সত্যই সে বুঝি একটা 'গোবর গণেশ'! এই প্রসঙ্গে আমার পাঠশালা জীবনের এক লেখাপড়ায় পিছিয়ে-পড়া বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। সে আম চুরি করবার এমন সব কৌশল আমাদের শিখিয়ে দিতো যে আজ সেই কথা মনে হলে বিস্মিত হয়ে যাই। তার বুদ্ধির জোরে আমরা অনায়াসে গ্রামের প্রতিটি বাগান থেকে আম চুরি করতাম। উপরোক্ত ঘটনা থেকে এই বোঝায় যে বুদ্ধির অভাবই সংক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ নয়। বুদ্ধি প্রয়োগের অনিচ্ছাই এর প্রধানতম কারণ। শিশু যদি শিক্ষক কিংবা অভিভাবকের কাছে স্নেহ না পায়, তবে সে অন্যকে স্নেহ মমতা দিতে পারে না। তার প্রকৃতি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সহানুভূতিহীন। পারিবারিক সুখদুঃখ তার হৃদয়কে বিগলিত করে না। শিক্ষক ও অভিভাবকের সামান্যতম অবহেলা শিশুকে খুবই ব্যথা দেয়। স্নেহমমতাহীন মনোভাব শিশুকে বেপরোয়া করে তোলে। আমি তখন নদ্যা ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র। একটি ছাত্রকে অংকের জন্ম শিক্ষক মহাশয় প্রত্যহই শারীরিক শাস্তি দিতেন। শেষে সে বিদ্যালয় ত্যাগ করল এবং প্রকাশ্যেই শিক্ষক মহাশয়কে পথে ঘাটে দূর থেকে শোনাতো,

'শ্যামাচরণের পাঠশালা,
বিদ্যে হবে কাঁচকলা;
গরুর ঘণ্টা গলায় দিয়ে
বসে থাকো বাঁশতলা।'

ছেলেটি যে কি পরিমাণ বেপরোয়া তা তার ঐ বানানো ছড়াটি থেকেই বোঝা যায়। সে সংশোধনের উপায় না পেয়ে নিজেরই প্রকৃতির স্রোতে জীবন ভাসিয়ে দিয়েছিল। পিঠে চাবুক মেরে বুদ্ধিকে যে ধারালো করা যায় না সেই কথা প্রতি শিক্ষকেরই বোঝা উচিত।

বিষয়গত ভাবে বিচার করলে শিশুদের পঠন, লিখন ও অঙ্কে (3 R's) পশ্চাৎপদ দেখা যায়। অনেক শিশু ভীরু। এর ফলে পঠনে তোতলামি

দেখা যায়। জিহ্বার জড়তা, চোখের ও কানের দোষ, যার হাতে লেখার অভ্যাস, মনের ভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশের অক্ষমতা এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবই পশ্চাৎপদ হওয়ার অন্যতম কারণ। তা ছাড়া মানসিক দ্বন্দ্বের জন্য শব্দের দৃশ্যরূপ শিশুর চোখে জড় আকারে ধরা পড়ে। ফলে বানান ভুল বেশি হয়। অত শিক্ষা দেবার ভুলের জন্য শিশুর কাছে শৈশবেই ঐ বিষয়টি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কারণ আমরা বাস্তব ধারণার মধ্য দিয়ে শিশুকে অঙ্ক শেখাই না। বাল্যকালে বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শিশুদের দিয়ে করিয়ে অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক গর্ব অনুভব করেন, মনে করেন যে তাঁদের শিক্ষার্থীরা অঙ্কে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। ঐ কারণেই শিশু উপরের শ্রেণীতে অঙ্ক করবার সময় চোখ বড় বড় করে নিরোধের মত চেয়ে থাকে। তাই যান্ত্রিক ভাবে অঙ্ক শেখান উচিত নয়।

পশ্চাৎপদ শিশুকে সংশোধনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সর্বপ্রথম তার হীনম্মন্যতা দূরীভূত করা উচিত। সমস্ত শিশুর বুদ্ধির মাপ এক হতে পারে না। বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য শিশুকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করা তাই নিন্দনীয়। শিশুকে সর্বদা উৎসাহ দেওয়া উচিত যে, সেও অন্য দশ জন শিশুর মত বুদ্ধিমান। গৃহের পরিবেশ যেন ঐ সব শিশুকে অন্যায় সমালোচনার দ্বারা ক্ষুণ্ণ প্রতিপন্ন করবার জন্য সচেষ্ট না হয়, সেদিকে অভিভাবকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশু যে কাজ অপছন্দ করে সে কাজ তার উপর চাপিয়ে না দিয়ে তার আগ্রহ ও কৌতূহলের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ দিলে সুফল পাওয়া যায়। শিক্ষক এবং অভিভাবক যদি শিশুর আনন্দকে প্রতিহত করে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তবে তা শিক্ষা হয় না। তার গতিকে রুদ্ধ না করে যদি শিক্ষার ক্ষেত্র সুপ্রশস্তিত করা যায় তবেই সে শিখতে অনুরাগী হয়। তা ছাড়া কোন কাজ যখন জন শিশুর পক্ষে প্রিয় অথচ কেন অন্য একটি শিশুর কাছে তা অপ্রিয়—এই তথ্য শিক্ষক এবং অভিভাবককে বিচার করে, সমবেদনা ও সহানুভূতির দ্বারা শিশুকে পরিচালিত করা উচিত। স্নেহের অভাব পরিলক্ষিত হলে শিশু মানসিক স্থৈর্য ও নির্ভরতা হারিয়ে ফেলে।

লিখন, পঠন ও অঙ্কে (3 R's) পশ্চাৎপদ শিশুদের পক্ষে এমনই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পাঠ সম্বন্ধে সংশোধন করতে হলে প্রত্যেক দিনের নাম ও তারিখ বড় বড় অক্ষরে লিখে কতকগুলি কার্ড তৈরি করে তাদের দিয়ে বিদ্যালয়ের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যায়। তারা সেগুলি প্রথমে শিক্ষকের সাহায্যে এবং পরে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ঠিক ভাবে যাতে পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ছড়া মুখস্থ করিয়ে ছড়ার প্রতিটি লাইন, বিভিন্ন শব্দ এবং অক্ষরগুলি বেড় ইঞ্চি চওড়া করে লিখে তাদের দিয়ে খেলা-ছলে মিলিয়ে নিতে উৎসাহী করা যায়। এতে শিশু আনন্দ পাবে, শব্দের দৃশ্যরূপের সাথে ঠিক-ভাবে পরিচিত হবে এবং বিদ্যালয় ও ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে ভীতি কেটে যাবে। হয়তো কতকগুলি আদেশপত্র বড় বড় অক্ষরে কার্ড বোর্ডে লেখা হল। যেমন, বাইরে যাও, ঝাঁট দাও, ছুটি, ছড়া, বল, খেলতে মাঠে যাও ইত্যাদি। শিশুর প্রয়োজনে শিক্ষক মুখে কিছু না বলে যদি ঐগুলি দেখিয়ে আদেশ বা অনুমতি দেন তবে শিশু স্বভাবতই সেগুলি চিনে নিতে প্রয়াসী হবে। পশ্চাৎপদ শিশুকে কোন ভাল খবর বলতে শুনে শিক্ষক যদি সেই কথা কয়টি বিদ্যালয়ের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেন এবং খবরটির প্রশংসা করেন তবে সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে, এবং সেও যে অন্যান্য শিশু অপেক্ষা কোন অংশে ছোট নয় এই বোধ জেগে ওঠে। ঐভাবে দৃশ্যরূপের সহিত শিশুর পরিচিতি ঘটলে বানান ভুল সংশোধিত হয়। বানান

সংশোধনের জন্ত, শিশুদের স্বরচিত অভিধান, শব্দ-গঠন খেলা, ধাঁধার খেলা ইত্যাদির সাহায্যে বানান মুখস্থ করালে, খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বড় কথা যে, শিক্ষক নিজে যেন বানান ভুল না করেন, তবে অনুকরণপ্রিয় শিশুরও সেই ভুল হবে। শিশুর বানান সংশোধনের অন্যতম উপায়, তার পড়া থেকে লেখার ওপর বেশি জোর দেওয়া। শিশুকাল থেকে তাদের রচিত সহজ এবং সুন্দর ছবিযুক্ত বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রয়োজনবোধে শিক্ষকের সাহায্য করাও প্রয়োজন। কতকগুলি phonetic word-ও তাদের শেখালে তারা বেশ আনন্দ পায়। যেমন, খাওয়া দাওয়া, নাওয়া, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি। নীরস পাঠে শিশুর স্বস্তিতে বিদ্যাবস্তু বহুদিন স্থায়িত্ব লাভ করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাঃ মারিয়া মন্তেসরি এক বিপ্লব এনেছিলেন। কীণমেধা বালকবালিকাকে অভিনব কৌশলে শিক্ষা দিয়ে সাধারণ বুদ্ধির ছাত্রছাত্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত করে তুলেছিলেন। শিশুকে গণিত শেখাতে গিয়ে আমরাও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি। প্রথমতঃ শৈশবেই গণিত সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি না এনে দিয়ে তার মধ্যে শিশু যাতে আনন্দ পায় তার সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবেই সে অনাগত ভবিষ্যতে গণিতে আগ্রহশীল হয়ে উঠবে। মন্তেসরির মতে এই সব কীণমেধা কিংবা সাধারণ-মেধা শিশুকে সিকি, আধুলি, দুয়ানি ইত্যাদি ছোট ছোট মুদ্রার সাহায্যে ১০ পর্যন্ত গণনা শিক্ষা দিতে হবে। ১ ইঞ্চি থেকে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত ১০টি বিভিন্ন আকারের ইঞ্চি-দাগ কাটা কাঠির সাহায্যে গণনা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শিশুরা ঐগুলি নিজেরাই আকার অনুযায়ী পর পর সাজাবে এবং ঐগুলি গণনা করবে। বিভিন্ন কাঠির সাহায্যে ১০০ পর্যন্ত গণনা ঐভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। এ ছাড়া তেঁতুল-বিচি, মার্বেল, গুলি ইত্যাদির দ্বারাও যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ শিখবে। পূরণ ও ভাগ যে, যোগ এবং বিয়োগেরই আলাদা 'রূপ' ছাড়া অন্য কিছু নয়—এই বাস্তব ধারণা শিশুকে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাগান করা, বাজার করা ও দোকান দোকান খেলার মধ্য দিয়ে বাস্তবভাবে শিশুকে মুদ্রা, মন, সের বিষয়ক জ্ঞান দেওয়া যায়। এ ছাড়া শিশু প্রত্যেকদিন শ্রেণীতে ক্যালেণ্ডার বদলান, ছাত্র উপস্থিতির সংখ্যা নিরূপণ ও বসবার জন্ত পংক্তি হিসাবে আসন গণনার মধ্য দিয়ে বাস্তবভাবে সংখ্যাবোধ ও যোগের নামতা আয়ত্ত করবে। মন্তেসরি কাগজের তৈরি সংখ্যার উপর সিরিশ কাগজ এঁটে, তার উপর শিশুর অঙ্গুলি সঞ্চালনের দ্বারা সংখ্যা শিখনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সিরিশ কাগজের অভাবে সাদা কাগজের উপর বেলের আঠা দিয়ে সংখ্যা লিখে বালি ছড়িয়ে নিতে পারি। পরে শুকিয়ে নিয়ে তার উপর শিশুকে দিয়ে অঙ্গুলি সঞ্চালন শিক্ষা দেওয়া যায়। এর ফলে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির উন্মেষ সাধন হয়।

পশ্চাৎপদ শিশুর ক্ষেত্রে ঐগুলি শুধু প্রয়োগ করেই নিরস্ত হলে চলবে না। আমাদের বিফল শিক্ষার প্রতিকারকল্পে প্রত্যেক শ্রেণীতে কম-সংখ্যক শিশু এবং বর্তমান অনুপাতে বেশি শিক্ষক প্রয়োজন। অন্যথায় সমস্ত শিশুর প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করা যায় না। শিশুর বুদ্ধির মাপ, মানসিক বয়স ও সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' বলে শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকে বিভক্ত করা কর্তব্য, তেমনই আবার তাদের স্বাধীন-ভাবে কাজ করতে দেওয়া প্রয়োজন। শিশু বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে সৃজনাত্মক কাজের মূল্য দিয়ে তার সর্বপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণের প্রতি সচেতন হতে হবে। তাকে নিষ্ক্রিয়তা ও অবসাদ হতে মুক্ত রাখবার জন্ত তার কর্মগৃহ হবে আলোবাতাসপূর্ণ। সে তার স্বাধীন মন নিয়ে স্বেচ্ছায় আপন কর্মে লিপ্ত থাকবে। তবেই শিক্ষা হয়ে উঠবে সার্থক ও সুন্দর, তবেই পশ্চাৎপদ শিশু অগ্রগতির পথে জয়যাত্রা করবে।

———

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্মরণে

শ্রীমগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গত বৎসর ১৬ই জুন সিনেট হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অনুজ শরীরেও পুত্রকন্যাসহ উপস্থিত ছিলাম। কারা-বিভাগীয় মন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর মহাশয় ভারতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের জীবনী ও লেখা সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচারের জন্য সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গত এক বৎসরে ডাঃ ধরের অনুরোধ কতদূর পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে জানি না। আলোচনা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে আচার্যদেবের সঙ্গসুখের আমার ৭।৮ দিনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা বিবৃত করিয়া ডাঃ ধরের অনুরোধ পালনে অভিলাষী হই। দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে আচার্যদেব অবতরণ করেন নাই সত্য, কিন্তু বাংলার জন্য দেশাত্মবোধ বোধ হয় যেন নেতার চেয়ে তাঁর কম ছিল না। সভায় ওজস্বিনী বক্তৃতায় কিংবা খবরের কাগজের মাধ্যমেই তাঁহার দেশাত্মবোধ বিলীন হইয়া যায় নাই। ব্যবহারিক কার্যে উহা ফুটাইয়া তুলিতে আর দ্বিতীয় একজন দৃষ্ট হয় না। মহাত্মাজীকে আমরা জাতির জনক আখ্যা দিয়াছি, আচার্যদেবকে আমার মতে বাঙালী জাতির জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী হইয়াও তিনি কেবল বিজ্ঞান চেষ্টায়ই নিরত থাকিতেন না। Plain living and high thinking কথাটার প্রকৃত মানে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাপনের পদ্ধতি দেখিয়া। বাংলা দেশে যেখানে বন্যা, যেখানে দুর্ভিক্ষ শুনিতেন অমনই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত সেই স্থানের লোকের জন্য, খুলিয়া যাইতেন সব কিছু সঙ্কটত্রাণের জন্য। আবার বাংলার যেখানে কুসংস্কার, যেখানে গলদ, সেইখানেই তিনি হইতেন অগ্নিশর্মা। হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রূঢ় ভাষায় গালি হইতে কাহাকেও রেহাই দিতেন না। অপ্রিয় সত্যকথনেও তাঁহার কখনও মুণ্ডা আসিত না। যশ, খ্যাতি, লোক-প্রিয়তার তোয়াক্কা তিনি করিতেন না। কটূক্তি, প্রাদেশিকতা, কিংবা সঙ্কীর্ণতা দোষে অনেকের কাছে দোষী হইতে পারেন জানিয়াও বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সর্বদা দৃঢ় ছিলেন। পিতা যেমন পুত্রের ত্রুটির জন্য গালাগালি দিতে দ্বিধা করেন না, তেমন আবার সেই পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য পিতা যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতেও ইতস্তত করেন না। আচার্যদেব অকৃতদার ছিলেন, পুত্র বলিতে তাঁর প্রিয় ছাত্রমণ্ডলী আর কন্যা বলিতে "বেঙ্গল কেমিক্যাল"। সামান্য ৮০০৲টাকা মূলধন নিয়া আপার সারকুলার রোডের অন্ধকার ঘরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া আজ বাংলার শত শত ঘরের অন্ন সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। উহা একটি কত বড় জাতীয় গর্বের সম্পদে দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, এই প্রবাদবাক্যের সত্যতার প্রমাণ এইখানে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির গলদ দূরীভূত করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আবার তাঁহার উপার্জিত অর্থের উত্তরাধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ই হইয়াছে। ছাত্রোপায়ং অধ্যয়নং তপঃ কিং? সাধনা কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিয়েছে, তাঁহার রাসায়নিক আবিষ্কার, হিন্দু-রসায়নশাস্ত্র-ইতিহাস রচনা। তাঁহার "নাগার্জুন

বৃত্তি" এক দিকে জগতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানপিপাসু যুবক অহংপ্রেরণা যোগাইতেছে।

১৯২৩ সালের বাগেরহাট কলেজে (বর্তমান প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ) আই. এস্-সি পড়ি। যে দিন শুনিলাম আচার্যদেব কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের ডেমনস্ট্রেশন দিতে আসিবেন, মনে আনন্দ আর ধরে না। ১৬।১৭ বৎসর বয়স, মনটা সাদাসিদে, ইচ্ছা হইল আচার্যদেবের একখানা ছবি পেনসিল দ্বারা বড় করিয়া আঁকিয়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া ছবিখানি আঁকিলাম। ছবির তলায় নিজের নাম ছাপার অক্ষরে সুন্দর করিয়া লিখিলাম। পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশে কলেজ প্রাঙ্গণে সমবেত সভায় আচার্যদেবের হাতে ছবিখানি দিলাম। কলেজের দেবতুল্য অধ্যক্ষ কামাখ্যা নাগ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, আমার সহপাঠী শম্ভুও একখানি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছিল। কোন কারণবশত সে তাহার ছবি সভায় উপস্থিত করে নাই। অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে আমার নাম পড়িয়া গেল। সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীর স্পর্শরূপ দুরুক আমার লৌহ-প্রাণকে আকৃষ্ট করিল। আমার আচার্যদেবের কাছ ছাড়িতে আর ইচ্ছা হয় না। তিন চার দিন কলেজে ডেমনস্ট্রেশন হইল—ইহার ভিতরেও তাঁহার রসিকতা, পশপ্রথায় গালাগালি,—জলের ভিতর কি যেন মিলেন (নামটা এখন ভুলিয়া গিয়াছি), অমনই চট পট করিয়া চতুর্দিকে চটপটি বাজির মত ছুটিতে লাগিল; উনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাপুরা ঘুরে সরে পড়, নতুবা তোমাদের কয়না মুখে দাগ পড়বে, তোমাদের বাপ-মায়ের হাজার টাকা পণের লোকসান হবে।" ছেলের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছাত্রের দল অধ্যাপক-বৃন্দ অনেকেই তাঁর কাছে কাছে থাকিতেন। কোন সময় দোহারা চেহারার যুবকের ঘাড়ে হেলে বসিতেন। আচার্যদেব ছাত্রদের সঙ্গে ঠাকুরদাদার মত ব্যবহার করিতেন। ছাত্রগণও তাঁহার কিল, চড়, লাথি খাইবার আশায় অনেক সময় ইচ্ছা করিয়া বেখাপ্পা কথা বলিত। অল্পবয়স্ক অধ্যাপকও তাঁহার কাছে রেহাই পাইতেন না। অধ্যাপক নগেনবাবুকে "বেবি প্রোফেসর" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রেল লাইনের কাছে দশ আনির জমিদার কলেজের যেখর যতদূর মনে পড়ে কিরণবাবুর বাড়িতে আচার্যদেব নিমন্ত্রিত। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেখানেও উপস্থিত, তাঁহার আহার করা দেখিতে। তাঁহার চতুর্দিকে অনেকগুলি বাটি ভর্তি তরিতরকারি, মৎস্যের নানাপ্রকার কাল, ঝোল, ভাজা দ্বারা সাজান। মনে হইল যেন নূতন বর আসিয়াছেন। আমার ভাত দুমুঠার বেশি নয়, তারও অর্ধেক উনি খাইলেন কি না সন্দেহ; প্রত্যেক বাটিতে আঙুলি স্পর্শ করিলেন আর জিভে ছোঁয়াইলেন, আর বলিলেন, 'বেশ রান্না হয়েছে, বেশ সুস্বাদু।" কি খাইয়া যে উনি বাঁচিয়া থাকিতেন উনিই জানিতেন। বিকাল বেলায় অন্তত একটি বাতাবি লেবু গোটা খাইলেন। বাতাবি লেবু আর আমিরস তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। তাই মনে হইত, বাতাবি লেবুটি বোধ হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। বাগেরহাট হইতে মৌলভপুর কলেজে যাইবেন, ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়াছেন, হঠাৎ আমাকে বলিলেন, "তুই পি. সি. রায়ের সঙ্গে মৌলভপুর কলেজে যাবি, দেখ্‌বি তোর কত আদর।" আমি গাড়িতে উঠিয়াই হাতের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম, এক ছাত্রবন্ধুকে বইগুলি রাধাচরণবাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়া দিতে বলিলাম। রাধাচরণবাবু বাগেরহাটের নামজাদা মোক্তার ছিলেন। তিনি আমার অন্নদাতা, তাঁর অনুমতি না নিয়াও মৌলভপুর রওনা হইলাম। জানিতাম, তিনি আমাকে কিছু বলিবেন না, তিনি ভাল মানুষ। ট্রেনে উঠিয়া যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে

পাইলাম! কি যে সুখ, কি যে আনন্দ, কি যে গর্ব, আর বোধ হয় জীবনে ঐরূপ হইবে না। আচার্যদেবের সুটকেশ, টাকা পয়সা চাবি সবই আমার জিম্মায়। পথিমধ্যে এক স্টেশনে অন্নের বদ পাইখেরের বিজ্ঞাপন দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, এখানেও যে বেঙ্গল কেমিক্যালের পাইরেক্সের বিজ্ঞাপন।" আচার্যদেব আমার পরিচয় নিলেন। আমি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্র শুনিয়া বরিশালের পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার দত্ত ও প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের জয়-ধ্বনী কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, "তুই নমঃশূদ্রের ছোঁয়া জল খাস?" আমি বলিলাম 'না'। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি তুই গ্লাস জল রাখব, এক গ্লাস কুলীন ব্রাহ্মণ ছোঁয়া, অন্য গ্লাস নমঃশূদ্র ছোঁয়া, তুই চিনে নিতে পারবি, কোন গ্লাস কুলীন ব্রাহ্মণের আর কোন গ্লাসটি নমঃশূদ্রের? যদি পারিস্ নমঃশূদ্রের ছোঁয়া জল খাস না।" আমি হতভম্ব হইলাম। সেই দিন হইতে আমার জীবনে এক নূতন সাড়া আসিয়াছে। ত্রিশ একত্রিশ বৎসর পূর্বে পাড়াগাঁয়ে ব্রাহ্মণসমাজের অনেক গালি নিন্দা হজম করিতে হইয়াছে। সন্ধ্যা ঘাটেই আচার্য-দেবকে অভ্যর্থনা করিতে গৌরনদী কলেজের ছাত্রদল আসিয়া ফেরিতে উঠিয়াই আচার্যদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার লাট্টিখানা তুলে যাও নাই তো? ওখানা কিন্তু তুই তিন বার বিলাত ঘুরে এসেছে।" লাট্টিখানা কিন্তু তাড়া-বাঁকা, হিজলের। আমরা গৌরনদী পৌঁছিলাম। নদীতে ছোট্ট নৌকা আচার্যদেবের সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত। নৌকার উপর ছোট একখানি গৌকি মাদুর ছিল। আচার্যদেবের পাশে বসিলাম। সেবাশ্রম পর্যন্ত আমাদের ভ্রমণ হইল। বাক্কিমের আটিয়ালি সুরের গান উনি খুব পছন্দ করিতেন, তারও বন্দোবস্ত হইয়াছিল। গেষ্ট হাউসে আমাদের থাকিবার স্থান। সারি সারি লোক আচার্যদেবকে দেখিতে আসিল। কেহ বা আচার্যদেবের সার্টি-ফিকেটের জন্য উপস্থিত। উনি আমাকে গোপনে বলিয়া দিলেন, "ওরে, আমার সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নাই। সবাই জানে পি. সি. রায় সবাইকে সার্টিফিকেট দেন। কাজেই কাউকেই বিমুখ করিস্ না।" খুলনা-যশোহরের ইতিহাস-লেখক সতীশবাবুর বাড়িতে আমার আহ্নিকের ব্যবস্থা হইল। ঠাকুরঘরে বসিলাম, কোষাকুষি টুং ঠাং করিলাম। কোন মতে ঘড়ি দেখিয়া দেখিয়া আধঘণ্টা কাটাইলাম। সর্বক্ষণ আমার দৃষ্টি ছিল সম্মুখের টেবিলের উপর; দুই বোতল দোলুতা আর মিষ্টিতে ভর্তি। প্রায় অর্ধেক সাবাড় করিলাম। তৎপর আচার্যদেবের কাছে গেলাম। রাত্রি দশটা নাগাদ এক মেসে থাকবার ডাক পড়িল। বন্দোবস্তটা অদ্ভুতের, আমি পি. সি. রায়ের লোক। আহারান্তে আচার্যদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "স্যার, আমি কাঁঠালতলা মেসে গিয়া ঘুমাইব।" কারণটি আর ওঁর কাছে ভাঙ্গিলাম না। শুনিয়াছি উনি অনেক রাত্রি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। একে তো আলোতে ঘুমের ব্যাঘাত নিশ্চিত, তদুপরি গেষ্ট হাউসের বিছানাপত্র সব ধবধবে সাদা, উহা আমার সহ্য হইবে কেন? আমার পরিধানে ময়লা কাপড়, গায়ে বিছানায় চাদর, খালি পা। পাছে বিছানাপত্র নোংরা হয়, এ ভয়ও ছিল। আচার্যদেব আমাকে বলিলেন, "তোকে কে এখানে থাকতে দেবে?" আমি বলিলাম, "আমার এক বন্ধুর দাদা আছেন কাঁঠালতলা মেসে।" বন্ধুটি হইলেন উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীকিরণ গুপ্ত (গুরুদা); আমি গুরুদার ঘরে গিয়া আরামে ঘুমাইলাম। ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বিলম্ব হইল। আচার্যদেবের কাছে যাইতেছি এমন সময় গৌরনদী কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ

বিজনবাবু আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি কেমন যে, রাত্রে ঔষধ খেতে পারলেন না; তুমি চাবি নিয়ে এসেছ। রাত্রি একটার কালে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তোমার বলে যাওয়া উচিত ছিল না?" আমি নীরবে নতমস্তকে আস্তে তাঁকে বলিলাম, "অবার আমি ভুলকে দিব।" মনে মনে একটু ভয়ও হইল। তাড়াতাড়ি শিউলি ফুলের একগাছা বড় মালা তৈয়ারী করিয়া সঙ্গে নিলাম। আচার্যদেবকে মালাটি পরাইয়া দিতেই উনি হাসিয়া বলিলেন, "তুই আমার গত রাত্রে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলি।" আমি উত্তরে বলিলাম, "স্যর আমিতো আপনাকে বলে গিয়েছি কাঁঠালতলা যেসে কিরণ ভণ্ডের ঘরে। আপনার যদি স্মরণ শক্তির বিভ্রাট ঘটে সেজন্য দায়ী কে? চাবিটা আপনি রেখে দিতেও পারতেন। আর কে জানে রাত্রি একটায় সুস্থশরীরে মানুষে ঔষধ খায়। গ্রাম্য কবিরাজদের মত ৭ দিনে এক দিন ঔষধ বাদ দিতে হয়। তাই বলছি অনেক পণ্ডিতের—" উপস্থিত সকলে আমার জবাবে চমৎকৃত হইলেন। বিজনবাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্যর আমার পিঠে দুই কিল বসাইলেন, সব কিস্তি মাৎ। দু তিন দিন দৌলতপুর থাকিয়া পুনরায় বাগেরহাটে আসিলাম। কলেজে অন্য ছেলেদের কাছে ঈর্ষার পাত্র হইলাম, নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। তৎপর আর একবার শিরোজপুরে আচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। শিরোজপুর কনফারেন্সে আচার্যদেব সভাপতি ছিলেন।

আচার্যদেবের পাল্কীতে বসিয়া আনারস কাটিতেছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে এসে আনারসটি উনি তুলিয়া নিয়া কাদাটির একটি ফরসাছেলেকে দিয়া বলিলেন, "বাবুগুলি বড় কিপ্‌টে, কিপ্‌টেরা আনারস কাটিতে পারে না।" এই আমার তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। কলিকাতায় আসিয়া আর আমার ভাগ্যে আচার্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই। ত্রুটি আমার।

শেষ, যৌবনের প্রারম্ভে সামান্য ছবিটিকে পূজা করিয়াছিলাম, এখন প্রৌঢ় বয়সে ৩১।৩২ বৎসর পরে সেই স্মৃতি রক্ষা তোমার স্মৃতি দিবসে পূজা করিলাম। তুমি অমরধামে বসিয়া আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর। আমি কবি নই, আমি বিদ্বান নই, আমি সাহিত্যিক নই, আমি বক্তা নই, আমি নির্গুণ। তুমি নির্গুণেরও প্রাতঃস্মরণীয়।

দার্জিলিং-এর পথ

শ্রীআশুনাথ সেন

ছেলেদের নিয়া গল্প বলিতেছিলাম—সকালে ১০টা ২৫এ শিয়ালদহে ট্রেনে চাপিয়া, দমদমার পরে বালি-পোল পার হইয়া একেবারে বর্ধমানে পৌঁছিলাম। পরে বিখ্যাত বোলপুর (শান্তিনিকেতন) পার হইলাম। বৈকালে সাহেবগঞ্জের নিকট সকরিগলি ঘাটে স্টীমারে গঙ্গা পার হইতে ৩।৪ ঘণ্টা লাগিল। ওপারে মনিহারী ঘাট হইতে কাটিহার গিয়া অনেক বিলম্ব হইল। রাত্রিতে বিশ্রাম করা গাড়িতে আরামে ঘুমাইয়া, ৭টায় শিলিগুড়ি পৌঁছিলাম। উহার ৭ মাইল আগে বিমানপোতের স্টেশন বাগডোগরা পার হইয়া ছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে ২ ফুট চওড়া মীটার লাইনের ছোট গাড়িতে বদল করিয়া ১০টায় কার্সিয়াং পার হইয়া সাড়ে বারটায় দার্জিলিং

পৌঁছিলাম। বিমানপোতে রহদম হইতে ২ ঘণ্টায় বাগডোগরা ও ৬ ঘণ্টায় দার্জিলিং অনেকবার গিয়াছি। কিন্তু রহদম পৌঁছাইতে ও রওনা হইতে আরও বেশি ২ ঘণ্টা—মোট ৮ ঘণ্টা লাগে। সেই আন্দাজে রেলে ২৬ ঘণ্টা বেশি মনে হইতে পারে। কিন্তু আগে শিয়ালদহ হইতে রেলে ৯ ঘণ্টায় শিলিগুড়ি ও ১৩।১৪ ঘণ্টায় দার্জিলিং পৌঁছান যাইত।

বাবলু জিজ্ঞাসা করিল, সে কবে। আমি বলিলাম, "তোমার জন্মের ২ বৎসর পূর্বে, ১৯৪৭ সনে, অর্থাৎ বঙ্গদেশ বিভাগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত—অবশ্য ১৯১৪ সনে নিম্ন গঙ্গার সারা পোল নির্মাণ হওয়ার সময় হইতে।"

বাবলু জিজ্ঞাসা করিল, "তার আগে?" আমি বলিলাম, "তার আগে সারার পোল ছিল না। জাহাজে সারা হইতে ওপারে দামুকদিয়ার গঞ্জ পার হইতে হইত।" একথা মনে থাকিবার বিশেষ কারণ এই যে ১৯০৪ সনে একবার ঢাকা হইতে রাজসাহী খেলিতে গিয়াছিলাম। গঞ্জ পার হইয়া নাটোর পর্যন্ত রেলে গিয়া পরে গরুর গাড়িতে ২৭ মাইল পথে রাজসাহীতে যাই, কারণ রাজসাহীর রেলপথ তাহার অনেক পরে হয়। ১৮৭৮ সনে মিটার (৩০ ইঞ্চি) গেজের উত্তরবঙ্গ রেল খোলা হয়। ইহা দামুকদিয়া হইতে সমস্ত রাস্তে শিলিগুড়ি নিয়া যাইত। সারা-পোল তৈয়ারী হওয়ার পরে অল্পদিনেই এই লাইন চওড়া (৫' ৬") করিয়া, গাড়ি বদলের সময় নষ্ট ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করা হইয়াছিল।

বাবলু জিজ্ঞাসা করিল, "শিলিগুড়ি পর্যন্ত না হয় এই রেলগাড়িতে যাওয়া গেল; তারপর শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং কিরূপে যাইত?" উত্তর দিলাম যে বর্তমানে রেল লাইনের ধারে ধারে যে বিস্ময়কর গাড়ির রাস্তা দেখা যায়, তাহাই পূর্বে ১৮৬১ সনে তৈয়ার হইয়াছিল এবং পাল্কী বা গরুর গাড়িতে বা ঘোড়ায় শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং যাওয়া যাইত। কিন্তু ১৮৭৮ সনে রেল লাইন শিলিগুড়ি পর্যন্ত খোলার পরে, ২।৩ বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৮১ সনে, দার্জিলিং-শিলিগুড়ি লাইন তৈয়ার হইল। সুতরাং গাড়ি বদল ভিন্ন আর কোন অসুবিধা রহিল না। এখনও এই অসুবিধা আছে; রেলে পাহাড়ে উঠিতে সব রেল ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

বাবলু জিজ্ঞাসা করিল যে ১৮৭৮ সনে রেল লাইন তৈয়ারীর পূর্বে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি কি রকমে পৌঁছান যাইত। উত্তরে বলিলাম যে পূর্বে ভাগীরথী মহানদী নৌকাপথে গিয়া, পরে ঘোড়ায়, পাল্কিতে অথবা পায়ে হাঁটিয়া বহুদিনে অতিকষ্টে শিলিগুড়ি যাওয়া যাইত। ১৮৬০ সনে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ভাগীরথীর পারে পারেই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল তৈয়ারী হইয়াছিল এবং ১৮৬৬ সনে পদ্মা শিলিগুড়ি রাস্তা খোলাতে উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের পথ হয়। ইহাই আসামে অথবা দার্জিলিং-এ যাওয়ার উপায় ছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে এই সব কালে নৌকায় যমুনা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র নদীতে পাহাড়ে বা আসামের দিকে চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল।

বাবলু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তার আগে?" উত্তরে বলিলাম যে এপর্যন্ত স্বাস্থ্যনিবাসের অনুহাতে ও চা বাগানের দরুণ এই সমস্ত রাস্তা ঘাট করা হইয়াছে। তাহার পূর্বে বিশেষ রাস্তা ঘাট ছিল না। নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি দেশের পাহাড়ী জাতিদের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে শুধু সৈন্যের চলাচলের দরকার হইত। রাস্তার বালাই ছিল না। একটি সামরিক রাস্তা ১৮৪০ সনে, পাঙ্খাবাড়ী হইতে কার্শিয়াং হইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া দার্জিলিং পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছিল এবং এখনও বর্তমান। অন্যান্য ভাল রাস্তা তৈয়ার হওয়াতে এই রাস্তা এখন ব্যবহারই হয় না।

বাবলু অত্যাসন্নত বলিল, "তার আগে ?" এদিকে লোক আসিত না। তবে বহু প্রাচীন কালে, ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব হইতে তীর্থযাত্রীরা হিমালয়ের আরও অনেক পশ্চিমে গঙ্গার উৎস, কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর ইত্যাদি স্থানে যাতায়াত করিত। বাবলু বলিল, "তার আগে ?" আমি শেষ করিলাম, "তার আগে হিমালয় ওঠেই নাই ; উহা সমস্তই সাগরের তোরা ছিল এবং এই সাগর পূর্ব পশ্চিমে মহাদেশগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিত। অত্যন্ত উষ্ণ বায়বীয় অবস্থায় সূর্য ঘুরিবার কালে, পৃথিবী সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া প্রথমে তরল অবস্থা এবং পরে উপরে কঠিন আবরণ হাপ্ত হয়। এইবার অবিরত মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ার পরে সূর্য-কিরণে মহাদেশ, সাগর ইত্যাদি বর্তমান পরি-স্থিতিতে প্রকাশ পায়। হয়তো সূর্যও আকাশের অসংখ্য ঘূর্ণায়মান ছায়াপথের একটি হইতে ঐভাবে গঠিত হয়। বড় হইলে এই সব আশ্চর্যকর বিষয় জানিতে পারিবে। এখন চুপ, আর না।"

অভিভাবকের অভিজ্ঞতা

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী

বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার অন্ত নেই। তার ভেতর উদ্বাস্তুদের অনিশ্চিত অবস্থাই সব চেয়ে বেশি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নানা কারণে। অবশ্য সমাধানের প্রচেষ্টা যে হচ্ছে না তা নয়, তবু জনসাধারণের মনে আশঙ্কার শেষ নেই, কেমন যেন নির্ভরতার অভাব।

এই সব কারণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্য সমস্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তেমন ভাবে আর হয় তো ভাবিয়ে তোলে না। উদাহরণ-স্বরূপ শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসঙ্গই তোলা যেতে পারে।

আজকাল তো ইস্কুলে ভর্তি করানোই সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবেশ অবশ্য ভাল, কিন্তু নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই তাতে পড়বার সুযোগ পায়—এ ছাড়া অর্থাৎ সরকারী ইস্কুলগুলো বাদে অন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের বসবার উপযুক্ত স্থানের অভাব, ঘরের সঙ্কীর্ণতা সত্যি সত্যিই শুধু যে ভয়াবহ তা নয়, পরিবেশও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আলো বাতাসের তো অভাব বটেই, টেবিল বেঞ্চের অবস্থাও শোচনীয়। কাজেই শিক্ষা দান এবং গ্রহণের মান এ সব ক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয়। অথচ স্কুল পরি-চালনার নিয়ম কানুন মেনে চলবার জন্য না কি কড়া নজর রাখা হয়!

বাস্তবে কিন্তু ইস্কুল মানেই আজকাল দাঁড়িয়েছে —যেন দৈনন্দিন পরীক্ষাকেন্দ্র। অর্থাৎ শিক্ষক মশাই নির্দেশ দিয়েছিলেন—কাল অমুক পাতা থেকে অমুক পাতা পর্যন্ত পড়ে আসবে, গোটা দশেক কম পক্ষে অঙ্ক কষে আনবে, তার ওপর রচনা ধরণের লেখা তো চাই। ফলে শিক্ষা যেটুকু তা প্রায় বাড়িতে বসেই ছাত্রছাত্রীদের সেরে নিতে হয়, কাউকে অভিভাবকের সাহায্যে, কাউকে বা গৃহশিক্ষকের সহায়তায়। পরে ইস্কুলে এসেই তার উদ্গিরণ। এখন বাংলা ইস্কুল খুবই কম আছে—যেখানে পড়া তৈরী করিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে নেওয়া হয়। পাঠ্য-তালিকা, বিষয়-বস্তুর নির্দেশনামা ইত্যাদিও এই বৈষম্যমূলক

যে তাতে ছাত্রছাত্রী আরো বিভ্রান্ত এবং ভীত হয়ে ওঠে। কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে খেয়াল-খুশি মত শুরু থেকে ইংরেজি শেখান হচ্ছে, কোথাও বা চতুর্থ শ্রেণী পেরিয়ে গেলে। কোথাও বা হিন্দী বাধ্যতা-মূলক—অথচ শেখাবার ব্যবস্থা অত্যন্ত শৈথিল্যপূর্ণ। পুস্তক নির্বাচনও তথৈবচ। স্কুপোলের মত বিষয় পড়ান হচ্ছে, কিন্তু মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় না। সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দেবার অন্যতম সময় নির্দিষ্ট ঠিকই থাকে অথচ অসাধারণ অন্যতা আর কিছুতেই দূরীভূত হয় না—ক'রণ এটাকে একটা ছুটীর ঘণ্টাই ধরে নেওয়া হয়। এছাড়া ড্রিল-এর নামে যে সব ঘণ্টা ধার্য করা থাকে তাতে ড্রিল বাদ দিয়ে আর সব কিছুই হোৎ করি হয়। যুক্তির খাতিরে না কি এ সব ঘণ্টাকে নিয়মানুবর্তিতা শেখাবার সময় এবং ক্ষেত্র বলে ধরা হয়।

অবশ্য এ অবস্থা যে সব ইস্কুলেই এমন নয়—তবে বেশির ভাগ ইস্কুলেই, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। অভিভাবকেরাও দায়ী কম নন। স্থিরভাবে বিচার করলে দেখা যায় অভিভাবকেরা যেন নিজের ছেলেমেয়েদের অন্যের হেপাজতে (অন্তত ইস্কুলের সময়টুকু) আটকে রেখে ঐ সময়-টুকু আত্মরক্ষা করে থাকেন, অর্থাৎ তাদের দিন-যাপন ঝামেলা থেকে নিজেদের দূরে রাখতেই উদ্মুখ। এতে আত্মিকতার অভাবের স্বরূপটাই কি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে না?

শিক্ষকসম্প্রদায় অবহেলিত, সে সম্বন্ধে হয়তো দ্বিমত নেই, কিন্তু সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি স্বার্থপরতা আর ব্যবসাবুদ্ধির প্রাধান্যই দেখা দেয় তবে ভবিষ্যত অন্ধকারই হয়ে যাবে। ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাদের নিঃস্বার্থ সম্পর্কের শেষ সূত্রটুকুও সম্পূর্ণ আলগা হয়ে যাবে, সেটা শুধু অবাঞ্ছিত নয়—দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। শিক্ষকসম্প্রদায় যে এ সম্বন্ধে একেবারে অবহিত নন তা নয়, তবে অনেক সময় অভি-ভাবকদের অশুভাগ্রহের আবর্তে তাঁরা যেন গা এলিয়ে দেন। নচেৎ এহেন পরিণতি, নিশ্চয়ই কখনও সম্ভব হোতো না।

গৃহশিক্ষক নিয়োগ এবং 'টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান'-এর অস্তিত্ব অনুমোদনের বিষয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিচারের সময় এসেছে। স্কুল-শিক্ষার সঙ্গে এরা যেন প্রতিযোগিতা করে চলতে উদ্যত। অবশ্য লক্ষ্য যদি 'কোয়ান্টিটির' উপর হয় তা হলে বলবার কিছু নেই, কিন্তু 'কোয়ালিটি' সম্বন্ধে কি সবাই উদাসীন!

কিন্তু সমস্যা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক সমাধান সম্বন্ধে সচেতন এবং সচেষ্ট হলে অন্তত আশ্রমের পরিচয়ে সুফল বা সাফল্যের আভাস সুস্পষ্ট হবে।

বিভ্রান্তের প্রত্যাবর্তন

শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত

নিত্যানন্দবাবু দিনরাত পড়াশুনা নিয়াই মত্ত হইয়া আছেন। মানুষকে পড়াইতে বা পড়াশুনার ব্যাপার লইয়া আলাপ আলোচনা করিতেই তিনি ভালবাসেন। কোন কোন দিন এই সমস্ত আলাপ আলোচনায় এতটা মত্ত হইয়া যান যে, স্নানাহারের কথাও তাঁহার মনে থাকে না। সাধারণত দুইটার দিনে দুইটা আড়াইটার পূর্বে তাঁহার খাওয়া দাওয়া হইয়া উঠে না। নিজের দিকে তাঁহার একটুও নজর নাই। সংসারের ঝামেলা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে না। তাঁহার সহিত সামান্য একটু আলাপ আলোচনা করিলেই মনে হয়, তিনি এক উদাসীন সদাশিব পুরুষ। জীবনের প্রায় চল্লিশটি বৎসর এই ভাবেই কাটাইলেন। বিবাহের কথাটি যে তাঁহার মাঝে মাঝে মনে না হয় এমন নয়। তাঁহার চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি সবেমাত্র এম্. এতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইউনিভারসিটি হইতে বাহির হইয়াছেন, চারিদিক হইতে ধনী সম্প্রদায় তাঁহাকে আয়ত্তা করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল, তখন যেমনটি তাঁহার মনে বিবাহের বাসনা জাগিত এখন কিন্তু আর মনের অবস্থা তেমনটি হয় না। শিশুকাল হইতেই তাঁহার বড় হইবার অদম্য বাসনা। তিনি নীচতা হীনতাকে প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা করেন। মানুষের উন্নতিতে মানুষের কেন আনন্দ হয় না, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। প্রথম প্রথম তিনি মনে করিতেন, শিক্ষিত লোকমাত্রই অপরের উন্নতিতে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রমে বাস্তব জগতে চলিতে চলিতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তথাকথিত এই সমস্ত শিক্ষিতদের মধ্যে এ জিনিসটার নিতান্তই অভাব। তিনি দেখিলেন, যাহাদের মঙ্গলের জন্য—যাহাদের উন্নতির জন্য তিনি নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, কার্যকালে দেখিতে পাইলেন, যখন তাঁহার নিজের কর্মক্ষেত্রে কোন উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখন এই সমস্ত বন্ধুরাই তাহাতে বাদ সাধিয়া বসিয়া আছে, এবং তাহাদের অপকৌশলেই তাঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পণ্ড হইয়া গিয়াছে। গত পনর বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবনে এইরূপ আঘাত অনেকবারই আসিয়াছে। এই সমস্ত আঘাতগুলিকে তিনি কিন্তু হাসিমুখেই বরদাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, এমনতর সময়বিশেষে তিনি নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে করিতেন, কয়েকদিন এইভাবে কাটিবার পর আবার সমস্তই ঠিক হইয়া যাইত। তিনি আবার তাঁহার পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন, আর ছাত্রছাত্রীদের লইয়া মত্ত হইয়া উঠিতেন। ছাত্র পড়াইবার তাঁহার যে কি উদগ্র আগ্রহ, তাহা কেহ স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না। অনেকেই হয়তো মনে করিবেন, ছাত্র পড়াইয়া নিত্যানন্দ বাবু বেশ দুই পয়সা রোজগার করেন। তাহা কিন্তু নহে। এই বিংশ শতাব্দীতেও কেহ যে বিনা পয়সায় এমন আগ্রহ সহকারে এমন আমন্ত্রের সহিত এতটা পরিশ্রম করিয়া ছাত্রদের মানুষ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা মানুষ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না নিশ্চয়ই। ছাত্রেরা ভাল ফল করিলেই তিনি খুসী, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। হয়তো কেহ বি. এ পাশ করিয়া চাকুরী করিতেছেন। হঠাৎ নিত্যানন্দবাবুর সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

অমনি তাহাকে ধরিয়া তিনি এম্. এ পরীক্ষা দেওয়াইয়া ছাড়িলেন। দেখা গেল, ভদ্রলোক চাকুরী করিতে করিতেই এম্ এ পাশ করিয়া গেলেন এবং চাকুরীতে তাঁহার বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি হইল, আর নিত্যানন্দবাবুর আনন্দের সীমা নাই। এইরূপ ভাবে যে কত লোককে ধরিয়া তিনি এম্ এ পাশ করাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন মেয়ে বি এ পাশ করিয়া ঘরে বসিয়া আছে, এখন পর্যন্ত বিবাহ হয় নাই, তাহাকে ধরিয়াও তিনি এম্ এ পাশ করাইয়া ছাড়িলেন, আবার কোন মেয়ের বি. এ পাশ করিবার পর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধরিয়াও তিনি ছাত্রী করিলেন এবং দেখা গেল তিনিও এম্ এতে বেশ ভাল ফলই করিলেন।

সেবার রাধাগোবিন্দবাবু আসিয়া নিত্যানন্দবাবুকে ধরিলেন, তাঁহার মেয়ে নীলিমাকে পড়াইবার জন্য। নীলিমা এবার ইতিহাসে এম্. এ দিবে, মাত্র কয়েক মাস বাকী আছে। নিত্যানন্দবাবুর নিকট পাঠ লইতে আসিত। তাহা বেশভূষার কোন আড়ম্বর নাই, অথচ যেন নিখুঁত। তাহার মিটোল লাবণ্যময় দেহে অতি সাধারণ বেশভূষাও অসাধারণ শোভার সৃষ্টি করে। তাহার নিঃসঙ্কোচ সরল বাক্যালাপ, তাহার অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহার জটিল বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা দেখিয়া নিত্যানন্দবাবু খুবই প্রীত হইলেন। সবদিক দিয়াই নীলিমাকে নিত্যানন্দবাবুর ভাল লাগিত। একদিন নীলিমা না আসিলে নিত্যানন্দবাবু বিচলিত হইয়া পড়িতেন। অন্য ছাত্রছাত্রীদের পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার প্রতীক্ষমান দৃষ্টি যেন কাহার অন্বেষণে বার বার বাহিরে চলিয়া যাইত। তাঁহার এই আকর্ষণের মধ্যে একটুও আবিলতা ছিল না। তিনি বার বার নিজের অন্তরের গভীরতম প্রদেশ শুদ্ধ শুদ্ধ করিয়া নিরখ পরখ করিয়াছেন, সেখানে এক বিন্দুও কালিমা নাই, কোন কপটতা নাই, একটি মেধাবী ছাত্রের বা ছাত্রীর শুভমুখ শিক্ষকের অকৃত্রিম স্নেহ ছাড়া এ আর কি হইতে পারে? এইভাবে সাবলীল গতিতে পঠন পাঠন চলিল এম্ এ পরীক্ষা পর্যন্ত। পরীক্ষার পরেও নীলিমা মাঝে মাঝে আসিত, পিতা, ভ্রাতা বা ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া। যেদিন নিত্যানন্দবাবু জানিতে পারিলেন যে, নীলিমা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সেদিন তাঁর আর আনন্দ ধরে না। খবরের কাগজখানি হাতে লইয়া তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন, রাস্তায় বন্ধুবান্ধব যাহাকেই পাইলেন তাহাকেই সাগ্রহে এই শুভ সংবাদটি জ্ঞাপন করিলেন, এমন কি বাড়ীর পুরাতন ঝি পাঁচুর মাও বাদ পড়িল না।

তারপর কয়েক মাস পরে নিত্যানন্দবাবু একদিন বাসায় ফিরিয়াই একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ চিঠি পাইলেন। আগামী বুধবারে নীলিমার বিবাহ। চিঠিখানা পড়িবামাত্র তিনি কেন যেন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন, সেদিন তাঁহার আর লেখাপড়ায় মন বসিল না। রাত্রে আহার করিতে বসিয়াও বিশেষ কিছু আহার করিতে পারিলেন না। সে রাত্রিতে ঘুমানোও হইল না, শুইয়া শুইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার মনের অবস্থা এমন হইল কেন? নীলিমার বিবাহ? তাহাতে তাঁহারতো আনন্দিত হইবারই কথা—কিন্তু এ কি? নীলিমা তাঁহার কে? সে পরের স্ত্রী হইতে চলিল বলিয়া তাঁহার মনে এত ব্যথা লাগিবে কেন? সমস্ত রাত্র ধরিয়া মনে তাঁহার এমনি দ্বন্দ্ব চলিল। তিনি যতই তাঁহার অন্তরকে বুঝিতে ছিলেন ততই তিনি শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার নিজেরই মধ্যে যেন একটা প্রবল বিক্ষোভ জাগিয়া উঠিতেছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নীলিমার চিন্তা তিনি আর করিবেন না, কিন্তু চিন্তা তাঁহাকে ছাড়ে কৈ? যতই তিনি ভুলিতে চান ততই যেন তিনি সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়েন।

কিছুদিন পরে দেখা গেল যে নিত্যানন্দবাবু থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখাটা বিশেষ পছন্দ করিতেন না, সেই নিত্যানন্দবাবুকে এখন প্রায়ই ছুটির দিনে থিয়েটার, বায়োস্কোপে দেখা যায়। কিছুদিনের মধ্যেই নিত্যানন্দবাবুর মনে হইল, তিনি তাঁহার মনকে বশে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন, এখন নীলিমাকে ভালবাসা দূরে থাক, তিনি তাহাকে অন্তর দিয়া ঘৃণা করেন। তাহার নামও তিনি আর শুনিতে পারেন না, এমন কি তিনি এখন মেয়েদিগকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক শিক্ষিত বন্ধুবান্ধবই মনে করিতে লাগিলেন যে, এইবার নিত্যানন্দের আধ্যাত্মিক জগতে দিব্য দৃষ্টি ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছে। নীলিমার চিন্তা যে তাহার নিজের মনে বাইয়া বাসা বাঁধিয়াছে, তাহা তিনি বা তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

সেই সদাপ্রফুল্ল নিত্যানন্দবাবুকে আজকাল প্রায়ই বিমর্ষ থাকিতে দেখা যাইত। কোন ধর্ম-বিষয়ক বা নীতিমূলক কোন কথা তাঁহার নিকট কেহ উত্থাপন করিলে, তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করিতেন। শুধু কোন বায়োস্কোপ বা থিয়েটারের কোন আর্টিষ্টদের নিয়া আলোচনা হইলে, তখন তাঁহাকে খুবই প্রফুল্ল দেখা যাইত।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহার মনের কোন স্থিরতা নাই। তিনি আজ স্থির করিলেন, কাল খুব ভোরে উঠিয়া, তাঁহার বাল্যবন্ধু দেবেশের বাড়ী যাইবেন, পরদিন ভোরে দেখা গেল, তিনি আটটা পর্যন্তই বিছানায় কাটাইয়া সাড়ে আটটার সময় রমীনের বাড়ী রওয়ানা হইয়াছেন। আবার হয়তো স্থির করিলেন, আজ বাসায় থাকিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া লেখাপড়া করিবেন, কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণ বাসায় কাটাইয়া দেবেশের বাড়ী রওয়ানা হইয়াছেন। এইভাবে দিনের পর দিন দেখা যাইতে লাগিল, তাঁহার মধ্যে যেন দুইটি বিপরীত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অহরহ বিবাদ চলিতেছে। তাঁহার চিন্তা ও কর্মের একটুও সামঞ্জস্য রহিল না। যেটা এতকাল ভাল বলিয়া মনে করিয়াছেন, আজ যেন তাহাকে মন্দ প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আবার অযৌক্তিক ও অশোভন ব্যাপারের মধ্যেও তিনি অভিনব যুক্তি দেখাইয়া সমর্থন করিতেন। তাঁহার প্রতিভা যেন ক্রমে মিভিয়া যাইতেছিল। তিনি ক্রমশ উদ্যমহীন ও নিরাশাবাদী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বেশভূষা, কথাবার্তা এবং চালচলন সবই যেন এলোমেলো, খাপছাড়া।

একদিন নিত্যানন্দবাবু শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পরম শ্রদ্ধেয় প্রফেসার ব্যোমকেশবাবু এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হইতে সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর পরে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। পরদিনই তিনি ব্যোমকেশবাবুর বাড়ীতে যাইয়া হাজির হইলেন। ব্যোমকেশবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে পাইয়া বড়ই প্রীত হইলেন। কিছুক্ষণ নিত্যানন্দবাবুর সহিত আলাপ আলোচনার পর ব্যোমকেশবাবু বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—এতদিনে নিত্যানন্দ নিশ্চয়ই ডক্টরেট লাভ করিয়া হোমরা চোমরা একটা কিছু হইয়াছেন—তিনি বিশ বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দের ভিতর যে প্রতিভা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যোমকেশ বাবু মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তিনি নিত্যানন্দকে খুবই স্নেহ করিতেন। এছাড়াও তিনি ভাবিলেন, এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এমন ফুল তাঁহার কখনও হইয়াছে বলিয়া তো বোধ হইতেছে না, তবে এই প্রতিভাবান যুবকটির সম্বন্ধে তাঁহার অনুমান এমন ভুল হইতে বসিয়াছে কেন? তিনি মনের কথা গোপন রাখিয়া নিত্যানন্দবাবুর সহিত আলাপ আলোচনায় মাতিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যোমকেশবাবু বুঝিতে পারিলেন, স্বভাবতই নিত্যানন্দের প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। অভাবের স্বভাবের ফল যখন মানুষকে চাপিয়া ধরে, তখন পদে পদে সে ব্যর্থ ও ব্যাহত হইতে থাকে। আর এই হৈরবৃত্তি হইতে আসে হীনমন্যতা, কাজেই নিত্যানন্দের এই হৈরভাবকে তাড়াইতে পারিলেই নিত্যানন্দ আবার প্রতিভাবান হইয়া উঠিবে। মানুষ যতই প্রতিভাবান হউক না কেন, যাহাকে একবার এই বৃত্তি পাইয়া বসিয়াছে, সে মানুষ ঘুণে ধরা কাঠখণ্ডের ন্যায় ক্রমেই ঝরিয়া পড়িবে, এ যেন জীবন-তরণীর ছিদ্র-স্বরূপ। ছিদ্রযুক্ত তরণী যতই বিরাট হউক না কেন, অচিরে তাহাকে নিমজ্জিত হইতেই হইবে। তাই ব্যোমকেশবাবু স্থির করিলেন, নিত্যানন্দকে রক্ষা করিতে হইবে।

মনোবিদ্‌দেবের সুনিপুণ শিক্ষাব্রতী তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নলব্ধ সমস্ত জ্ঞানশক্তির একটা পরীক্ষা এই নিত্যানন্দকে অবলম্বন করিয়াই চালাইবেন। তাই তিনি সস্নেহে অথচ সহানুভূতির সহিত তাঁহাকে বার বার তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন। দূরদেশ হইতে বৃদ্ধ বয়সে নূতন স্থানে আসিয়া আর তিনি নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করিতেছেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে একটু একটু সাহায্য করিতে নিত্যানন্দকে বলিলেন। নিত্যানন্দের চরিত্রের সেবাপরায়ণতা, শিক্ষকদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা তিনি জানিতেন।

ঐ সদ্‌গুণগুলি যদিও এখন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু একেবারে নিভিয়া যায় নাই। তিনি তাহাতেই তৈল সিঞ্চন করিবেন বলিয়া মন স্থির করিলেন। শ্রদ্ধা ও সেবাপরায়ণতা যেখানে আছে, সেখানে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। এই দুইটি মানবজীবনের সব কিছু সদ্‌গুণ, সব কিছু কৃতিত্বের মূল উপাদান। ব্যোমকেশ বাবু জানিতেন, এই শ্রদ্ধা ও সেবাপরায়ণতার অনুশীলনের অভাবে আজ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি বিকৃত ও বন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছে। ভালবাসার উর্বরা ভূমি যেখানে নাই, সেখানে পত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাই সমাজে আজ সুশিক্ষিত সুবাক্তিত অধঃপতিত লোকের সংখ্যা এত বেশী। নিত্যানন্দের অধঃপতন এখনও রোধ করা যায়, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষের মধ্যে যাবমান প্রবৃত্তিগুলি এক শ্রেয় পরমের শ্রদ্ধা ও সেবায় কেন্দ্রিত করিতে না পারিলে তাহার যত প্রতিভাই থাকুক না কেন তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় তাহার নির্বাণ অবশ্যম্ভাবী।

নিত্যানন্দবাবু ব্যোমকেশ বাবুর স্নেহ ভালবাসায়, আদর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি ব্যোমকেশ বাবুর বাসায় যাইতে লাগিলেন। একটু অবসর পাইলেই তিনি ছুটিয়া যান ব্যোমকেশবাবুর ওখানে। সপ্তাহে অন্তত একবার কি দুইবার ওখানে না যাইতে পারিলে নিত্যানন্দবাবু খুবই বিচলিত হইয়া পড়েন। কি যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেইখানে টানিয়া লইয়া যায়। কোনদিন ভোরে, কোন দিন বা বৈকালে, যেদিন যখন সুযোগ হয়, তিনি ছুটিয়া যান সেই প্রেমী পুরুষটির কাছে। এইভাবে অনেকদিন চলিয়া গেল। একদিন খুব ভোরে, একটি বিশেষ জরুরী কাজে নিত্যানন্দবাবু ব্যোমকেশ বাবুর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যোমকেশবাবু তখনও তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বাহির হন নাই। নিত্যানন্দ বাবু প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন—তাঁহার যে বিশেষ জরুরী কাজ, আর অপেক্ষা করাও চলে না। তিনি উঠিয়া শয়নকক্ষের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে গেলেন। নিত্যানন্দের মনে মনে এতক্ষণ নানা রকম বিরুদ্ধভাব জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, এত বেলা পর্যন্ত যিনি বিছানায় পড়িয়া ঘুমান তিনি কেমন করিয়া অপরকে ভোরে উঠিবার পরামর্শ

দেন ইত্যাদি নানারূপ কথা তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। কিন্তু জানালা দিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন, দেখিলেন ব্যোমকেশ বাবু ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল হইতে যেন একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই সৌম্যশান্ত নিশ্চল ধ্যানমগ্ন মূর্তির দিকে নিত্যানন্দ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। এ শোভা তিনি যেন জীবনে আর কখনও দেখেন নাই। চারিদিকে কোলাহল, কলহ, বিবাদ, নিষ্ঠুরতা, অবিশ্বাস প্রবঞ্চনার মাঝে, মানুষ কেমন করিয়া এইরূপ অচঞ্চল স্থির ধীর ভাবে আত্মস্থ হইতে পারে!

ব্যোমকেশ বাবুকে তিনি এতদিন স্নেহশীল পণ্ডিত বলিয়াই শুধু জানিতেন, তাঁহার ধৈর্যও অনুকরণীয়। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁহার সঙ্কল্পে অবিচলিত নিষ্ঠা ও শান্ত মধুর ব্যবহার নিত্যানন্দ খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার এই মহান চরিত্র-সম্পদ মানুষকে শ্রদ্ধায় অবনত করিত। নিত্যানন্দ আজ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সেই চরিত্রমাধুর্যের, তাঁহার দৃঢ়তার, মূল উৎস কোথায়? উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ এই সংসার সমুদ্রে ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া নিজের জীবনের তরিকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে পারিলে বোধ হয় ঐরূপ দ্বন্দ্ব-সংশয়-চঞ্চলতাহীন অবোধ জীবন-গতি আয়ত্ত করা যায়। কতক্ষণ নিত্যানন্দ সেই ধ্যান গম্ভীর শান্ত মূর্তির দিকে তাকাইয়া ছিলেন তা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। স্নিগ্ধ হাস্যে ব্যোমকেশ বাবু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যে নিত্যানন্দ, কখন এলে? তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দের চমক ভাঙিয়া গেল। নিত্যানন্দ কতকটা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল—এই তো খানিকক্ষণ হয়। নিত্যানন্দ তাহার জরুরী কাজের কথাটি আর বলিতেই পারিলেন না। ব্যোমকেশ বাবু নিত্যানন্দকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হাত মুখ ধুইতে চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দ আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পড়িলেন। আজ তাঁহার মনে যে কি একটা পরিবর্তন আসিয়াছে তাহা তিনি নিজে নিজেই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, কিছুদিন পূর্বেও তাঁহার মনে পরতে পরতে যে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, ব্যোমকেশ বাবুর স্নেহ, ভালবাসায় তাহা যেন ক্রমেই শান্ত হইয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পূর্বেও তিনি ব্যোমকেশ বাবুর সম্বন্ধে যাহা ভাবিতেছিলেন, তাহা মনে হওয়ায় লজ্জায় যেন তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় ব্যোমকেশ বাবু আসিয়া হাজির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর কি বিলাসী আসিয়া টেবিলের উপর দুইজনের জলখাবার রাখিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বাবু জলযোগ করিতে করিতেই বলিতে লাগিলেন, দেখ নিত্যানন্দ, মানুষ দিন রাত নিজের ঝামেলায় নিজে ব্যস্ত। তাহার অপরের দিকে তাকাইবার ফুরসুতই হইয়া উঠে না। আজ এই কলিকাতার অবস্থা দেখ। এক বাড়ীতে ৩৪টি পরিবার বাস করে। একজন অপরের খবর রাখে না। এটা কিন্তু আমাদের গ্রাম্য জীবনে ছিল না। গ্রামের একটি বৃদ্ধ শুধু তাঁহার গ্রামের নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামেরও অনেক কিছু খবরাখবর রাখিত, তাহারা পারিপার্শ্বিক নিয়া চলিতে জানিত। পারিপার্শ্বিকের সুখদুঃখের সহিত তাহারা জড়িত ছিল। পারিপার্শ্বিকের সুখে তাহারা সুখী হইত, আবার পারিপার্শ্বিকের দুঃখে তাহারা দুঃখ অনুভব করিত। শুধু দুঃখ করিয়াই নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিত না, সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ইহাই ছিল আমাদের গ্রাম্যজীবনের বৈশিষ্ট্য। আমরা যদি আবার মানুষ হইয়া দাঁড়াইতে চাই, তবে আমাদের এই সমস্ত কথা ভাবিয়া, লক্ষ্য স্থির করিয়া, আবার চলিতে আরম্ভ করিতে হইবে।

এর মূলে ছিল কি জান? এর মূলে ছিল

ভালবাসা। এই ভালবাসা যখন উৎসমুখী হয়, এই ভালবাসাই তখন সাধারণ মানুষকেও বিরাট মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, পারত এমন কাউকে ভালবাস যিনি শুধু তোমাকে, আমাকে ভালবাসিয়াই সুখী নন, তিনি ভালবাসেন বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে—শুধু মানুষকে নয়—প্রতিটি কীট-পতঙ্গকে পর্যন্ত।

নিত্যানন্দের এ সমস্ত কথা যে জানা ছিল না, তাহা নহে। তিনি এ সমস্ত কথা অনেক শুনিয়াছেন, এবং ইহা নিয়া অনেক ভাবিয়াছেন, কিন্তু মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ ব্যোমকেশ বাবুর মুখে শুনিবার ফলে, কথাগুলি তাঁহার যেমন মর্মস্পর্শ করিতেছিল, এমনটি আর কখনও হয় নাই। এতদিন পরে নিত্যানন্দ বাবু একটা পথের নিশানা স্থির করিতে পারিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই দেখা গেল, নিত্যানন্দ বাবুর হাবভাব চালচলন সবই যেন বদলাইয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ বাবুর নির্দেশ মত নিত্যানন্দ বাবু আজ ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। একজনের প্রতি ভালবাসার টানে আজ তাঁহার "লক্ষ্যহীন লক্ষ্যসন্ধান" একে কেন্দ্রিত হইয়া বিকশিত হইয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া তাঁহার জীবনকে সবল, সার্থক ও আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। সে আনন্দের দীপ্তি তাঁহার প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি কথায় বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৬২ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

কলিকাতায় ব্রেল লিপির মুদ্রাযন্ত্র

নিউ-ইয়র্কে অন্ধদের শিক্ষার জন্য এক ইনষ্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান আছে। ইহা হইতে কলিকাতা (বেহালা) অন্ধ বিদ্যালয়কে ব্রেল-লিপির এক মুদ্রাযন্ত্র দান করা হইয়াছে। বেহালার এই অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গীয় লালবিহারী সাহা মহাশয় অন্ধদের শিক্ষার গোড়া পত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ইংরাজি ১৮৯৭ সালে। পাঠক পাঠিকারা জানেন যে অন্ধ শিক্ষার্থীরা ব্রেল নামক লিপি ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা স্পর্শ করিয়া পড়িতে পারে। অন্ধদের পাঠ্য পুস্তকাদি এই লিপিতে রচিত হয়। এযাবৎকাল শিক্ষার্থীরা পঠিতব্য বিষয়ের প্রতিলিপি নিজেরাই করিয়া লইত, এখন হইতে তাহা আর করিতে হইবে না। মিউইয়র্ক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ রাজকুমারী অমৃত কৌরের অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায় এক হাজার বইও এখানকার পুস্তকাগারের জন্য দান করিয়াছেন। সম্প্রতি তেমন কোনও পুস্তকাগার নাই, সুতরাং এইবার অন্ধদের শিক্ষার ইতিহাসে নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহা উভয় দেশের সৌহার্দ্যের পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আমেরিকায় ভারতীয় শিক্ষার্থী

সম্প্রতি বারো জন ভারতীয় শিক্ষক শিক্ষার্থী আমেরিকা গমন করিয়াছেন; তাঁহারা ছয় মাস সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিবেন। কি করিয়া বিদ্যালয় আরম্ভ করিতে ও চালাইতে হয়, বৃত্তি শিক্ষা দিতে হয়, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখিয়া জ্ঞান অর্জন করিবেন। এই বারো জনের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী একজন—শ্রীবণী সেনগুপ্ত, বাণীপুর বুনিয়াদি শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। পুরুষ শিক্ষক সাত জনের মধ্যেও বাঙ্গালী একজন—ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীনৃত্যলাল বসাক। মোট বারো জনের মধ্যে কিন্তু চার জনই কলিকাতার।

ইহারা দেশে ফিরিয়া শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া দেশের হিত-সাধন করুন, প্রার্থনা করি।

সংস্কৃত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের শিক্ষালয়গুলিতে সংস্কৃত পাঠনার উপর যত জোর দেওয়া হইত, তাহা এখন শিথিল হইয়াছে এবং ইহাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্গত না করিয়া বৈকল্পিক করার কথাও হইয়াছে, ইহা সকলেই জানে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের গভর্নর এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল :

আমাদের শিক্ষাবিশারদের মনে একটা ভূত জুটিয়াছে—সংস্কৃত শিখিলেই বুঝি আধুনিক হওয়া যায় না, প্রতিক্রিয়াশীল হইতে হয়। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতই আমাদের পরস্পর সংযোগের সুবর্ণসূত্র হইয়া আসিতেছে। ইংরেজ শাসন আমাদের এক রকমের একতা আনিয়া দিয়াছিল, সামরিক শাসনের একতা এক রকমের সংকোচ-শাসনের একতা, কিন্তু মূল ঐক্যবোধ, যাহাতে সমস্ত দেশকে এক বলিয়া বোধ জন্মাইয়াছে, দেশের নদী ও তীর্থ আমাদের বলিয়া বুঝাইয়াছে, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত এক দেশ বলিয়া চিনাইয়াছে, সেই জ্ঞান ও ঐক্য বোধ আসিয়াছে সংস্কৃত ভাষা ও তাহার সঙ্গে যে সংস্কৃতি আছে তাহার মধ্য দিয়া। সংস্কৃত দ্বিতীয় ভাষা নয়, প্রাচীন ভাষা নয়, মৃত ভাষা নয়. যেমন অনেকে মনে করেন—ইহা সংস্কৃতির প্রাণবন্ত ভাষা, বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতের সমগ্র জীবন যে সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত, ইহা সেই ভাষা।

"There is a curious confusion in the mind of educationists that to learn or teach sanskrit is to become reactionary, not to be modern, not to be up-to-date." But they should not forget certain important things, apart from anything else, which made the study of Sanskit absolutely essential for an educated man. "Do not forget that if in this country, for the last 3,000 years, there has been any golden thread of unity, it has been supplied by Sanskrit. The British gave us the unity of military occupation, an administrative unity of a sort, but the fundamental unity of the country—that which makes the whole country one, which makes us look to all rivers and holy places as ours, the country from the Himalayas to Cape Comorin as one—this consciousness, this sense of unity arises from the fact that Sanskrit and the culture which it stands for, are deep down in our blood." Sanskrit was not merely a second language, not a classical language, not a dead language, as some people imagined. "It is the living language of culture, the golden thread which weaves the whole life of India together from the Vedic down to the present".

মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই উদ্দীপনায় মঠ হইতে পতঞ্জলির মহাভাষ্যের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

বিহারে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

বিহারে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চরমে উঠিয়াছিল। উপলক্ষ্য তুচ্ছ, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, কিন্তু ঘটনা ক্রমে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিল। জাতীয় পতাকার মর্যাদা ছাত্রদের কাছে থাকিল না। পণ্ডিত নেহরু এই আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। প্রাচীন বা নবীন, কোনও

সংস্কৃতিতেই অসংযমের স্থান নাই। অবিনয় শান্তি বা উন্নতির পথে লইয়া যায় না এই শোভনীয় অবস্থা যত শীঘ্র দূর হয় ততই হর্ষের পক্ষে মঙ্গল। পুলিস নোয়াখালিতে কেন ছাত্রদের গুলি ছুঁড়িল, এবিষয়ে অবশ্য তদন্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, বিহার পরিষদেও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু কেন এমন হয়? জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রশ্ন করিয়াছেন ছাত্রেরা কেন ধৈর্য হারাইয়া এরূপ সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করিল? যতদিন না এ বিষয়ে তদন্তের ফল জানা যায় ততদিন দোষের পরিমাণ কে স্থির করিবে? তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া বা অন্য কারণে, যে অবস্থাতেই হউক, জাতীয় পতাকার অবমাননা করা অত্যন্ত গর্হিত। কোনও মিছিলই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

আমাদের বাণীপুর

শ্রীগৌরীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

তীর্থ যাত্রীরা তীর্থ গ্রহণ করেন পুণ্যের আকাঙ্ক্ষায়, আমরা বাণীপুরে গিয়েছিলাম স্বাধীন ভারতের শিক্ষকের মহান্ দায়িত্ব বহন করবার আশায়। বাণীপুর তাই শিক্ষাব্রতীদের তীর্থক্ষেত্র—অগণিত শিশুর বুকে নূতন আশার আলোক জ্বালাবার প্রাণ-প্রদীপ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান এগিয়ে এল সিঙ্গাপুরে। বৃটিশ ভীত হয়ে উঠল। যুদ্ধ-ঘাঁটি নির্মিত হল ২৪ পরগনার বৈগাছিতে। অসংখ্য আমেরিকান ও বৃটিশ সৈন্যে ছেয়ে গেল বৈগাছির প্রান্তর। পিচ ঢালা রাস্তা তৈয়ারী হল, বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করে বড় বড় অট্টালিকা উঠল শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করতে। নিশীথ আঁধারের বুক চিরে সেদিন ভেসে আসত যুদ্ধোন্মাদ বিদেশী সিপাহীর সতর্ক পদবিক্ষেপ। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শোনা যেত সাইরেনের শব্দ—প্রকৃতির বুকখানা যেন সেই বিকট ধ্বনিতে বেদনার্ত হয়ে উঠত। সেদিন ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় বা বিদেশীদের এই রণপ্রস্তুতিতে অন্তরের হাসি হেসে মহাকালের প্রতীক্ষা করিতেন।

যুদ্ধের অগ্নি নির্বাপিত হল। ১৯৪৫ সালে বাংলার কৃখ্যাত লীগ সরকার বাংলাদেশে সার্জেন্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার সংগঠন করবার উদ্দেশ্যে কতক শিক্ষাকর্মীকে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে ও বিলাতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করেন। এবং ঐ সমস্ত শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

লীগ সরকার তাঁদের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার পূর্বেই ভারতের স্বাধীনতার সূর্য পূর্বাকাশে বিজয়ীর মত উদিত হল। বড় আশায় ও আনন্দে বৈগাছির মাটি যেন রোমাঞ্চিত হল। বন্দ জননীর পাঁজরগুলি বিচ্ছিন্ন করেও ১৫ই আগষ্ট আমাদের কাছে বেদনাময় আনন্দের বাণী বহন করে নিয়ে এল। তদানন্তীন মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করার ইচ্ছা ঘোষণা করেন ও উক্ত শিক্ষাকর্মীগণকে সেবাগ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষণ গ্রহণে প্রেরণ করেন।

শিক্ষণ-শেষে পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই

বৈগাছিকেই গড়ে তুললেন বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র রূপে। সেবাগ্রামের শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে স্বাধীন ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল মহাস্নানের চিন্তা নির্বাপিত করে। যেখানে একদিন মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার আদায় রাত্রির পর রাত্রি সজাগ দৃষ্টি মেলে সৈনিকরা অপেক্ষা করেছে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন শান্তির বাণী শোনাতে বাণী দেবী। যেখানে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ গ্রহণই ছিল রীতি সেখানে ভালবাসা প্রেম ও জ্ঞান হানই আদর্শ হয়ে উঠল। বৈগাছির নাম পরিবর্তন করে জন্ম নিল বাণীপুর। সেদিনের বৈগাছি পেয়েছিল রক্তস্নাত, ক্ষত বিক্ষত মনুষ্যত্বকে; বাণীপুর শান্তি ও প্রেমের আলপনা দেওয়া পথে তাঁর অভিষেক করল মঙ্গল ঘট হাতে নিয়ে।

অনেকের ধারণা বাণীপুরে একটি মাত্র বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে একটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহা বিদ্যালয়, দুইটি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (জনতা কলেজ)। তা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সাথে একটি করে শিশুদের জন্য পরীক্ষামূলক আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় (experimental school) আছে। বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় দুইটি ১নং ও ২নং বাণীপুর শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় বলে পরিচিত হয়। আমি ১নং শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম।

আমাদের জীবন ছিল কর্মময়। ভরতারা পশ্চিমাকাশে উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে আমাদের জাগরণের গান করত। ছাত্রছাত্রীদের প্রভাতী ও সান্ধ্য প্রার্থনায় সংস্কৃত সংগীতের ঝঙ্কার প্রকৃতির বুকে এক পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করত। অধ্যাপক, অধ্যাপিকারাও তাতে যোগ দিতেন ভক্তি অবনত চিত্তে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় গান্ধীজী স্বাবলম্বনের ভাবধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর শিক্ষাদর্শ বিশ্ববর্মী এবং শ্রমকে মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী। গান্ধীজীর মুখে শুনেছি 'সাফাইসে গুরু হোতি হ্যায় আউর সাফাই মেঁহি খতম হোতি হ্যায়।' মানবদরদী বাপুজীর ঐ সামান্য বাণী অমর করে রাখবে তাঁকে। এই বাণী জীবন থেকে ভিন্ন করে দেখা যায় না। যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাফাইএর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, সে সব চেয়ে বড় শিল্পী। বাহিরের সাফাই করতে করতে মনের সাফাই আসে। মন থেকে কালিমা মুছে যায়। মানুষ সরল এবং স্বাভাবিক হয়।

আমরা ব্যক্তিগত ও নিজের বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার করতাম। পায়খানা, নর্দমা, রাস্তা, বিদ্যালয়, মাঠ ও জঙ্গল সাফ্ করতাম আগ্রহভরে। জোর করে পায়খানা কিংবা নর্দমা সাফ্ করান হত না।

আদর্শ বিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী থেকে ঝরে পড়েছে কয়েক ফোঁটা অমৃত 'যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সংগে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক।—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। • • • • • • পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সংগে কেবল ভাবের সূত্রে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।'

আমরা ও বেতাম কৃষিকাজে। কোদাল, খুরপী, ঝুড়ি, দাঙল ও বালতি নিয়ে কল মূল, তরি-তরকারী উৎপাদন করতাম। বেড়া বাঁধতাম, গাছে জল দিতাম ও গাছের গোড়া খুঁড়তাম। প্রকৃতির বুকে এই সব কাজ করতে যে কী আনন্দ তা আয়েসপ্রিয়রা বুঝতে পারে না।

স্নানাহার, খেলাধুলো, ব্রতচারী শিক্ষা ও

গ্রন্থাগারের বই গ্রহণের সময় সুনির্দিষ্ট ছিল। তা ছাড়া মহাপুরুষদের জন্মতিথি স্মরণ, ঋতু উৎসব উদ্‌যাপন, বিচিত্রানুষ্ঠান ও অভিনয় করতাম।

ছাত্রাবাস এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব এবং স্বাধীনতা ছিল। আমরা এখানে সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে বাস করতাম। সমবায়ের নীতিতে সমস্ত সমস্যার মিমাংসা হত। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার শিক্ষার্থী এখানে প্রতি বৎসরই আসেন। আমরা যতদূর পারতাম সহজভাবে বেলাবেশা করতাম। এর ফলে ভাববিনিময় আদান প্রদানের সুযোগ আসত।

প্রতি মাসে আমাদের ভোট দ্বারা নির্বাচিত একটি মন্ত্রীসভার উপর বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাসের বিভিন্ন কাজ অর্পিত হত। মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনার ব্যবস্থা ছিল। মন্ত্রীদের তালিকাটি দেখলেই কাজগুলো কী তা বুঝতে পারা যাবে। যেমন, প্রধান মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী, সরবরাহ মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, ক্রীড়া মন্ত্রী, সাফাই মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, শ্রেণী মন্ত্রী, গৃহ মন্ত্রী, অতিথি মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও সময় রক্ষক মন্ত্রী।

শুধু তাই নয়, রান্নার জল তোলা, প্রার্থনা ও খাবারের আসন পাতা, রান্নার বাসন ধোওয়া, তরকারি কোটা, গৃহ পরিবেশন করা ও রান্নার ঘর খাওয়ার পরে ধুয়ে ফেলা ইত্যাদি কাজ এক একটি দলের উপর অর্পিত ছিল। প্রতি দলকে চক্রাকারে বিভিন্ন কাজ করতে হত। দলের নেতারাই কোন দলের কাজের জন্য দায়ী থাকতেন।

কবিগুরু সুচিন্তিতভাবে আদর্শ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলেছেন, 'এই বিদ্যালয়ের যেকি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সাধারণের বিরুদ্ধে খোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে।'

আমাদেরও বিদ্যালয়ে চেয়ার টেবিলের প্রয়োজন বোধ করিনি। ভূমিতলই আমাদের শিক্ষাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছে। আমরা শীতল পাটীর ছোট ছোট আসন পেতে বসতাম। অধ্যাপকরা কিছু উঁচুতে বসতেন চৌকির উপর বসে শিক্ষা দিতেন।

অস্পৃশ্যতাকে গান্ধীজী সমাজের সব চেয়ে বড় পাপ মনে করতেন। এই মানবদরদী মহাপুরুষ অস্পৃশ্যতাকে দূর করবার জন্য জাতিকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর মহামূল্য বাণী জাতি অবহেলা করেনি। তাই আমাদের বিদ্যালয়ে জাতিভেদকে আমরা ঘৃণা করি। আমরা মনে করি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান সকলেই এক ভারতমাতার সন্তান। এক পঙক্তিতে আহার এবং পবিত্রচিত্তে যে কোন জাতির স্বহস্তে পরিবেশন করা আহার্য বস্তু গ্রহণ করতাম। আহারের প্রথমেই আমাদের সংকল্প ছিল,

ওঁ সহনাববতু
সহনৌভুনক্তু
সহবীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনা বধীমস্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গ্রন্থের অধ্যাপক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী মহাশয় এর সুন্দর বঙ্গানুবাদ করে একদিন শুনিয়েছিলেন।

'একই সাথে রইব মোরা চলিব এক সাথে
একত্রেই হব বীর্যবান
তেজোদীপ্ত হই যেন গো তোমার আশীষ মাখে
বিদ্বেষহীন রই হে ভগবান।'

বাণীপুর আমাদের একটি সমাজ। এই সমাজকে ভালবাসি, এরই স্বপ্ন দেখি ভারতের বুকে।

আমার এই পঁচিশ বছর বয়সে শিক্ষা জীবনে অনেক শিক্ষক এবং অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু বাণীপুরে শিক্ষণ-জীবনে অধ্যাপক অধ্যাপিকার মধ্যে কেহ কেহ আমার হৃদয়ে এমনই ছাপ কেটেছেন যে, এমনটি আর কোথাও হয় নি। তাঁরা আমাদের থেকে দূরে ছিলেন না। স্নেহ মমতা দিয়ে আপনার ক'রে নেবার কৃতিত্বেই এঁরা আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবেন। তাই আমাদের সম্বোধন ছিল, 'দাদা' 'দিদি'। আমরা ছুলে যেতাম আমাদের গৃহকোণের দাদা, মা ও দিদির কথা। তাঁদেরই স্নেহ আমাদের এখানে ঘিরে থাকত সতর্ক দৃষ্টি মেলে। এঁদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে একদিন বসবার ইচ্ছা রইল।

সহ-শিক্ষা আমাদের দেশের কলেজগুলোতে আছে। কলেজের সহশিক্ষা ও আমাদের শিক্ষণ-জীবনের সহশিক্ষায় অনেক প্রভেদ আছে। প্রচলিত কলেজে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অবাধ মেলা মেশার বিরুদ্ধে যেন একটা পর্দা টানানো আছে কিন্তু এখানে তা নাই। আমাদের পরিবেশ ছিল মধুর। শোনা যায়, পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা নাকি সোনা হয়। এখানে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যায়। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ছাত্র-ছাত্রীর মনের পেছনে যে শক্তিটি কাজ করত তা হচ্ছে মানবতায় বিশ্বাস স্থাপন। এখানে মানুষের বুকের নিদ্রিত ভগবানকে জাগিয়ে তোলা হয় পরশ পাথরের স্পর্শে। শিক্ষণ কেন্দ্রে এই চিরন্তন সত্য কথাটি আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতাম। আমরা এক পথ-যাত্রী। আমাদের বুকে নূতন ভারত সৃষ্টির স্বপ্ন জাগে। সেই অনাগতকে জীবনকে আদর্শবাদী করে তুলতে চাইতাম।

বিভিন্ন শিল্পকাজ শিখবার আলাদা সময় নির্দ্ধারিত ছিল। কাজেই শিল্পের উপরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। এই জন্য প্রতিদিন এক ঘণ্টার উপর ব্যয় করার সুব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া চর্খা শিল্প, সাবান, কাগজ, পুতুল, ফুলদানি তৈরি, কাঠের কাজ, বেতের ও বাঁশের কাজ ইত্যাদি শেখান হ'ত একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে।

প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা করে পাঠদান চলত। এর মধ্যে শিশুমনস্তত্ত্ব, বিশেষ পদ্ধতি, শিক্ষানীতি, সমাজতত্ত্ব, সাধারণ পদ্ধতি, শিশুবিজ্ঞান, শিশু-সাহিত্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের এবং সুলেখকের সমাজমঙ্গলকর রচনাবলী পাঠ করতে হত। তা ছাড়া শিখতে হত শিশু সংগীত, ব্রতচারী, শিশুদের উপযোগী খেলা ও ছবি আঁকা।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, 'অসভ্যরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ মাথের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই—আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে।'

ভারতের প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত জন-সাধারণের অধিকাংশই অশিক্ষিত সাধারণ লোককে অবজ্ঞা করে চলেন। এমন কি কোন অফিসের বড় বাবু উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও একজন শিক্ষিত কর্মচারীর প্রতি কিরূপ উদ্ধত ব্যবহার করেন তার নজীর আমাকে নিশ্চয় দেখাতে হবে না। যাঁরা সেক্সপীয়রের নাটকাবলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, বাইরন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থকে মন্থন করে দেশের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হলেন, তাঁদের অধিকাংশের ব্যবহারই অশোভন। তাই রবীন্দ্র নাথের দৃষ্টি সেদিক থেকেও বাদ যায় নি।

এই তো দেখলেন প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটিগুলি। বাণীপুরের শিক্ষাব্রতীরা সাধারণ ভৃত্যদের উপর কিরূপ ব্যবহার করেন শুনুন। তারাও আমাদের এবং অধ্যাপকদের সাথে এক পঙক্তিতে ভোজন করত। বিদ্যালয়ের কোন কোন সভাতে

তারা গেলে আমাদের সাথে একাসনে বসত। শিক্ষাব্রতীরা তাদের ভাই বলে সম্বোধন করতে কুণ্ঠিত হতেন না। বাইরের লোকের বোঝা কঠিন হত যে অফিসের বেয়ারা, চাকর কে। এমন অমায়িক ব্যবহার অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এখানকার বাতাসে আছে শান্তির নিঃশ্বাস, আকাশে আছে সন্ন্যাসীর সাধনা, মাটিতে আছে প্রাণের সঞ্জীবতা। আমরা ভারতবাসী। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বের আদর্শ স্থানীয়। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও আমরা যে গৃহের পাশের চিরপরিচিত মানুষটিকে উপেক্ষা করে মনে মনে আনন্দ লাভ করি, সে দিনেরও আত্মবন্ধের উন্মাদনায় চেতিদ্ পাঁয় পরলোকগত আত্মাকে হারিয়ে দিতে লজ্জিত হই নি, তার মূলে রয়েছে বিদেশী শিক্ষা। এতদিন শক্তির মদে গর্বিত পাশ্চাত্য আমাদের নিয়ে এক নাটকীয় খেলা খেলেছে। তাদের স্বদেশীয় শিক্ষা আমাদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। বিদেশীর অনুকরণ আজও এক শ্রেণীর বুকের রক্ত গরম করে তোলে। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় সবই তাঁদের কাছে নিকৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমরা দৈবদুর্যোগে পতিত হইয়া উঠিয়াছি কিন্তু মনের মানুষটি মারা গেছে।'

বিজাতীয় শিক্ষায় এবং পোষাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে তৈয়ারি হওয়া যায় না তার প্রমাণ মাইকেল তাঁর জীবন দিয়ে জাতিকে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আসলে আমরা বিদেশীর শাসনে মাত্র একটি রাত্রি যে অতিক্রম করেছি তা বুঝি না। এ ভুল যে দিন ধরা পড়বে সেদিনই বাণীপুরের সাধনা সার্থক হবে। সেদিনই রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর লোকান্তরিত অমর আত্মা আমাদের আশীর্বাদ করবে।

বিদেশীর মোহ কাটিয়ে, ৪৭ এর হাতছানি আমাদের হৃদয়ে যেদিন স্পন্দন দিল, সেদিন আমাদের দেহ মনের দিকে তাকিয়ে, আমাদের চিরপরিচিত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শকে মনীষীরা আমাদের মনের সাথে যোগ করে দিতে চাইলেন। এতদিন 'আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত' হচ্ছিল। বাণীপুর আমাদের মনের শেকড় এই মাটিতেই প্রোথিত করল। ফলে ফুলে সুশোভিত একটি বিরাট মহীরুহ জাতিকে শীতলতা ও ছায়া দেবে এই আকাঙ্ক্ষায় একটি ছোট চারা লাগান হয়েছে। বাংলা দেশে বাণীপুর প্রথম এই গুরুদায়িত্ব নিয়ে দণ্ডায়।

শান্তিনিকেতন গেলে বাণীপুরের কথা মনে পড়ে। বাণীপুরের কোল জুড়ে শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক স্নেহ অনুভব করা যায়। বিশ্বভারতী কবিগুরুর স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, বাণীপুর ভারতের দুই মহর্ষি, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আশা আকাঙ্ক্ষায় নির্ভরস্থল। শান্তিনিকেতন আন্তর্জাতিকতায় মানবে বিশ্বাসী। বাণীপুর শুধু তাই নয়, নূতন মনের সমাজ গঠনার গুরুদায়িত্ব নিয়েছে। নবভারত রচিত হবে, এই পৃথিবীকে শান্তির মহান ব্রতে দীক্ষিত করবার সংকল্প গ্রহণ করে, এক আত্মনির্ভরশীল জাতি এগিয়ে চলবে গ্লানি ও বেদনা ভরা পৃথিবীর বুকের উপর, বাণীপুর এই আশায় সৃষ্টি হয়েছে।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিটি ব্যক্তি আপন শ্রম ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে স্বাধীন কর্তব্যশীল নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে শিক্ষা পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। তাঁরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় activity educationকে রূপ দিতে চেয়েছেন এবং প্রচলিত উচ্চ শিক্ষার সাথে সাময়িকভাবে এর সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই শিক্ষা দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী শারীরিক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। সমাজের নিকট থেকে সেবা নেবার পরিবর্তে

সমাজকে সেবা করতে অধিক আগ্রহশীল হবে এবং সমাজকে প্রগতিশীল রূপদানে নিযুক্ত থাকবে। এই শিক্ষার প্রসার দ্বারা সমগ্র রাজ্যে যে নাগরিক সৃষ্টি হবে তার আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সমষ্টি চেতনার উদ্বোধন হবে। শিক্ষাকে আচরণে পর্যবসিত করা হবে এবং সমাজ উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হবে।

তপোবনে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিরা প্রকৃতির কোলে দাঁড়িয়ে কোন এক সুদূর অতীতে সেই অধিভীষ পুরুষকে আহ্বান জানাতেন। তাঁদের মত আমাদেরও প্রার্থনা ছিল।

ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়
অসতো মা সদ্গময়

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর আমাদের আঁধার থেকে আলোকে, মিথ্যা থেকে সত্যের পথে চলার শক্তি দাও।

আজ আর তপোবনের প্রয়োজন নাই কিন্তু তার বাণী জাতির হৃদয়ান্তে নবজীবন দান করুক। আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে কোন 'দানবীর' ত্যাগের মহামন্ত্রে আসবেন? জাতির মনের গ্লানি কোন্ শিক্ষা বিচ্ছুরিত করে নূতন আলোকপাত করতে সক্ষম হবে? ভারত তার সত্যাগ্রহের পথে পৃথিবীকে পরিচালিত করবে নূতন শিক্ষার পথ ধরে। আমাদের জয়যাত্রা নূতন জাতি সৃষ্টি করবে পৃথিবীর বুকে—রবীন্দ্রনাথ মহাত্মাজীর অমর আত্মা শান্তি লাভ করবে সেই দিনে।

জীবনদর্শী কবিরা বলেছেন,

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

'জীবনের যা সত্য পথ, তা শাণিত ক্ষুরধারার মত দুর্গম। কিন্তু সেই দুর্গম পথই একমাত্র পথ।' আমাদের পথও দুর্গম। জীবনকে দেবতার চরিত্রে উন্নত না করলে গান্ধীজীর স্বপ্ন বিফল হবে। কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি?

বস্তুত বাণীপুরে যাঁরা গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার মাঝে আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। একে তো আমাদের অনেকেরই ভেতর উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা ছিল না। তদুপরি যুনিয়াদী শিক্ষাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করবার মত হৃদয়ের অভাব ছিল। কারণ যুনিয়াদী শিক্ষকের পথ বড় দুর্গম। এদিক দিয়ে আমাদের আত্মসমালোচক হওয়া উচিত। যাঁরা জাতির মসীলিপ্ত ললাটে জয়ের তিলক চিহ্নিত করতে যাবেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কি কোন মূল্য নেই? স্বভাবের যে কোমলতা, হৃদয়ের যে উচ্চ ভাব, মনের যে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী, সর্বোপরি ধৈর্যশক্তি ও দেহাত্মবোধ তাঁকে সত্যাগ্রহের শিক্ষক করে তৈরি করবে তা কি সকল ছাত্রের ছিল? তাই অধিকাংশই শিক্ষক তৈরি হচ্ছেন কিন্তু গুরু তৈরি হয়েছেন মুষ্টিমেয়। কবিগুরু তাই প্রাণের ব্যথা নিংড়ে বলেছেন, "আমাদের ছাত্রগণ যেন শুধুমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তিলাভ করে;—তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়, দ্বিধা বর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে দান করিতে পারে। তাহারা যেন অস্তিত্বের মধ্যে উপলব্ধি করে

'সর্বং পরবশং দুঃখং
সর্বমাত্মবশং সুখম্।

তাহাদের অন্তরে যেন মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে,

'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।'

যাহা ভূমা যাহা মহান্ তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।"

মানবত্রাণ ক্রন্দনরোলে যুগে যুগে মহামানব এসেছেন ধরার ধূলিতে, শ্রবণ করিয়েছেন অমৃতের বাণী; আমরা উপহাসে বিদ্রূপে ও তিক্ত ভাষায় অপমানিত করে তাঁদের ক্ষুণ্ণচিত্ত করেছি, ফাঁসি

নিয়েছি, গুলিবিদ্ধ করে রক্তাক্ত কলেবরখানা যমুনার জলে চিরবিলুপ্ত করেছি এবং নিষ্ঠুর পৈশাচিক হাসি হেসেছি। মহাকাল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখেছে সেই বিৎসৎ দৃশ্য। 'শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ হয়েছে, মানুষের অহমিকা বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র নিয়ে নগ্ননৃত্য করেছে ফলে ফুলে সুশোভিত ধরিত্রীর উপর।

কালের গতি রুদ্ধ হয় না, মানুষের শয়তানি দেখে সে স্তব্ধ হয়ে যায় নি—চলেছে সমান গতিতে আপন ছন্দে। কলাই মানুষ মহাশ্মশানের সূতিকাগৃহে নবজন্ম লাভ করেছে, নব চেতনা পেয়েছে; বুঝেছে মহামানবের অমর বাণীর মূল্য, মর্যাদা দিয়েছে তাদের জীবন আলেখ্যকে পূজার উপচার দিয়ে বহু যুগ পরে তারাই জানিয়েছে মনুষ্যের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, তাই মহাকালের বিচারে মহামানব অমর হয়ে রয়েছেন।

জগতের চিরন্তন রীতি এইরূপই হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় মোহগ্রস্ত মন আজ এই নূতন শিক্ষাকে যত অপকৃষ্টই মনে করুক একদিন সেই মোহ কাটবেই। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজীর দল এসে শিক্ষার বিপর্যয়ের কথা বলে নূতন শিক্ষার দ্বারা জাতিকে সুন্দরতর করে তুলতে চাইলেন, আমরা সেই শিক্ষাকে আজও উপহাস, বিদ্রূপ করে চলেছি। কিন্তু বিদেশীর এই চোখঝলসান রমকের আলোক সজ্জাগুলি দিবালোকে ম্লান হয়ে যাবে। রাত্রির যবনিকা ভেদ করে আলোর হাসি ফুটবে। বাণীপুরের স্বপ্ন সার্থক হবেই। একদিন এর রজত জয়ন্তী, স্বর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী হবে। বাণীপুর সেদিন জ্ঞানের দীপালী উৎসবে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ জানাবে। একদিন ভারত মহাসাগরের তীর ঘেঁষে যে মহাশঙ্খ ধ্বনিত হবে তার অমনাদে পৃথিবী এসে ভারতের সাথে বাণীবন্ধনে মিলিত হবে।

আজও আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলপনা সাজিয়ে ভারতবাসীকে নূতন শিক্ষার এক প্রাঙ্গনে আহ্বান জানাই। আমাদের জাতি শান্তির জাতি,—মৈত্রী ও প্রেমের জাতি। আমরা পৃথিবীর মানুষকে নিকট আত্মীয় মনে করি। আমরা এক মহামানবের বিশ্বরাজ্যের স্বপ্নের পূজারী। জাতিকে সেই ভাবেই আমরা গড়ে তুলতে চাই নূতন শিক্ষার দীপ জেলে। ভারতের বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রের মত বাংলা দেশেও বাণীপুরে সর্বপ্রথম সেই সাধনার বীজ রোপিত হয়েছে।

—০—

বিদ্যালয় পরিদর্শন

২

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত

শ্রেণী পরিদর্শনকালে আর একটা জিনিস আমার চোখে বড় বেশী লাগে সর্বদাই—সেটা হচ্ছে ছাত্রদের বসার ভঙ্গী। আমি লক্ষ্য করেছি ছাত্ররা পিঠের মেরুদণ্ড সোজা করে বসার কোনও চেষ্টাও যেন করে না। সোজা হয়ে বসা, সোজা হয়ে চলা ফেরা করার শিক্ষা দেওয়া যে কত বড় প্রয়োজন, এটা যে অ, আ, ক, খ, লেখানর চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় এ কথাটা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেন না। কেবল 'পরিক্রমা' নয়, বহু জায়গায়ই আমি এটা লক্ষ্য করে মনে কষ্ট পেয়েছি। আমাদের দেশের ছেলেরা যদি অন্যান্য স্বাধীন দেশের ছেলেদের মত পিঠ সোজা করে চলতে শেখে তা কত আনন্দের হবে। সহরের রাস্তায় এন. সি সির ছেলেদের মার্চ করে যেতে দেখে ভেবেছি—কবে এমন দিন আসবে যেদিন গ্রামে গ্রামে এ রক্ষীবাহিনী গড়ে উঠবে—ঘরে ঘরে ছেলেরা এমনি পিঠ সোজা করে চলবে। ভবিষ্যতের কল্পনায় আনন্দে, আশায় বুক ভরে উঠেছে।

থাক এসব কথা। বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ ভাব-বিলাস নয়। তার কাজ রূঢ় বাস্তবের সমালোচনা।

শ্রেণী পরিদর্শন কালে শ্রেণীতে বসেই যথাযথ মন্তব্য লিখছিলাম। সামান্য যেটুকু বাকি ছিল—স্কুলের অফিস ঘরে বসে সেটুকু শেষ করা গেল। অনেকের কাছে শুনেছি—পরিদর্শন মন্তব্য বিদ্যালয়ে বসেই লিখতে নেই, কেননা কাজ ফুরিয়ে গেলে—কাজীকে আর কেউ সন্ধান দেখায় না। আমি কিন্তু পরিদর্শন বই সঙ্গে করে বাড়িতে আনার কোনও সার্থকতাই দেখিনা। সঙ্গে রাখার একমাত্র কারণ হতে পারে সময় সংক্ষেপ হলে। কিন্তু পরিদর্শন মন্তব্য অকুস্থলে বসে যে রকম লেখা যায়—আরও পাঁচটা বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর কি তা তেমন স্পষ্ট ভাবে মনে থাকে? তাছাড়া বইখানা হারিয়ে যাওয়ারও ভয় থাকে এবং হারান প্রাপ্তির ঘটনাও দুর্লভ নয়।

বিদ্যালয়ের অফিস গৃহে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার হচ্ছে—ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত সিগারেট, বিড়ির টুকরা। ছাত্রদের সর্বপ্রধান আদর্শ শিক্ষক। তারা যদি দেখে যে তাদের ভক্তিভাজন শিক্ষক মহাশয় কেমন মনের আনন্দে বিড়িতে টান দিচ্ছেন—তাদেরও মনে এই টানার আনন্দানুভূতিটা জাগাই তো স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বাবা, মা অভিভাবক যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত নন, সর্বত্যাগী শিক্ষককেই তো এ বিষয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখেছি যে শিক্ষক টেবিলের উপরই দিয়াশলাই, বিড়ির প্যাকেট রেখে ছাত্র পড়াচ্ছেন। অনেক সময় সংবাদ না দিয়েও তো বিদ্যালয় পরিদর্শন করি। একজন শিক্ষককে দেখেছিলাম মনের আনন্দে বিড়ি ধরিয়ে আমাকে চিনতে না পেরে (আমি তখন সবাগত) আমাকেও একটা বিড়ি অনুগ্রহ পূর্বক "অফার" করেছিলেন। অন্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে এতটা দেখিনি, তবে দিয়াশলাই ও সিগারেট বিড়ির অজস্র টুকরো দেখেছি। রাষ্ট্র থেকে যেমন বাসে, ট্রামে, ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছে তেমনি শিক্ষা বিভাগ থেকে কি এরকম একটা কঠোর নির্দেশ দিতে পারেন না? আমি জানি

পাঠকদের মধ্যে মুন্সেবীগণ এটাকে উদ্ভট কল্পনা বলবেন। কিন্তু জাতীয় আদর্শের জন্য এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের ভিতর দিয়েই জাতি গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত সুখটাই বড় কথা নয়।

গ্রামের কয়েকজন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় লোক কুল ঘরে এসেছিলেন। বাইরে এসে এবার তাদের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা দেখালেন বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের জন্য অনতিদূরে একটি বড় পুকুরসহ একটি ভূমিখণ্ড ক্রয় করা হয়েছে কিন্তু বন্যাপ্লাবিত স্থান, অর্থাভাব তো আছেই। তার উপর অজন্মা। আমার কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁরা রাষ্ট্র থেকে গৃহনির্মাণের জন্য সাহায্য পেতে পারেন কি না।

পথে চলেছি।

একটি স্বাস্থ্যবান যুবক এসে সামনে দাঁড়াল। স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্মী।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "দামোদরের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল। এ স্থানে পৃথক ভাবে পাড়া গাঁয়ে বালিকা বিদ্যালয় চলবে কি?"

যুবকটি বলেছিল, "কি করব বলুন। মেয়েগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বেরিয়ে আসার পর ঘরেই আবদ্ধ থাকতে হয়। মেয়ে শিক্ষয়িত্রী না হলে—মধ্য ইংরাজি বা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পড়ান যায় না। অথচ আমাদের এ গাঁয়ের মত অন্য পাড়াগাঁয়ে শিক্ষয়িত্রী তো দূরের কথা একটি মেয়ে বা বধূও নেই যে ম্যাট্রিক পাশ। তাই আমরা চেষ্টা করছি—যেটুকু পারি ওদের মা রয় প্রাইমেটভাবে সপ্তম অষ্টম মান পর্যন্ত পড়িয়ে দেব।"

ওদের অনুরোধে বালিকা বিদ্যালয় গৃহে যেতে হল। ছাত্রীরা পূর্বেই বাড়ী চলে গিয়েছিল। সম্পাদক চণ্ডীবাবু তাড়া দিলেন—"সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—আকাশে ঘন মেঘ—এবার চলুন।"

চণ্ডীবাবুর বাড়ী অর্থাৎ কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

গিয়ে দেখি আমার জন্য যে বাইরের ঘরটা ঠিক করা আছে তার বারান্দায় ২০।২৫ জন লোক জড়ো হয়েছেন। মনে মনে বললাম, "হা অদৃষ্ট। এখনও বিশ্রাম করা যাবে না। এদের সঙ্গে বাগ্-বিতণ্ডা চালাতে হবে।"

প্যান্ট ছেড়ে, কাপড় পরে, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে অনেকটা যেন আনন্দ পেলাম। এইতো জীবন!—এবার আমি আবার কাজে বসতে পারব।

বাইরে বসামাত্রই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা বললেন, "বেশ হয়েছে, এবার ভাল জল হয় যি, আজকের জলটা বেশ কাজে লাগবে। আপনিই তাহলে আমাদের জন্য জল সঙ্গে করে এনেছেন।" কথাটা একেবারেই মিথ্যা তবু ওরা আমাকে ওদের আপন জন মনে করেছেন বলেই তো একথা বলেছেন, এটুকু ভেবে আনন্দ অনুভব করলাম।

গ্রামে একটি গ্রন্থাগারও রয়েছে।

গ্রন্থাগারের পরিচালক মহাশয় এগিয়ে এলেন তাঁর খাতাপত্র নিয়ে। তাঁর পরিদর্শন বইয়ে কিছু লিখে দিতে হবে। আমি তাঁকে একথা বলে নিরস্ত করলাম যে পরদিন যাওয়ার সময় লিখে যাওয়া যাবে।

নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় এলেন। সঙ্গে তার ছাত্রও কয়েকটি। মজুরের ছেলে মনে হল। খাতাপত্র দেখালেন। ছেলেদের একটা চেষ্টা রয়েছে মনে হল।

টোলের পণ্ডিত মহাশয় এলেন অনুরোধ নিয়ে। প্রত্যাবর্তন পথে তাঁর টোলেও একবার শুভ পদার্পণ করে যেতে হবে।

ক্লান্ত হয়ে পড়ছি—ক্রমশঃ। ঘুমও যেন আসছে। তবুও এঁরা যখন বলছেন, "দেখুন,

আমাদের দাদোদরের এ দিকে কেউ বড় আসতে চায় না। এলে আমাদের এত ভাল লাগে। আজকের রাত্রি আমাদের বড় আনন্দের।"—তখন নিজেরই লজ্জা হয়। অন্তরের পুলকের বাণী যেন তুমি—"ঘুমিওনা, ওঠ,—এদের অবস্থা দেখে তোমার আরাম উপভোগের চেষ্টা করতে লজ্জা করে না?

আন্তরিকতা যখন মন হয়ে এসেছে বুঝতে পারা গেল, তখন প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের গাঁয়ে দলাদলি নেই? একজন বল্লেন, নেই আবার! আমাদের গাঁওলো সব ওই করেই তো নষ্ট হয়ে গেল। তবে একটা ভাল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, ঘুঘুরেরা মামলা মকদ্দমা আজো পছন্দ করেন না। তাঁরা বলেন গাঁয়ের স্কুল, টোল, নৈশ বিদ্যালয়, সেবা সমিতির মধ্যে আবার দলাদলি কি? সুতরাং জাতির নবপ্রভাতের অরুণিমা দেখা দিয়েছে।

এবার আহার্য প্রস্তুত।

রাত্রিও প্রায় এগারোটা।

পরদিন প্রভাতে যখন ফিরে আসি তখন চণ্ডীবাবুর মা বাড়ীর ভিতর থেকে সেই একটি ছেলেকে দিয়ে জানতে চাইলেন, আবার কবে তাঁদের বাড়ী আসব।

এই বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রসঙ্গ এবারকার মত এখানেই শেষ।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমাকে আট মাস পরে পুনরায় দাদোদরের কাছাকাছি যেতে হয়েছিল। সেবার সাহিত্যিকরা বলবেন—"কিছে অনধিকার চর্চা আবি আমাদপুর থানার একটি গ্রামে রাত্রি যাপন!"

কাটিয়ে শেষরাত্রের দিকে "বাইক" করে রওয়ানা হই।

তখন দাদোদরের বুকে কেবল বালুকাস্তূপ। দুবার দাদোদর অতিক্রম করে—আমরা সকাল আটটার মধ্যেই "দামিন্তা" পৌঁছি। তখন প্রাতঃকালে বিদ্যালয়ের অধিবেশন হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রধান কারণ হচ্ছে বাইসিকেলের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা। পরিদর্শকের পক্ষে "বাইক" চড়তে জানা একটা আবশ্যকীয় সর্ত হওয়া প্রয়োজন। এতে গাঁয়ের লোকদের অনেক হয়রাণি ও অর্থদণ্ড হতে রক্ষা করা যায়। বহু পরিদর্শক, বিভিন্ন বিভাগে, এখনও গো-যান (বা মহিষযান) ছাড়া যাতায়াত করতে চান না। এদের আগমন সময়সাপেক্ষ, অর্থ সাপেক্ষ, প্রত্যাবর্তনও তাই। পায়ে হেঁটে গেলে গোযানের অধিক সময় লাগে—কিন্তু গতর থাকেনা—বেআব্রুও বিগড়ে যেতে পারে। তাতে পরিদর্শনের মন্তব্যের উপরও প্রভাব পড়তে পারে।

দামিন্তা বৃত্তান্ত শেষ!

জীবনের একটি উজ্জ্বল পাতা। দেখেছিলাম কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের বাস্তুভিটা, তাঁর বিগ্রহ। শুনেছিলাম তাঁর বংশধর চণ্ডীবাবুর কাছে কবিকঙ্কনের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী।

ইতিহাসের লোক আমি সাহিত্যের ফুলে ফলে পুনরায় দাদোদরের প্রবেশের বৃথা চেষ্টা করবনা। তবে আজো স্বপ্নে দাদোদরের বুকে ফিরে যেতে হয়েছিল। সেবার সাহিত্যিকরা বলবেন—"কিছে অনধিকার চর্চা আবি আমাদপুর থানার একটি গ্রামে রাত্রি যাপন!"

আমার শিক্ষক

২

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

বহুদিন পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, অধ্যাপক ব্যানার্জি অবসর গ্রহণ করিয়া দার্জিলিঙে নিজবাটী প্রস্তুত করাইয়া বাস করিতেছেন। দীর্ঘ দিন পরে প্রবাস হইতে ছুটিতে দেশে ফিরিয়া খবর পাইলাম, তিনি সম্প্রতি আমারই বাড়ীর কাছে এক প্রসিদ্ধ মিশনারী কলেজের অধ্যক্ষরূপে কার্ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য বেতন লন না। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। আমাদের দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। চিনিতে পারিতেছেন কিনা প্রশ্ন করাতে বলিলেন, তুমি কি মনে কর, আমি এতই বুড়ো হয়ে গেছি? আর তোমাদের কি ভুলতে পারি? সেদিন সময়াভাবে আর বিশেষ কথা হইল না। আর একদিন যাইব কথা দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আবার যখন দেখা করিতে গেলাম, অধ্যাপক মহাশয়ের সে কি আনন্দ! সপুত্র গিয়াছিলাম, পুত্রকে দেখিয়া সহর্ষে আশীর্বাদ জানাইলেন, আমাদের দুই জনকে বসাইয়া সে কত গল্প! কাজ কর্ম পড়িয়া রহিল, কাইসে হাত দিয়া সরাইয়া দিলেন,—কোথা দিয়া ঘণ্টা কাটিয়া গেল আমরা টেরও পাইলাম না। খালি বলেন, তোমাদের দেখলেও যে কত আনন্দ হয় তা হলে বোঝাতে পারবনা। আক্ষেপ করিলেন, তোমাদের পড়িয়েছি, এখনও পড়াচ্ছি,—তোমাদের সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক ছিল তবে ভাখো, তার তুলনায় এখনকার ছেলেদের সঙ্গে কি রকম সম্বন্ধ তা তুমি আন্দাজও করতে পারবেনা। বলিয়া একটি ঘটনার কথা বলিলেন,—এরকম ভাষা তোমরা তোমাদের শিক্ষক মহাশয়দের সম্বন্ধে কখনও প্রয়োগ করেছ আমি তো ভাবতেই পারিনা।—পারতে কি তোমরা? শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, বলিলাম,—ও রকম ব্যবহার করার ধৃষ্টতা আমাদের যুগে আমরা কল্পনাই করিতে পারিতাম না। তিনি বলিলেন, আর এরা অবলীলাক্রমে করে,—এটা যে গর্হিত তা ভাবতেই পারে না। যুগের ধর্ম এত পাল্টেছে আজকাল।—বিদায়ের সময় হইয়া আসিল। অধ্যাপক মহাশয় আর ছাড়িতেই চান না। শেষে তাঁহার দার্জিলিঙস্থিত ভবনে এক সপ্তাহ দিন কাটাইয়া আসিব প্রতিশ্রুতি দিয়া উঠিতে পারিলাম।

ব্যানার্জি সাহেব কলিকাতার প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী খ্রীষ্টান পরিবারের লোক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবিখ্যাত শল্যচিকিৎসক,—লোকে তাঁহাকে ধন্বন্তরি বলিয়া জানে। জ্ঞানে গুণে তাঁহাদের সব কয়টি ভ্রাতা ভগিনীই দেশের সুসন্তান। তিনি নিজেও কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন এবং আমাদের প্রধানতঃ গদ্য সাহিত্য ও বাইবেল পড়াইতেন। তাঁহার অধ্যাপনা অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। এক একটি পংক্তি পড়াইতে তিনি তাহার কত কি ব্যাখ্যা, টীকা টিপ্পনী করিতেন,—শুধু আলোচ্য বিষয় নহে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তিনি আমাদের লইয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। বাইবেল কেবল

মাত্র ধর্মগ্রন্থ নহে, উহা সাহিত্যও, তাঁহার পড়াইবার গুণে আমরা বুঝিতে পারি এবং বাইবেলের উপর আমাদের অনুরাগ জন্মে। সে অনুরাগ আজও যায় নাই, বাইবেল আজও পড়িতে ভাল লাগে ও পড়িয়া আনন্দ এবং শিক্ষা হইই পাই।

অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় আমার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে। আমার ইংরাজীতে অনার্স ছিল ও তাঁহার অধীনে tutorial class করিতে হইত। তিনি অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং আশা করিতেন যে তাঁহার ছাত্রেরাও সেই রকম হইবে। তাই সত্যকার কোন কারণ না থাকিলে তাঁহার ক্লাশে ফাঁকি দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল, কাজ কর্ম ঠিকঠাক করিতে হইত। আমি পড়াশুনায় উঁচু দরের কেন, সাধারণ গোছের ভালও কোন দিনই ছিলাম না তিনি তাহা জানিতেন, সুতরাং আমার নিকটও তিনি নিশ্চয়ই হাতী ঘোড়া কিছু প্রত্যাশা করিতেন না, আমি নিয়মিত ভাবে তাঁহার দেওয়া কাজ করিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছি ও তিনি যে সংশোধনগুলি করিয়া দিতেছেন তাহা লক্ষ্য করিতেছি, ইহা দেখিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। এই টিউটোরিয়াল ক্লাসেই তাঁহার নৈকট্য বেশী করিয়া অনুভব করি এবং সেই হইতে যে স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি, এবার কলিকাতায় গিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম, তিরিশ বৎসরের কাছাকাছি হইতে চলিল, সেই স্নেহ আজিও অম্লান হয় নাই।

যাঁহারা অধ্যাপক ম্যানার্সির সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণ শুচিতাবোধ। সৌম্যকান্তি এই লোকটির বেশ শুচি, ভাষা শুচি, আচরণ শুচি, অন্তর শুচি। শুচিতার এক শুভ্র আচরণ বর্মের মতন তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, —অপর যে কেহ তাঁহার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণের জন্যও আসিয়াছে সেও যেন তাঁহার পুণ্য প্রভাবে পার্থিব নীচতা হইতে অন্ততঃ সেই সময়টুকুর জন্য উর্ধ্বে উঠিয়াছে। তাঁহাকে কোন দিন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখি নাই, কণ্ঠস্বর সাধারণ উচ্চ গ্রামে তুলিতেও শুনি নাই। অথচ শুধু আমরা কেন, তাঁহার সহকর্মীরাও পর্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিতেন এমনই ছিল তাঁহার চরিত্রবল। অপরের মন বা বাক্যের অশুচিতা দেখিলে তিনি নীরবে সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছেন, কোনও রূপ প্রতিবাদ জানাইয়া নিজেকে খর্ব করেন নাই।

এই শুচিবোধের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে তাঁহার বলিষ্ঠ নীতিবোধ,—যাহা জীবনের অপূর্ণতাকে স্বীকার করিয়া লয় এবং তাহাকে বর্জন না করিয়া পূর্ণ করিতে সাহায্য করে। তাঁহার নীতিবোধ বলে দুর্নীতিকে ঘৃণা করিতে কিন্তু তাই বলিয়া যাহার নৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় নাই, তাহাকে দূর দূর করিয়া সরাইতে না, তাহাকে সাহায্য করে যাহার নৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে, যেন সে মনের সব আবিলতা ধুইয়া নির্মল জীবন যাপন করিতে পারে। তাই তাঁহাকে দেখিয়াছি দুর্নীতিকে পরিহার করিতে, কিন্তু যে উঠিবার জন্য তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছে তাহাকে নীরবে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতে। নীতিবোধ প্রখর বলিয়া কিন্তু তাঁহার কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি দেখি নাই। সংযতবাক্ এই মানুষটির আকাশের মতন উদার এবং সমুদ্রের মত গভীর হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামির স্থান কোন দিনই ছিল না বা নাই।

আমাদের পাড়ায় বাড়ী বলিয়া আমার শুধু অনেকে ইঁহাদের পরিবারকে জানিতেন। তাঁহাদের নিকট ইঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা শুনিয়াছি। যতদিন ইঁহাদের মাতা বর্তমান ছিলেন, সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ইঁহারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন।

অধ্যাপক এইচ্, কে, ব্যানার্জির মাতৃভক্তি আমাদের কাছে আদর্শস্বরূপ ছিল।

অকৃতদার এই অধ্যাপক নিজের সমস্ত সত্তা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ছাত্রদের হিতসাধনেই সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি তিনি এত স্নেহশীল যে তাহাদের জন্য তাঁহার গৃহ সর্বদাই অবারিতদ্বার। যখনই প্রয়োজন তাঁহার নিকট গিয়াছি, উপদেশ চাহিলেই পাইয়াছি এবং তদনুযায়ী কাজ করিয়া সাফল্যও অর্জন করিয়াছি। দেখিয়াছি, আমাদের কোন কোন সতীর্থ বি, এ পরীক্ষার পর যখন উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যায়, তিনি এখানে তাহাদের যাওয়ার ও সেখানে তাহাদের থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য কত লেখালেখি করিয়াছেন, কত উপদেশ দিয়াছেন ও তাহাদের সংবাদ পাইবার জন্য কত আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিয়াছেন। কিছুদিন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের Bursar ছিলেন, শুনিয়াছি, বহু ছাত্রের বহু অসুবিধা ও সমস্যা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া সেগুলির সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও শুনি, তিনি ছাত্রদের প্রতি তেমনই স্নেহ ও সংবেদনশীল। জ্ঞানার্জনে অধ্যাপক ব্যানার্জির অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি এখনও পড়াশুনা করেন। ইংরেজী সাহিত্যের সবকটি দিকই তাঁহার নখদর্পণে, আর সে কি গভীর জ্ঞান! আমাদের ছেলেবেলায় আমরা ভাবিতাম, মানুষ এত শিখিতে পারে কি করিয়া! আমাদের কত সৌভাগ্য যে আমরা এমনই এক অধ্যাপকের কাছে পড়িতে পারিয়াছি।

———

আজকের দিনে শিক্ষা ক্ষেত্রে কুটীর শিল্পের স্থান

শ্রীশ্যামাপদ বসু

বর্তমান যুগে যে ভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রসার আগাইয়া চলিতেছে, তাহাতে ইহা বহুলোকের দৈনন্দিন সমাজতন্ত্রী ক্রিয়াকে রুদ্ধ করিয়া মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তিকে ধনশালী ও শোষণশীল করিতে সহায়তা করিতেছে। ফলে অত্যধিক লোককে অলসপরায়ণ বানাইতে বাধ্য করিতেছে। এর মানে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমষ্টির বিকাশের পথকে প্রতিহত করিতেছে—এমন যে যন্ত্রশিল্প, মহাত্মাজীর মতে ঐ শিল্পের সমূলে উচ্ছেদ করা একান্ত প্রয়োজন। যে যন্ত্রশিল্প কোন ব্যক্তিবিশেষ সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে এবং মনুষ্যজীবনের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সমাজের আর্থিক-সামাজিক, সর্ব-বিষয়ের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে—এমন যে যন্ত্র বা কুটীর শিল্প বাপুজীর মতে তার ক্রমোন্নতি অত্যাবশ্যক। এইজন্য তিনি চরখাকে যন্ত্রবিশেষ বলিয়া যান্ত্রিক শিল্পের একটি অঙ্গ বলিয়াছেন। বর্তমান কালে যে ভাবে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হইয়াছে এবং এখনও যে ভাবে ক্রমোন্নতি হইতেছে ইহাতে যে বহুলোকে কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। বৃহৎ বৃহৎ আধুনিক যন্ত্রের দ্বারা যে মাত্র কয়েকজন লোকে ধনশালী হইতেছে ইহা বুঝিতে হইলে, প্রমাণ স্বরূপ পৃথিবীর বড় বড় দেশের কথা পর্যালোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

যন্ত্রশিল্পের দ্বারা উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে হইতেছে এটা ঠিক। কিন্তু অত্যধিক উৎপাদনের ফলে যে, আহারে আহারে করিয়া অপর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী নদী ও সাগরগর্ভে কেবল স্বার্থের খাতিরে নিমজ্জিত হইতেছে তাহাও ঠিক। মুষ্টিমেয় অল্প কয়েক লোকের নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের হেতু যন্ত্রশিল্পের দ্বারা মানুষকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে এবং বিজ্ঞানজগত আজ এমন পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে, যার ফলে হিংসার হোমানল-শিখা ব্যাপকভাবে প্রজ্বলিত হইতে দেখা যাইতেছে। তাই বলিয়া বিজ্ঞান জগতে শুধু উপকারের পরিবর্তে অপকার করিতেছে তাহাও ঠিক নহে,—বিজ্ঞান তার একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা মনুষ্য-সমাজকে বহু উর্ধ্বে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু কয়েকটি জিনিষের দ্বারা মানুষকে পূর্বের অপেক্ষা আরও নীচাবস্থায় লইয়া যাইতেছে, কারণ বিজ্ঞান যদি তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য ধীরস্থির ভাবে কাজ করিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহা আজ অবনতির কারণ দাঁড়াইত না। বিজ্ঞান আজ এমন আদর্শে পরিচালিত হইতেছে যে, সে মানুষের উন্নতির পথ না তাকিয়া ধ্বংসের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। এর জন্য দায়ী বিজ্ঞান নয়—যাঁরা বিজ্ঞান গবেষণায় রত রহিয়াছেন তাঁহারাই। এরই জন্য বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব লোপ পাইতেছে বলিলে ভুল হইবে না।

যান্ত্রিকশিল্পের এই করালমূর্তি দেখিয়া গান্ধীজী কুটীর শিল্পকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মাঝে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন এবং চরখাকে শ্রেষ্ঠাসনে বসাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন "চরখাই এদেশীয় সূর্য"। অর্থাৎ আকাশের সূর্যের ন্যায় কুটীর শিল্পে চরখাও একটী সূর্য। যেমন সূর্যের আলোতে দুনিয়ার অন্ধকার ও কালিমা ঘুচিয়া যায় সেই রকম আমরা যদি চরখাকে বা কুটীর

শিল্পকে শ্রেষ্ঠাসনে বসাইয়া নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য করিয়া যাই তাহা হইলে দেশের যত কিছু অশান্তি এবং মানুষের মনের যত কালিমা সব ঘুচিয়া যাইবে। এবং প্রত্যেকটি মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা বিকশিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হইয়া উঠিবে, প্রত্যেকের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব বিষয়ে উন্নতিলাভ সম্ভব হইবে। ইহার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের পায়ের পরে দাঁড়াইয়া আদর্শ নাগরিক হইতে পারিবে। সমাজের প্রত্যেক নাগরিক সরল ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করিতে সক্ষম হইবে।

বর্তমান যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই কুটীর শিল্পের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং যন্ত্রশিল্পের যে হীনত্ব তাহাও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাইত আমাদের জাতির অনেক বাপুজী শিক্ষার মধ্যে কুটীর শিল্পকে উচ্চস্থানে রাখিয়াছেন। আজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষারূপে বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্থান দিয়াছেন তার কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যদি জীবনের বুনিয়াদ বা ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিতে না পারিলাম তাহা হইলে জীবনই ব্যর্থ। কোন ঘরের দেয়ালের ভিত্তিই যদি মজবুত না হইল তবে সে যেমন অল্প দিনেই মাটির সাথে মাটি হইয়া যায়, অনর্থক মেহনত শুধু পণ্ড হইয়া যায়; তেমনি করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। প্রথম হইতে যদি আমরা কুটীর শিল্পকে আমাদের শিক্ষার মধ্যে স্থান দিই—তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবন সুফল হইবে নিশ্চিত। আজ আমরা দেখিতে পাই যেখানে বুনিয়াদী শিক্ষা চলিতেছে, তা সরকারী বা বেসরকারী যেখ সেখানেই এই শিল্পকে স্থান দিয়াছে। কোথাও যদি এর বিপরীত হয় তাহা হইলে কত বড় মারাত্মক অন্যায় হয় বুদ্ধিমান লোক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

এখনও যদি কাহারও ধারণা থাকে যে, কুটীর শিল্পকে শিক্ষার স্থান দিলে আমাদের আক্ষরিক জ্ঞানের পথ বাধাপ্রাপ্ত হইবে, তাহা হইলে বলিব দেশ বিদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে এখনও সে পুরো জানে নাই। প্রত্যেক স্বাধীন ও উন্নত রাষ্ট্রের শিক্ষার মধ্যে শিল্পকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে কারণ দেশের শিল্প বা শিল্পসম্পদই আসল। যে দেশ এই সম্পদে অপূর্ণ সে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়; সে দেশের অবস্থা কেমন, যে কেহ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে।

আমাদের এই দেশে—রামায়ণ মহাভারতের সময়ে কুটীর শিল্প কতখানি উন্নত ছিল যিনি ইতিহাস বা পুরানো কাহিনী পড়িয়াছেন তিনি অবশ্য জ্ঞাত আছেন। তখন আজকালকার মত বড় বড় কলকারখানা বা মেশিন ছিল না—অতঃত দৈনন্দিন জীবনক্ষেত্রে; সবাই ছোট ছোট হস্ত যন্ত্রের দ্বারা নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র তৈয়ারী করিয়া লইত। আর তুলনা করা যায়—সে কালের দুনিয়া আর একালের দুনিয়ার সহিত—অবশ্য অনেক প্রভেদ হইয়াছে, তবে সভ্যতা বিকাশের সংগে সংগে এর পরিবর্তন হইবে তাহা স্বাভাবিক।

এখন আমাদের সম্মুখে যান্ত্রিকতার বাহুল্যের জন্য যে সংকট দেখা দিয়াছে—প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হবে, কুটীর শিল্পকে যদি বাঁচানের মত বাঁচাইতে হয়, তবে আক্ষরিক জ্ঞানের মতনই জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত ইহাকে আঁকড়িয়া রাখিতে হইবে এবং দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে স্থান অবশ্য দিতে হইবে। এবং যেদিন সমাজে কুটীর শিল্প উন্নতি লাভ করিবে সেদিন দুনিয়ার ও ভারতের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হইবে ইহা ধ্রুব সত্য।

———

সমবায় প্রথায় শিক্ষা

শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া বহু মনীষী ব্যক্তি নানারূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর-বাদ লইয়া নানা ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মহাত্মারা যেরূপ নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বীয় অভীষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন—কিন্তু লক্ষ্যস্থল একই, নাম ও মতবাদেরই মাত্র পার্থক্য, তদ্রূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য সব দেশেরই এক—অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে উন্নত হওয়া এবং পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করা। কিন্তু বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ—নিজ নিজ রাষ্ট্রের আদর্শানুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপ ও সর্ব প্রকারে উন্নত ভবিষ্যৎ পুরাদস্তুর নাগরিক গঠন করা, যাহারা অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া আদর্শানুযায়ী তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে। ইহাতে শিক্ষার সার্বজনীনতা রাষ্ট্রবিশেষে ক্ষুণ্ণ হইবার খুবই আশঙ্কা। বিশেষ আলোচনা নীচে হইতেছে।

দেশের নায়ক মহাত্মা গান্ধী দেশের স্বাধীনতার বিষয়ই কেবলমাত্র চিন্তা করেন নাই, রাষ্ট্রের এমন কোন স্তর নাই যাহার প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁহার চিন্তাপ্রসূত মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হয় নাই। এবং সে বিষয়ে যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ ভাবে তাহা কার্যের মাধ্যমে রূপায়িত তিনি করিয়া গিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও দেশ গঠন তাঁহার নিকট একই স্তরের করণীয় বিষয় ছিল। দেশ সুগঠিত না হইলে স্বাধীনতা মূল্যহীন এমন কি লব্ধ স্বাধীনতাও বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যায়। ভারতের ন্যায় দেশের পক্ষে "বুনিয়াদী" শিক্ষাই যে একমাত্র আদর্শ প্রাথমিক শিক্ষা তাহার যে তিনি শুধু নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা নহে জীবন কালেই উহাকে হাতে কলমে বাস্তব রূপ দান করিয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষাই তাঁহার মহান্ "নই তালিমের" (New order of the Society) বীজাগার। এই শিক্ষাই বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে কিন্তু কার্যকরী রূপদান বিলম্বিত হইতেছে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক পৃথক গণ্ডীর সৃষ্টি করা চলে না—একের সঙ্গে অপরের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সুতরাং প্রাথমিক বুনিয়াদীরই রূপ লইয়া উত্তরোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যতটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আবশ্যক তাহাকে মানাইয়া লইয়া। বুনিয়াদী শিক্ষাকে অনেকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষারই রূপান্তর মনে করিয়া থাকেন এবং সমাজে শ্রমের মর্যাদা স্বীকার ও তদ্দ্বারা অর্থাগমের ব্যবস্থা করাই প্রধান বিষয় মনে করেন। কিন্তু মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী ও গভীরতর। তাঁহার মতে "জীবনে সত্য ও প্রেম প্রতিষ্ঠাই" বুনিয়াদী শিক্ষার মূল আদর্শ। উহা শিল্পকেন্দ্রিক হইলেও সমাজ সেবা ও কৃষি শিক্ষাই উহার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। পূর্ণাঙ্গ নাগরিক প্রস্তুত করিতে হইলে সমাজসেবাকে আশ্রয় করিয়া কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকাশেই একমাত্র শিক্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্ভব এবং উহা এখন স্বীকৃত। মহাত্মাজীর মতে শিক্ষা, বিশেষ প্রাথমিক পর্যায়ে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী ও অল্প ব্যয়ে যত শীঘ্র কার্যকরী করা যায় ততই ভারতের ন্যায় দরিদ্র অশিক্ষিত বিরাট দেশের পক্ষে মঙ্গল। তাঁহার আদর্শ রূপায়িত হইতে যত বিলম্ব হইবে শিক্ষাসঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে দেশের ততই বাধা পড়িবে। তাঁহার মতে বুনিয়াদী শিক্ষা এককালীন

ব্যয়ে গৃহাদি নির্মাণ ও আসবাবাদি খরিদ ইত্যাদি করিয়া যতদূর সম্ভব শিক্ষার ব্যয় চালাইয়া লইবে স্থানীয় ছাত্র ও শিক্ষকের শ্রমলব্ধ ফলাদি, শিল্প ইত্যাদি দ্বারা। কিন্তু বর্তমানে সর্বপ্রকার ব্যয়ই সরকারকে বহন করিতে হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার পর দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষাই আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় বস্তু। এই কারণ ইহার একটু বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমানে বাঙলার প্রাথমিক শিক্ষা চার বৎসরে সমাপ্ত, মুষ্টিমেয় তথাকথিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে পাঁচ বৎসরের শিক্ষা। তাহার পর উত্তরবুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও ঠিক মতন গড়িয়া উঠে নাই প্রাথমিক পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়েও যদি এই রূপই চলিতে থাকে তাহা হইলে আশঙ্কা হয় যে সে শিক্ষা দুইয়েরই বাহিরে দাঁড়াইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষাই বিশেষ চিন্তার বিষয়, যাহা একদিকে প্রাথমিক অপর দিকে উচ্চশিক্ষার অন্তর্বর্তী হইয়া উভয়ের অনুপূরক হিসাবে সাহায্য করিবে। এই সময়ে বয়ঃসন্ধিতে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা কালই খুব সঙ্কটের সময়। এখন ইন্দ্রিয়ের উন্মেষের সঙ্গে জগৎকে একটা রঙ্গীন রংয়ে দেখিতে থাকে ও বুঝিতে চেষ্টা করে। এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে মন ও শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সৃজনাত্মক বিষয়েই চিত্ত সহজে আকৃষ্ট হয়। এই শিক্ষাসমাপ্তির পর অনেকের ভাগ্যেই উচ্চ শিক্ষা লাভ নানা কারণে সম্ভব হয় না। এ কারণ আদর্শ সমাজ যাহারা তৈয়ারি করিবে ইহারাই তাহাদের প্রধান একাংশ। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ অবহিত হইতে হইবে।

সত্যের ন্যায় শিক্ষা চিরন্তন ও স্বপ্রকাশ কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে যে দেশগত রাষ্ট্রীয় আদর্শানুযায়ী ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ নাগরিক গঠন করাই বর্তমান যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। যদিও প্রকৃত শিক্ষা দেশ কালের উর্ধ্বে "জগদ্ধিতায় চ" এবং তাহাই আদর্শ হওয়া উচিৎ। আর চাই সুস্থ সবল দেহে তদ্রোদিক সুস্থ সবল মন, যাহার অধিকারী বর্তমান যুগোপযোগী শঠতা, কপটতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি দ্বারা অন্যের সঙ্কোচ সাধনে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিবর্তে "সহ অস্তিত্বের" উর্দ্ধে "পরার্থে" নিজকে উৎসর্গ করিবার মহত্ত্ব অর্জন করিবে—সত্যাশ্রয়ী হইবে এবং সত্যাশ্রয়ীর যাবতীয় কঠোরতা দ্বিধাহীন চিত্তে কর্মক্ষেত্রে বরণ করিতে সামান্য মাত্রও বিচলিত হইবে না। প্রাচ্যের সুমহান ত্যাগের আদর্শের বাহক ভারত আজ বিশ্ববাসীকে তাহাই শিখাইবে। বিশ্ববিশ্রুত দেশবরেণ্য দার্শনিক আচার্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণন শিক্ষাবিষয়ক তাঁহার একাধিক সারগর্ভ ভাষণে শিক্ষার আদর্শ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণের অংশ বিশেষ "শিক্ষা" হইতে উদ্ধৃত হইল—

".....সামান্য অজুহাতে ছাত্রদের ধর্মঘট ও মিছিল করিবার কথা প্রায়ই শুনা যায়।...অসংযত আচরণ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, শিক্ষার মান গিয়াছে কমিয়া। শিক্ষকের ছাত্রদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহারাও এক যোগে একই লক্ষ্যের জন্য কাজ করিতেছেন। সকলের মধ্যে সহযোগিতা থাকা চাই।

.....শরীর যাহাদের পটু এমন সব ছাত্রদের জন্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা চাই। ইহার মানে নয় যে আমি হিংসাবাদে বিশ্বাসী। আমি বিশ্বাসী নই, কিন্তু আমি চাই আমাদের তরুণ তরুণীরা মনুষ্যত্ব, সাহস, একযোগে কাজ করিবার শক্তি, বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইবার ক্ষমতা, আত্মরক্ষা করিবার ও প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জন করিবার ক্ষমতা যেন অর্জন করে।.....

আমাদের কাজ হইল জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, পৃথক করিবার ধারণা দূর করা। যুক্তি ও ভাবের অস্ত্র ব্যবহার

করিতে হইবে। যাহাতে এই সব বিভেদ করার শক্তি দূর করিতে পারে, লোকে মনে প্রাণে এমন কাজ করিতে পারে, যাহাতে তাহারা এখন যেমন নিজেদের সম্প্রদায় বা জাতির জন্য মমত্ব অনুভব করে, বিশ্বের জন্য তেমন অনুভব করিবে।

একটি বিশ্বরাষ্ট্রের কথা আমরা ভাবিতেছি। সকল সীমারেখা একেবারে দূর হউক, চিন্তাজগতে ইহা একান্তই দরকার।

এই যে সংস্কৃতির বিনিময়, ইহাতে মহান ভারতীয় আদর্শ যে জয়ী হইবে সে কথা মনে করা নিতান্তই কল্পনা মাত্র নহে।...ভারতের বাণী আজ আমাদের ডাকিয়া লইতেছে, জীবনের এক নূতন ধারা, এক শুদ্ধ ধারার দিকে। ইহা বলিতেছে, আরাম হইতে সরিয়া আইস, সংসারে আকাঙ্ক্ষা উন্মাদনা ছাড়িয়া দাও, ঊর্ধ্বগামী হও। ভবিষ্যতের আশা তাহাদেরই হাতে যাহারা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু মোহগ্রস্ত নরনারীর প্রতি যাহাদের আচরণে প্রেম ও করুণা দেখা যায়। এই অল্প কয়জন যাহারা দলে নয়, যাহারা মানব জাতির সংগ্রামে সর্বাগ্রে যুদ্ধনিরত, যাহাদের কাজ হইল সমাজদেহের বর্তমান অঙ্কুরগুলি লইয়া। আমরা সকলে যে নূতন জগৎ গড়িতে চাই তাঁহারাই সেই নূতন জগতের অগ্রদূত।"

ভারতীয় ছাত্রছাত্রীকে এমন বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে যাহাতে তাহারা নূতন জগতের অগ্রদূতের ভূমিকায় পূর্ণ সাফল্য অর্জন করিবে।

তাহার পর চাই শিক্ষার ব্যবহারিক রূপ। বাস্তব জীবনে অন্নবস্ত্রের সম্মুখীন হওয়া—সাংসারিক প্রয়োজন মিটাইবার শিক্ষা, এবং চাই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা (discipline) আজকাল যাহার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে ছাত্র সমাজে। এই আদর্শগত ও ব্যবহারিক জীবনের ছাঁচে ঢালিয়া আদর্শ ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইবে। দেশের আর্থিক মান উন্নয়ন চাই কিন্তু মনে রাখিতে হইবে নীতিবর্জিত অর্থ অনর্থের সহায়ক। একারণ উদ্দেশ্য ও পন্থা উভয়েরই সমতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে শিক্ষায়তনগুলিকে। সমাজসেবা অন্তরের প্রসার আনয়ন করে কিন্তু আর্থিক সঙ্কটত্রাণের উপায় শিক্ষা না হইলে শিক্ষার্থীর মন শিক্ষার বিশেষ আকৃষ্ট হইতে পারে না, একারণ সমাজসেবা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা কি প্রকারে দেশে প্রচলিত হইতে পারে তাহাই আলোচ্য বিষয়। শিক্ষায় ধর্মের স্থানও আছে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বর্তমানে উহা অচল। যদিও এ প্রবন্ধে উহার স্থান গৌণ, কিন্তু ভাবিবার বিষয়। বিশেষ প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাজগোপালাচারি মহাশয়ের মতে "ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। তিনি বলেন—..... "বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগের পূর্বে দেশের যুবসমাজকে ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় মানসিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলায় আমাদের দেশের কলেজগুলির আবহাওয়া এমন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে যে এই ধরণের কোন চেষ্টাই করা হইতেছে না। সঙ্কট অবস্থার গুরুতর—বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের পর্যালোচনা ও উপলব্ধির সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিলে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।... আমাদের সংস্কৃতি ও দর্শন বিগত কালে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আজ যদি এগুলি অক্ষুণ্ণ থাকিত তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অসম্পূর্ণতাজনিত ক্ষতির জন্য লক্ষ্য না করিলেও চলিত। কেবল মাত্র পণ্ডিতমহলে নহে, জন চিত্তের ও জনসাধারণের গভীর চেতনায় যদি বৈষয়িক সংস্কৃতি বাঁচাইয়া রাখা যাইত, তবে স্কুল বা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির ফলেও গুরুতর ক্ষতি হইত না।"

তাঁহার মতে সমস্যা-সমাধানের উপায়—"ধর্ম ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া নহে বরং সেগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়া এবং নিজ নিজ

হইয়ে সে গুলির মূল্য উপলব্ধি করিয়াই আমরা নিজেকে যথাযথ ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিব।"

ধর্ম শব্দের সহিত নিষ্ঠা যেন আপনা হইতেই জড়িত হয়। একারণ ধর্মকে ব্যাপক ভাবে ধরিতে হইলে এক কথায় বলা যায় ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত শুদ্ধচিত্তে স্বার্থলেশহীনভাবে যাহা করা যায় তাহাই ধর্ম। এই ধর্মনিষ্ঠাই আদর্শ মহৎ ব্যক্তিগণকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছে। শিক্ষায় সুমহান আদর্শকে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত তাহা প্রতিপালন করাই শিক্ষায় ধর্ম।

উপরোক্ত রূপ শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরী করিতে হইলে চাই প্রত্যেক স্কুলে (১) একজন সমাজ সেবা (২) একজন কৃষি (৩) একজন শিল্প ও একজন সামরিক বিভাগীয় ব্যায়াম শিক্ষক। ইহা ব্যতীত স্কুলগুলিকে দলাদলি হইতে মুক্ত করা অত্যন্ত প্রধান কর্তব্য। তাহার জন্য চাই শিক্ষক শিক্ষিকা কোন রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া কার্য করিবেন না—ব্যক্তিগত যে মতই তিনি পোষণ করুন না কেন, স্কুলে যেন তাহার অভিব্যক্তি না হয়। এমন কি যতটা সম্ভব সমাজের মধ্যেও তাঁহাকে সেবাকর্মী ও আদর্শ স্থানীয় হইয়া চলিতে হইবে—এক কথায় আচার্যের পদ লইতে হইবে।

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় অধিকাংশ স্কুলেই অনুমোদিত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগই অর্থাভাবে এরূপ অসম্ভব, অতএব প্রস্তুত শিক্ষার জন্য চারি জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ বর্তমানে বাতুলতা মাত্র। ইহার জন্য রাষ্ট্র যত দিন টেইনড্ শিক্ষক নিয়োগে সমর্থ না হইবে তত দিন তাহার একমাত্র বিকল্প শিক্ষা-ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে না। এই শিক্ষা "যৌথিক শিক্ষা ব্যবস্থার" দ্বারা সম্ভব। কাছাকাছি অবস্থিত ৪ হইতে ৬টি (হাই ও জুনিয়ার) স্কুলকে লইয়া একটি "শিক্ষা সংসদ" বা স্কুল হইতে কয়েকজন করিয়া সভ্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিতে হইবে যাহার সভ্য সরকারী ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মনোনয়নগণও হইবেন। এইরূপ কমিটি হইতে একজন কৃষি শিক্ষক, প্রাথমিকের স্কুলগুলির জন্য, একজন শিল্প শিক্ষক ও একজন সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। ঐ শিক্ষকগণ গ্রাম্যমান শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন (Peripatetic centre করিয়া)। যখন যে স্কুলের কার্যে যাইবেন তথায় থাকা ও খাইবার ব্যবস্থা সেই স্কুল করিবে। এতদ্ব্যতীত বেতন সকল স্কুলই সমভাবে দিবে। বর্তমান যুগ "সমবায়ের যুগ" তবে শিক্ষাই বা কেন সমবায় প্রথায় চলিতে পারিবে না।

(১) একটি বিষয় থাকিবে সমাজ সেবা, তাহার জন্য চাই স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা নিজ নিজ স্কুলের ছাত্র লইয়া "সেবক" ও "সেবাদল" গঠন করিয়া কার্য করা এবং ছাত্রদলকে "আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া (first aid) এবং প্রচলিত অসুখ যথা ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড ইত্যাদি দ্বারা তাহারা যাহাতে আক্রান্ত না হয় এবং আক্রান্ত হইলে যাহাতে তাহারা রোগমুক্তির সাধারণ নিয়মগুলি শিক্ষা করিয়া সেবাকার্যে সেবক নিজেই রোগাক্রান্ত না হয়। রোগ হইলে তাহার প্রতিকার করা অপেক্ষা যাহাতে রোগাক্রান্ত না হইতে হয় তাহা শিক্ষা করা দরকার (Prevention is better than cure). দেশ-ভ্রমণ ও বিশেষ বিশেষ ছুটিতে স্থানে স্থানে সমাজ সেবামূলক সমবেত কার্যও শিক্ষার আবশ্যকীয় অঙ্গ। অপরাপর বিষয়ের পরীক্ষার ন্যায় সমাজ সেবা ও স্বাস্থ্যের পরীক্ষা আবশ্যিক—যৌথিক, লিখিত ও কার্যের মাধ্যমে (Practical)।

যেখানেই উচ্চ বিদ্যালয় আছে সেখানেই

একজন পাশকরা ডাক্তার নিশ্চয়ই আছেন এবং তাঁহার দ্বারা ঐ রূপ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে কিছু ভাতাও দিতে হইতে পারে। অর্থই যদিও লোককে আকৃষ্ট করিবার প্রধান অস্ত্র কিন্তু সম্মান ও ক্ষমতার বিনিময়েও লোক কার্যে আকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে স্কুল কমিটিতে ডাক্তারের একটা স্থান থাকা সরকারী অভিমতে বাঞ্ছনীয় কিন্তু উহা আংশিক হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ সমাজ সেবা শিক্ষার জন্য একজনীন আনুমানিক ১০০৲ টাকার ব্যবস্থাদিতে চলিতে পারে ও মাসিক ১০৲ টাকা খরচাতেই সম্ভব। ডাক্তার বাবুকে ভাতা দিতে হইলে তাহা ও ২৫।৩০৲ টাকার হইতে পারে। তাঁহার দ্বারা স্কুলে স্বাস্থ্য বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে পূর্ণ সময়ের জন্যও নিয়োগ করা চলে, আনুমানিক প্রারম্ভিক ১০০৲ টাকাতে চলে কার্যের তাঁহাকে বাহিরে সুযোগ দিলে। তাঁহাকে একজন শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত করা যাইতে পারে।

বিশেষ-শিল্প-শিক্ষক তিন জনকে যদি ৪০টি স্কুলের জন্য একত্রে নিয়োগ করা যায় তাহার খরচা পড়িবে আনুমানিক ৬০—৭৫৲ টাকা প্রত্যেক স্কুলের জন্য।

সমাজ সেবার পরই কৃষি শিক্ষার স্থান। কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে নির্ভরশীল প্রায় প্রত্যেকেই। প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতামূলক কৃষিজাত উৎপন্নের ফলাফলের বিষয় আলোচনার ফলে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্তে জানা যায় যে জমির উপর উৎপাদন এখনও ৪।৫ গুণ বাড়াইবার পথ আছে। একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে পরীক্ষা-মূলক কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ৩।৪ বিঘা জমি সংগ্রহ করা কঠিন নহে, যত বেশি হয় ততই ভাল।

কৃষি শিক্ষার দ্বারা কেবল যে আর্থিক সুরাহা হয় তাহা নহে, উহা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভেরও সহায়ক এবং বস্ত্র দানব কর্মী (mill hand) অপেক্ষা কৃষকের প্রকৃতি অনেকটা শান্ত। এ বিষয়ে একটি উদাহরণই যথেষ্ট হইবে। অনুধানিক ২০ বৎসর হইল তুর্কির এক বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তি নাম 'জিয়ো আগা' ১৮৪ বৎসর বয়সে মারা যান—তাঁহার ১৭টি বিবাহ এবং ৩৩টি সন্তান—বহু যুদ্ধে যোগদান করেন, এমন কি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেও। তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের বিষয় জানিতে চাহিলে অপরাপর বিষয়ের সহিত বলেন যে "আমি অন্য ব্যবসায়ী নহি —কৃষিজীবী, উন্মুক্ত খোলা মাঠে কৃষি কার্যে রত থাকাই আমার দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ"—যাহা তিনি নিরামিষাশী, উৎসবাদিতে ছাগ মুরগীর মাংস খাইতেন।

(৫) কৃষির পরই গ্রামাঞ্চলে শিল্পের স্থান—অবশ্য সহরে শিল্পেরই অগ্রাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং কলিকাতার ন্যায় প্রধান প্রধান সহরগুলির স্কুলে কৃষি শিক্ষার পরিবর্ত্তে দুই জন শিক্ষক নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। সহরে তবুও নির্ভরযোগ্য শিল্পী পাওয়া যায় কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ স্থলেই উপযুক্ত কারিগরের বিশেষ অভাব এবং চাহিদার অনুপাতে সংখ্যায় থাকায় তাহাদের উপার্জ্জনও অধিক এবং গ্রামবাসীর পক্ষে বেশি ব্যয়। এ কারণ গ্রাম্য বিদ্যালয়েও শিল্প শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। কিরূপ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে তাহা স্থানীয় প্রয়োজন বোধে এবং কোন বর্ষ বিশেষের সহিত কোন সংঘাত না হয়—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তত্রত্য শিক্ষাসংসদের কমিটিই বিবেচনা করিবেন। সাধারণতঃ যে সকল শিল্পের কাঁচা মাল সংগ্রহের সুবিধা আছে এবং বাটীর সকলেই যে কার্যের সহায়তা করিতে পারে এবং যে প্রস্তুত দ্রব্যের চাহিদাও আছে—সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কি গৃহশিল্প কি কুটীরশিল্প (Home Industry or Cottage Industry) শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থায় একজনীন ও চলতি ব্যয়বহুলতা না হয় তাহা দেখিতে হইবে সাধারণ ভাবে কাঠের কাজ অনেক

হলেই প্রচলন করা যায়—স্থানীয় শিল্পের অগ্রাধিকার দিয়া।

বর্তমানে যে রূপ রাস্তা ঘাট প্রস্তুত হইয়া দূরের গ্রামাঞ্চলের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা হইতেছে এবং জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন ও অন্য উপায়ে বিদ্যুৎ (সরবরাহ) সহজ লভ্য হইতেছে তাহাতে বহু গ্রামাঞ্চলেই জাপানী ও অপরাপর শিল্পকেন্দ্রিক দেশের ন্যায় কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে কিরূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার জন্য ভিন্ন ভাবনার কারণ থাকিবে না কিন্তু মহাত্মার নঈতালিমের ও সর্বোদয় সংস্থার আদর্শ বজায় থাকিবে কি না সন্দেহ আছে খুবই।

স্বাস্থ্য

(৪) "স্বাস্থ্যই সম্পদ" এই নীতিবাক্যের দ্বারা স্বাস্থ্যের স্থান যে সর্বাগ্রে তাহাই স্বীকৃত হইতেছে। নীতিবর্জিত অর্থ যেরূপ অনর্থের সহায়ক তদ্রূপ অপরাপর গুণাবলী যথা নিয়মানুবর্তিতা, সদাচার ইত্যাদি শিক্ষা ব্যতীত স্বাস্থ্য ও অনেক সময়ে পরপীড়ার কারণ দাঁড়ায়, এ জন্য স্বাস্থ শিক্ষার জন্য চাই সাধারিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিক্ষক। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীর কোনরূপ শরীর চর্চায় যোগদান করা আবশ্যক। স্বাস্থ্যবর্জিত শিক্ষা অপূর্ণ। ভারতের স্থান এ বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কোথায় তাহা বিশ্ব-ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সম্যক বুঝা যায়। এ কারণ অর্থকরী বিদ্যা যেমন কাম্য তদপেক্ষা কাম্য হইতেছে চরিত্রবান, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, নির্ভীক তেজোদীপ্ত ছাত্রছাত্রী দল। এ বিষয়ে সরকার অতি সত্বর অবহিত না হইলে দেশ গঠনে অধিক বিলম্বিত হইবে, এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে, এখন যেরূপ মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন প্রাথমিক শিক্ষক দ্বারা কিরূপে বিশেষ বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা সম্ভব। শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য পরিচালনার ভার থাকিবে স্থানীয় একটি কমিটির উপর—স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও বিভাগীয় স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর সাহায্যে শেষোক্ত ব্যক্তি পরামর্শ-দাতার কার্য করিবেন। এইরূপ তুষি কর্মচারীর অভাব হইবে না—অভাব হইতে পারে শিল্প-কর্ম-চারীর কিন্তু সরকার যদি সমবায় শিক্ষা কার্যকরী করিতে চান—তাহা হইলে ঐরূপ কর্মচারী অধিক নিয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য কয়েক মাস শিক্ষার পর যোগ্যতা অনুযায়ী ছাত্রেরাই তৎস্থান গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহার দ্বারা কার্যে ছাত্রমণ্ডলীর বিশেষ উৎসাহ হইবে, এবং আত্মপ্রত্যয় বর্ধিত হইবে ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লর্ড হেলিফেক্সের অভিমতে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস ছাত্রাবস্থায় নিজ নিজ বিদ্যালয়ের অনেক বিষয় পরিচালনার সুযোগ পাওয়াতেই পরবর্তী জীবনে সেই শিক্ষা এতদূর কার্যকরী হইয়াছিল যে তাঁহারা একরূপ সহায়হীন অবস্থায় এবং বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ইংলণ্ডের জন্য প্রাচ্যে বিরাট এক সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন।

শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে আবাসিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু ভারতের পক্ষে বর্তমানে আর্থিক সমস্যা বিজড়িত অবস্থায় শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করা কষ্টকর সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থাকেই যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। অভিভাবকের সহিত যোগাযোগ রাখাই শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তব্য। স্কুলের শিক্ষার ভাবধারার সহিত সামাজিক আবেষ্টনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক কারণ এখানে শিক্ষা আবাসিক নহে। এমন কি আবাসিক হইলেও এরূপ যোগাযোগের

প্রয়োজনীয়তা আছে, বিশেষ সমাজসেবামূলক শিক্ষার জন্য।

এইরূপ 'শিক্ষা সংসদ' গঠিত হইয়া শিক্ষাকার্য চলিতে থাকিলে সর্বক্ষেত্রে ঐ সংসদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র-গুলিতে সকল বিষয়েই সমষ্টিগত উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতে থাকিবে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক কার্য দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সর্ব বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিবে।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

শিক্ষা

স হি কল্যাণরূৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৬২ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

শারদীয় অবকাশ

পূজার ছুটি সমাগত। আকাশে বাতাসে এখন শরৎ ঋতুর মাধুর্য। বৎসরে বৎসরে এই ঋতুর অভ্যুদয়ে প্রকৃতির জগতে যেমন চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়, ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়েও এক আনন্দের আহ্বান জাগিয়া ওঠে। সেই আনন্দ ছুটির আনন্দ, অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতে বিরতির আনন্দ, প্রবাস হইতে গৃহে যাওয়ার আনন্দ, কঠিন বাঁধা কাজ হইতে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ।

এই মুক্তি যদি শুধুই আলস্যে, বীর্যহীন কর্মের মধ্যে ব্যাহত হয় তবে তাহা বিস্বাদ হইয়া ওঠে। পূজার আয়োজনের মধ্যে, পূজার আয়োজনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে যে উদ্যোগ চলে তাহার মধ্যে কর্মশক্তি সার্থক হয়। শুধু বিনা কাজে বাঁশি বাজাইয়া বেলা কাটান চলে না। ছাত্র-ছাত্রীরা এই অবকাশটিকে আনন্দের মধ্যে মুক্তির আস্বাদনের মধ্যে উপভোগ অবশ্যই করিবে। অবকাশের শেষেই যাহাদের পরীক্ষা তাহারা পড়াশুনায়ও কিছুটা সময় যাপন করিবে, কিন্তু এই ছুটিতে আরেকটি মহৎ কাজ তাহাদের মুখ চাহিয়া আছে। সেটি পল্লীসেবা।

জনসাধারণের সঙ্গে না মিশিবার ফলে তাহাদেরও মধ্যে যে নানা প্রচেষ্টা চলে, তাহাদেরও যে একটি বিশেষ সংস্কৃতি ও রুচিবোধ আছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই আমাদের স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহারাই তো দেশের বড় অংশ, জাতির মেরুদণ্ড। আমরা তাহাদের ও আমাদের মধ্যে যে ব্যবধানের রেখা টানিয়া রাখিয়াছি, এই যুগে ছাত্রছাত্রীদের, দেশের তরুণদের সেই কৃত্রিম রেখা লোপ করিয়া দিবার কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের মনীষীরা কেহ কেহ পূর্বে এই কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, কিন্তু যুবসম্প্রদায় এই কাজের ভার বহন না করিলে তাঁহাদের চেষ্টা কখনই সফল হইতে পারে না। দেশের তরুণরা যেদিন বুঝিবে সমাজের এই ঋণ তাহাদের শোধ করিতেই হইবে, কেবল সেই দিনই দেশে ছোট বলিয়া একটি আলাদা জাতের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। তাহাদের সেবার পল্লী-গুলি

প্রীনন্তিত হইয়া উঠিবে। এই সাধনীয় অবকাশে পল্লী-সেবায় অনেক সুযোগ ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করিলেই পাইবে।

রাজা রামমোহন রায়, মহাত্মা গান্ধী, যে দুই জন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার্পণের উৎসব আমরা আশ্বিন মাসে ভারতের সর্বত্র উদ্‌যাপন করিলাম, তাঁহারা দুইজনেই জনচিত্তের সঙ্গে শিক্ষিতের যোগসাধন, ও এই কৃত্রিম ব্যবধান দূর করার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনকথা যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল, কিন্তু তাঁহাদের কথা অনুযায়ী কাজ কি আমরা সাধ্যমত তুলিয়া লইব না?

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগের অবসান হইল না। ছাত্রদের দুর্বৃত্ত ও অশোভন অসামাজিক আচরণের ফলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখিয়াছেন. পূজার ছুটির পূর্বে আর খোলা হইবে না। ছুটির পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। আমরা আশা করি অবস্থার পরিবর্তন হইবে, এই লজ্জাকর অবস্তিজনক অবস্থা হইতে কর্তৃপক্ষ মুক্তি পাইবেন। ভিতরের ব্যাপার দূরে হইতে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া সম্ভব নয়, অনুসন্ধান কমিটির ফলাফল জানিবার আগে মতামত প্রকাশ করাও অসঙ্গত। কিন্তু বাহিরের যে দৃশ্যটি অত্যন্ত মানিকর, তাহা হইল, ছাত্র ও শিক্ষক এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের এই সম্বন্ধ। অবিনয় ও ঔদ্ধত্য ছাত্রসমাজের পক্ষে পরিতাপের বিষয়, আবার শিক্ষক ও পরিচালকদের বিচার-বিবেচনার, এবং ছাত্রদের সহিত ব্যবহারে সহৃদয় কুশলতার অভাব দেখা গেলে তাহাও কম পরিতাপের বিষয় নয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা একান্ত মনে কামনা করি, শীঘ্র এই অবস্থার পরিসমাপ্তি হউক, ছাত্র ও শিক্ষকের অন্তরঙ্গতার সম্বন্ধটি আবার সহজ হইয়া আত্মপ্রকাশ করুক।

বেতারে শিক্ষা প্রচার

সম্প্রতি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে একটি নূতন প্রচেষ্টার গোড়াপত্তন হইল। বেতারের মারফত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ দান করা হইবে। বেতারে বিষয়টির আলোচনার পর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বিশদ ভাবে উহার আলোচনা করিয়া ছেলেমেয়েদের বুঝাইবেন। প্রতি দিন হইবে, না, মাঝে মাঝে হইবে, কোন্ সময়ে হইবে, সেসব এখনও সঠিক জানা যায় নাই। তবে আমরা আশা করি এই বেতার ভাষণে পাঠদান যাঁহারা করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এ কাজের উপযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের পাঠদানে যদি শ্রোতাদের মনে কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহা জাগে তবেই এই পরিকল্পনা সার্থক হইবে।

বিদ্যালয়গৃহে শিক্ষকগণ ছাত্রবাহুল্যের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে সকলের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন না, ফলে সমষ্টিগত ভাবে পড়া বলিয়া দেন ও পড়া নেন। তাহাতে অনেকেরই মনে শিক্ষা দাগ কাটিয়া বসিতে পারে না, তাহারা দিশাহারা ভাবে চলিয়া যায়, কিছুটা গ্রহণ করে, কেহ কেহ পরে গৃহে গিয়া বাকিটা হৃদয়ঙ্গম করে, তাহাও অভিভাবক বা গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর বিশেষ একটি অংশ কিছুই গ্রহণ করে না, গতানুগতিক ভাবে দিনগুলি কাটাইয়া দেয়। এই বেতারমাধ্যমে পাঠদানের ফলে তাহাদের কৌতূহল যদি জাগ্রত হয় এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এই সুযোগটির যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন তবে খুব ভালই হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পরিবর্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বা বিদ্যাপরিষদ্ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলার পরীক্ষাপত্রে ও নম্বর দেওয়ার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনিতে চান। তাঁহারা বলেন, ইংরেজিতে তিন পেপারের বদলে দুই পেপার

করিয়া মোট ২০০ নম্বর রাখা হউক, আর বাংলা এক পেপারের বদলে দুইটি করিয়া তাহাতে ২০০ নম্বর রাখা হউক। ইংরেজিতে পাশের নম্বর শতকরা ৩৩ না রাখিয়া ৩০ করা হউক।

আমাদের মনে হয় বাংলাতে দুই পেপার করা ভালই, মাতৃভাষার দিকে যত জোর দেওয়া হয় ততই আমাদের কল্যাণ। আর পাশের নম্বর কমানোর ভাল মন্দ দুইই আছে। অবশ্য ৩৩ রাখার ফলে ফেলের সংখ্যা বেশি হয় দেখিয়া পরে আবার পুনর্বিবেচনার ফলে চার ছয় নম্বর অতিরিক্ত দিয়া পাশ করানোর অপেক্ষা গোড়া হইতেই ৩০ নম্বর রাখিয়া দেওয়া ভাল। অবশ্য, যদি এইখানেই সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন

মহা দিল্লীতে নিখিল-ভারত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রথম অধিবেশনে মৌলনা আজাদ বলিয়াছেন যে এই কমিশন দেশের সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সুদূরপ্রসারী অনেক সংস্কার ও উন্নতির প্রস্তাবও করিয়াছেন। মৌলানা আজাদ জানান, সুখের বিষয় তাঁহাদের অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে এই প্রথমবার রাজ্যসরকার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ দেশের মধ্যশিক্ষার পদ্ধতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে একমত হইলেন। এই সুপারিশগুলি গৃহীত হইলে মধ্যশিক্ষা একটি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিবে, আশা করা যায়।

পর্ষদের এই অধিবেশনে আরও ঘোষণা করা হয় যে, রাজ্য সমূহে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত উন্নয়ন ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ প্রভৃতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যোগাইয়া দিবার জন্য একটি "কিড স্টাফ" নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই পর্ষদের সভাপতি হইলেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাসচিব হুমায়ুন কবীর মহাশয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য-কমিশন এককালীন তিন লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তিন লক্ষ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নয়ী তালিমের শিক্ষকদের মাঝে

বিনোবা

আমি দেখিতেছি নয়ী তালিমে যেরূপ আশা করা যায় সেরূপ জিনিস তৈয়ারি হয় না। এজন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু অসন্তোষের ভাব জন্মে। আবাদি কংগ্রেসে বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করার প্রস্তাব হইল, আর সে প্রস্তাব করিলেন স্বয়ং পণ্ডিত নেহেরু। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে দশ বৎসরের মধ্যে নয়ী তালিমই সরকারি শিক্ষার পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যই আজ যে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলিতেছে তাহাদের আদর্শ বিদ্যালয় হওয়া দরকার। তবেই তাহাদের কাছে যে প্রত্যাশা তাহা পূর্ণ হইবে এবং সারা হিন্দুস্থান তাহাদের অনুকরণ করিবে। নতুবা বলিবে একরকম, আর চলিবে অন্য মতে। আজকাল বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষপাতী যে ইস্কুলগুলি চলিতেছে, তাহাদের তো নৃসিংহাবতারের অবস্থা; না পুরা মানুষ, না পুরা পশু। সেজন্য আজ আমাদের শুটিকতক আদর্শ বিদ্যালয় চালান নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু আদর্শ বিদ্যালয়ের অর্থ কি তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া চাই।

কেহ কেহ মনে করেন, ছাত্রছাত্রী কিছুক্ষণ সুতা কাটিল, কিছু হাতের কাজ করিল, আর অমনি বুনিয়াদী শিক্ষা হইয়া গেল। কেহ মনে করেন, লেখাপড়ার অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ের দিকে বেশি মন না দেওয়াই হইল বুনিয়াদী শিক্ষা। আবার কেহ মনে করেন, কিছু জ্ঞান লাভ আর তাহার সঙ্গে কিছু হাতের কাজ জুড়িয়া দিলেই হইল; এই জুড়িয়া দেওয়া ব্যাপারটি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সম্ভব কিনা তাহাও যেন ভাবিয়া দেখার দরকার নাই! এই তিন ধারণাই ভুল। বুনিয়াদী শিক্ষায় ছেলেমেয়েকে সামান্য কিছু হস্তশিল্প শিখাইলে চলিবে না। হাতের কাজ তাহাদের পক্ষে এমন স্বাভাবিক হওয়া চাই, বাহা যেমন সহজে গলে বিচরণ করে। আমি শুনিয়াছি, কোথাও আবার ছাত্রকে কিছু বৃত্তিও দেওয়া হয়। আমি তো বলি, ছাত্র শেষ দুই বছরে কাজ করিয়া সেই পয়সাটা উপার্জন করুক, তবু যেন পাঠকালে বৃত্তি না দেয়। নতুবা ছাত্রের মনে হইবে, সে যে কাজটা শিখিতেছে তাহা নিরর্থক, তাহাতে পয়সা নাই, এবং পরবর্তী জীবনে এই বিদ্যাকে কাজে লাগাইবে না। আমাদের ছেলেদের এমন সাহস ও বিশ্বাস থাকা উচিত যে তাহারা চার ঘণ্টা কাজ করিয়া নিজের নিজের পেট চালানোর উপযুক্ত অর্থ রোজগার করিতে পারিবে। নমুনার মত দুই খানিকটা সুতা কাটা, অথবা কাপড় বোনা যাহা শিখিয়াছে, তাহাতে কাজ চলিবে না। কেহ কেহ এমন কথাও বলিতে পারে যে, আমাদের হাতের কাজ বিশেষ করিয়া জানিবার কি প্রয়োজন? আমরা তো ইস্কুলে পড়াইব। মা তাঁহার শিশুকে কি করিয়া খাইতে হয় তাহা শিখান, যখন সে তাহা শিখিয়াছে তখন এমন কথা বলা যায় না যে, এখন তো খাওয়ার বিদ্যা শিখিয়াছে, খাওয়ার আর কি প্রয়োজন? কিন্তু খাওয়ার জ্ঞান হইয়াছে, ইহাতেই পুরাপুরি কাজ চলিবে না। মানুষের প্রতিদিন খাওয়ার জিনিস জোগাড় হওয়া চাই। মানুষের পক্ষে খাওয়া যেমন নিত্যকার প্রয়োজন, তেমনি নয়ী তালিমের শিক্ষার্থীর নিত্য চারি ঘণ্টা শরীরশ্রম করা প্রয়োজন। হাতের কাজে এতখানি পটু হওয়া

প্রয়োজন যাহাতে পাঁয়ের ছুতার চাষী তাহাদের কাছে কাজ শিখিতে আসে। ছাতিয়ার মেরামত করার বিদ্যাও তাহার থাকা চাই। চাষবাসের আচার্য তাহাকে হইতে হইবে। গ্রামে আজ গ্রামের শিল্প তাড়িয়া গিয়াছে, তাই নয়ী তালিমের মাধ্যমে গ্রামশিল্পকে আবার খাড়া করিতে হইবে।

নয়ী তালিমে পুস্তকের বাহুল্য নাই বলিয়া জ্ঞানের দিকটা কিন্তু উপেক্ষা করা হয় না। সর্বদাই শুনি, লোকে বলে যে, কাজের মধ্য দিয়া যে সহজ জ্ঞান লাভ হয় নয়ী তালিমে উহাই সব। কিন্তু এ ধারণা ভুল। নয়ী তালিমে জীবনের বুনিয়াদ পাকা হয় এমন সকল বিষয়ের জ্ঞান পাকা হওয়া চাই। লম্বা চওড়া ইতিহাস আর অকর্মা রাজা-রাজড়ার নামাবলী মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই। তাহাতে শিক্ষার্থীর মাথার অযথা বোঝা চাপান হয়। তবে কিনা, জীবনের সুন্দর বিকাশের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই শিখিতে হইবে। ধর্মবিচার, তত্ত্বজ্ঞান, নীতিজ্ঞান এই সব অবশ্য জানিতে হইবে। সমাজবিজ্ঞান, মানবসভ্যতার ইতিহাস প্রভৃতিও জানা আবশ্যক। আমাদের সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের প্রভেদ, আমাদের বিশেষত্ব কি, বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলি শিক্ষা করা চাই। আরোগ্যশাস্ত্র, আহারশাস্ত্র, পরিচ্ছন্নতা, রন্ধনবিজ্ঞান প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। তবেই দেখা যায়, নয়ী তালিমে জ্ঞানের কমতি হইবার কথা নয়। উত্তম ভাষাজ্ঞানও থাকা চাই, কারণ উহাই আপন আপন মনোভাব প্রকাশিত করার বাহন। সাহিত্যের জ্ঞান চাই। হাতের লেখা সুন্দর হওয়া চাই। নয়ী তালিমে জ্ঞানলাভ হইবে, তবে শিক্ষাপ্রয়োজনের বিদ্যার আবশ্যক নাই। আজকাল তো বিশ্ববিদ্যালয়ে কত কিছু অনর্থক বিষয় পাঠ্য আছে, আর তাহাতে শতকরা ৩৩ নম্বর পাইলে তবে পাশ করা যায়; অর্থাৎ বাকি ৬৭ নম্বরের বিদ্যা ভুলিলেও চলে। বাস্তব জ্ঞানের ব্যবহারে কিন্তু একশ'র মধ্যে একশই মনে রাখিতে হইবে। যে পাচক শতকরা ৮০ খানা ভাল রুটি তৈয়ারি করে, তাহাকে কি আমরা চাকরি দিই? সেইরূপ, জ্ঞানেও অপরিপক্কতা থাকিলে চলে না। জ্ঞান হয় আছে, নয় নাই। থাকিলে ষোল আনাই আছে, না থাকিলে কিছুই নাই। এমন কি হইতে পারে যে, কোন লোক শতকরা ৮০ ভাগ জীবিত, বাকি ২০ ভাগ মৃত? বাঁচিয়া থাকিলে পুরাপুরি বাঁচিয়া আছে, মরিয়া গেলে পুরাই মরিয়ে। শতকরার হিসাব এখানে চলিবে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে একথা চলে না। জ্ঞান তো হওয়া চাই পূর্ণ জ্ঞান। সংশয়যুক্ত জ্ঞান চাই না। কিন্তু আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লোকেরা শতকরা ৬৭ ভাগ ভুলিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, কারণ তাঁহারাও জানেন যে, এমন জ্ঞান শিখান হয় যাহা কোন কাজে লাগে না। যতখানিই শিখান যাক, সবই মনে রাখিবার মত হওয়া চাই, আর বিদ্যার্থী সবটাই মনে রাখিবে, কারণ এই জ্ঞান জীবনে কাজে লাগিবে। বাস্তবে যে বিদ্যা লাভ হয়, মানুষ তাহা ভোলে না, যাহা ভোলে, তাহা বিদ্যা নয়। সেইরূপ, নয়ী তালিমে আমরা এমন বিদ্যা শিখাইব যাহা ভুলিতে পারা যাইবে না। নয়ী তালিম পাইলে তো মহাজ্ঞানীরূপে বাহির হইয়া আসা চাই।

এখন জ্ঞান ও কর্ম মিলাইবার কথায় আসুন। এই উদ্দেশ্যে correlation কথাটির প্রয়োগ করা হয়। আমরা তো ব্যবহার করি সম্বন্ধ শব্দটা। যখন ঐ ইংরাজি শব্দটি শুনিলাম, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, এ বস্তুটি কি? বুনিয়াদী শিক্ষা তো আমরাই তৈয়ারি করিয়াছি, কোনও ইংরেজ করে নাই। সুতরাং ঐ শব্দের অনুবাদ করিতেই হইবে, এমন কোন দায়িত্ব আমাদের উপর নাই। ইঁহারা বলেন, পশ্চিমে একটা পদ্ধতি চলে, যাহাতে এই শব্দটি আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের অন্যের

পদ্ধতিই চাই না, আমরা নিজেদের শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করিতেছি—ঐ ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের তো সমবায় করিতে হইবে। যেমন মাটি ও কলসি, দুইটি বস্তু এমন মিলিয়া মিশিয়া আছে যে, যে মাটির কলসি সেই মাটি ও এই কলসি, এই দুইয়ে যে কি সম্বন্ধ তাহা বলা কঠিন। মাটি ও কলসি, দুইটি জিনিস, না একই? যদি আপনি বলেন, দুইটি ভিন্ন জিনিস, তবে আমি বলিব, আপনার কলসি লইয়া যান, আমার মাটি রাখিয়া যান। এই দুইটি পৃথক করা যায় না। আপনি যদি বলেন, দুই-ই এক, তবে আমি বলিব, বেশ, এই তো মাটি আছে, ইহাতে জল ভরিয়া রাখুন। তাহাও হয় না। অর্থাৎ এই দুই অদ্বৈত, অর্থাৎ এক জিনিসও নয়, আবার এমনভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে ইহাদের পৃথকও করা যায় না। এই ভাবে, যেখানে দ্বৈত অদ্বৈত নির্ণয় করা যায় না সেইরূপ সম্বন্ধকে বলে সমবায়। যে শিক্ষাপদ্ধতিতে জ্ঞান আর তাহার প্রয়োগের এমন সমবায় হয় যে, এখন জ্ঞান লাভ হইতেছে বা এখন প্রয়োগ শিক্ষা হইতেছে, এরূপ প্রভেদ করা চলে না, সেই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গিয়া যজ্ঞ রক্ষা করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানলাভও হইল। যজ্ঞ রক্ষার কর্মপদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সহজভাবে জ্ঞান শিক্ষাও হইল। জ্ঞান ও কর্মকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। জ্ঞান কাজ করিতে থাকিলে কর্মও সঙ্গে চলে, এবং কর্ম করিতে থাকিলেও জ্ঞানের কাজ সঙ্গে সঙ্গে চলে। জ্ঞান ও কর্ম এমনই ওতপ্রোতভাবে একে অন্যের সঙ্গে মিশিয়া চলিবে যে, কোন মতে তাহাদের বিচ্ছেদ করা না যায়। বাহির হইতে বিদ্যা শিক্ষার কথাই থাকিবে না। উদ্যোগের মধ্য দিয়াই জ্ঞানের বিকাশ হইবে, আবার জ্ঞানলাভের সঙ্গেই প্রয়োগের কাজও চলিবে। ইহাই আমাদের পদ্ধতি। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মকে ছোড়াতাড়া দিয়া আমাদের পদ্ধতি চলিবে না। উভয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যাইবে।

নয়ী তালিমের সম্বন্ধে যে মূল ধারণা আছে, সে সম্বন্ধে এতক্ষণ বলিয়াছি। এখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিব। নয়ী তালিম বর্তমানের সমাজব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে পারে না, আজিকার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তাহার পুরা বিরোধ। কেহ যদি বলেন, নয়ী তালিম তো শিক্ষায় এক নূতন পদ্ধতি, কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রণালী, তবে তিনি ভুল বলিবেন। কারণ, নয়ী তালিম আসিয়াছে নূতন সমাজ রচনা করিতে। উহা ব্যতীত নয়ী তালিম বাঁচিতে পারে না। আজিকার সমাজেই নয়ী তালিমকে বসানো, শিক্ষকদের বেতনের মধ্যে প্রভেদ রাখা, উপাধি অনুসারে বেতন দেওয়া এসব নয়ী তালিমে চলিবে না। নয়ী তালিমেও যদি শিক্ষকদের বেতনে প্রভেদ থাকে তবে রাজ্যের মধ্যে কি করিয়া পরিবর্তন আসিবে? বর্তমানে তো রাজ্যশাসনের যে যন্ত্র তাহাতে যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেওয়া হয়। পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়া আছে; নয়ী তালিম এই ব্যবস্থার অবসান করিবে। নয়ী তালিম যদি ইহার বিরোধিতা না করে, ইহাকে তাড়িয়া না দেয়, তবে তাহাকে আর নয়ী তালিম বলা চলিবে না। নয়ী তালিমে শরীরশ্রম আর মৌলিক ও আর্থিক যোগ্যতাকে সমান বিবেচনা করা হইবে, এবং যোগ্যতা বা জ্ঞান অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাগ থাকিবে না। সব কাজেরই সমান যোগ্যতা মানা হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, আজিকার আর্থিক সংগঠন সম্পূর্ণ বদল করিতে হইবে। আর সমাজের সেই পরিবর্তন সাধনের জন্যই নয়ী তালিম।

(চড়িয়ায় ১৭-৪-৪৫ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ হইতে)

———

টোলের শিক্ষা

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

টোল বা চতুষ্পাঠীর (চৌপাড়ীর) শিক্ষা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বালকগণই এই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই অধ্যাপনা করিতেন।

শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের অনেক টোলের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। মনে হয়, সমগ্র বঙ্গদেশে এই শিক্ষা একই ভাবে চলিতেছিল। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাদের শৈশবে ভদ্রলোক-বহুল প্রত্যেক গ্রামেই একাধিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেখিয়াছি। সকলের টোল ছিল না, কিন্তু দুই তিনখানি গ্রামের ভিতর অবশ্যই একটি টোল দেখা যাইত। কেহ বা স্বগৃহে থাকিয়াই অধ্যাপনা করিতেন এবং চার পাঁচজন ছাত্রকে আপন পরিবারেই পোষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। গ্রামস্থ অনেকেই বিদেশী এক একজন ছাত্রকে অন্ন দান করিতেন। কোন কোন অধ্যাপক সম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে থাকিয়া তাঁহারই অর্থানুকূল্যে টোল চালাইতেন। বাড়ীতে একটি টোল স্থাপন করা ধনিসমাজে আভিজাত্যের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত।

টোল চালাইবার নিমিত্ত ভূস্বামিগণ নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। হিন্দুসমাজের সর্ববিধ ক্রিয়াকাণ্ড ও বিবিধব্যবস্থায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কিছু কিছু প্রাপ্তি হইত। সকল টাকা বেশী না পাইলেও তৈজসপত্র এবং বস্ত্রাদি তাঁহারা কম পাইতেন না। ইহাতেই সাধারণতঃ অধ্যাপকগণের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। কেহ কেহ কিছু সরকারী বৃত্তিও পাইতেন।

আমি নিজে টোলের ছাত্র। টোলের সহিত আমার বহুপুরুষের রক্তের সম্বন্ধ। বিদ্যারম্ভের পর পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই কিছু কিছু টোলের শিক্ষা পাইতেছিলাম। যাহা দেখিয়াছি এবং যে পদ্ধতিতে পড়িয়াছি সেই বিষয়ে কিছু বলিব।

টোলের সাদাসিধা চালচলনে কিছুমাত্র বাহুল্য বা আড়ম্বর নাই। অশন বসন প্রভৃতি সব কিছুই সরল ও সহজ। শীতকালে গায়ে আলোয়ান বা মোটা চাদর জড়াইয়া এবং গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে বসিয়াই অধ্যাপক মহাশয় বিদ্যাদান করিতেন। ছাত্রদেরও এই রকমের পোষাক। সাধারণতঃ খাটের উপর মাদুর বা পাটী বিছাইয়াই অধ্যাপক মহাশয় বসিতেন। শীতকালে মাদুরের উপরে শতরঞ্চি, তার উপরে একখানি চাদর। ছাত্রেরা সাধারণতঃ অন্য মাদুরে বসিতেন। দুই চারিটি টোলে চেয়ার ও বেঞ্চ দেখিয়াছি।

সকাল বেলা সাধারণতঃ সাড়ে সাতটা বা আটটা পর্যন্ত অধ্যাপক মহাশয় উচ্চপাঠের ছাত্রগণকে পড়াইতেন, আর আপন আপন পাঠ গ্রহণের পর উচ্চপাঠের ছাত্রগণই টোলের ছোট ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেন। বিশেষ মেধাবী ছোট ছাত্রকে অধ্যাপক মহাশয়ও কিছু কিছু পড়াইতেন।

পুনরায় বিকালে সাধারণতঃ আড়াইটা বা তিনটার সময় টোল বসিত। অধ্যাপক মহাশয় টোল ঘরেই বসিয়া বা শুইয়া থাকিতেন। ছাত্রেরা পূর্বাহ্নে পঠিত বিষয়ে পরস্পর বিচার করিতেন। অধ্যাপক মহাশয় শুনিতেন, প্রয়োজন বোধে ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন। পাঠগ্রহণের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে ছাত্রগণ অধ্যাপক মহাশয়কে প্রণাম করিতেন।

ব্যাকরণ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ—এই তিন বিষয়ের চর্চাই বেশী হইত। টোলের সকল অধ্যাপকই ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। অলঙ্কার, স্মৃতি ও কিছু ন্যায় প্রায় সকলেই জানিতেন। পরন্তু প্রাচীনদের অনেকেই অলঙ্কারের অধ্যাপনা পছন্দ করিতেন না। অলঙ্কার-গ্রন্থে অশ্লিলতার উদাহরণের বাহুল্য দেখা যায়, ইহাই ছিল তাঁহাদের অপছন্দের কারণ। বিশেষতঃ সমগ্র ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ না হইলে বিদ্যার্থী কাব্যপাঠের অধিকারী বিবেচিত হইতেন না। প্রাচীন অধ্যাপকগণ বলিতেন—'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্'।—কাব্য পড়িলে কঠিন শাস্ত্রগ্রন্থে মনোনিবেশ করা যায় না।

শৈশবে ৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বর্ণশিক্ষার (দ্বিতীয় ভাগ) পড়িয়াছি—

কাব্যপাঠে লাভ হয় দিব্য পরিতোষ,
ব্যাকরণে অনভ্যাসে কাব্যে ঘটে দোষ।

প্রাচীন অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেরই এই প্রকার অভিমত ছিল।

কোন কোন টোলে ন্যায়-বেদান্তাদি দর্শনের অধ্যাপনা হইত। অধ্যাপকগণ অন্য দর্শন অপেক্ষা ন্যায়দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, ন্যায়শাস্ত্রে কৃতশ্রম ব্যক্তি শুষ্কমুখে শুধু সিদ্ধান্ত জানিয়া লইলে নিজেই অন্যান্য দর্শন-গ্রন্থের পদ্ধতি যোজনা করিতে পারেন।

ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সরকারী বৃত্তি লাভ সম্ভবপর হইবে—এই আশায় অনেক ছাত্রকে পরীক্ষা দেওয়াইবার নিমিত্ত অধ্যাপকগণ ব্যস্ত হইতেন না, বরং অন্যবিধ আচারেই বেশী লক্ষ্য করিয়াছি। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থকে প্রাচীনগণ অনুসরণ করিতেন না। কোন্ গ্রন্থের পর কোন্ গ্রন্থ পড়াইলে ছাত্রের উপকার হইবে, ইহা তাঁহারাই স্থির করিতেন। সহরের টোলের কোন কোন নবীন অধ্যাপকের পরীক্ষা-ব্যস্ততার প্রাচীনগণ তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিতেন।

বিদ্যাদানের বিনিময়ে অধ্যাপকগণ ছাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না। শুধু সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ছাত্রেরা সাধ্যমত চাঁদা দিতেন এবং বরণের বস্ত্রাদি ও পূজোপকরণে যথাসম্ভব ব্যয় করিতেন। পূজক অধ্যাপক মহাশয়ই পরে এইগুলি গ্রহণ করিতেন। অনেক দরিদ্র বিদ্যার্থী বিদ্যা ও অন্ন ব্যতীত বস্ত্র এবং আবশ্যক পুঁথিপত্রাদিও অধ্যাপক হইতেই লাভ পাইতেন।

ছাত্রের অশিষ্ট আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেও অধ্যাপকগণ কোনরূপ শারীরিক শাস্তি দিতেন না। কোন কোন প্রাচীন অধ্যাপক সেরূপ স্থলে ছাত্রকে গায়ত্রী জপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইতেন দেখিয়াছি। প্রতিপদ এবং অষ্টমী তিথিতে টোল বন্ধ থাকিত। বিশেষ বিশেষ পূজাপার্বণের দিন এবং পিতৃপক্ষ আর দেবীপক্ষকে সকল টোলেই অনধ্যায় বলিয়া মনে করা হইত। কোন কোন টোলে পনর ছুটি দিন আর কাঁঠাল খাইবার (শ্রাবণের) নিমিত্ত বন্ধ হইত। চতুর্থী, সপ্তমী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথির রাত্রিকালকে অনধ্যায় বিবেচনা করা হইত। চতুর্থীতে গণপতির প্রদোষ, সপ্তমীতে সূর্যের, দ্বাদশীতে বিষ্ণুর এবং ত্রয়োদশীতে সরস্বতীর। ত্রয়োদশীর সমস্ত রাত্রিতেই আমরা কোন শাস্ত্রচর্চা করিতাম না, অন্যান্য অনধ্যায় রাত্রিতে শুধু প্রদোষভাগকে অনধ্যায় বলিয়া মানিতাম।

অধ্যাপক মহাশয়গণ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। অধ্যাপনাকে তাঁহার পুণ্যকর্ম বলিয়াই মনে করিতেন। আমার একজন অধ্যাপক মহাশয়ের পরিবারে তাঁহার এক বালবিধবা দিদি বাস করিতেন। টোলগৃহের নিকটেই ছাত্রদের শয়নগৃহ। শীতকালের শেষ রাত্রিতে বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলেও ছোট ছাত্রগণ ভয়ে ঘুমে যাইত না। তাহারা শয়নগৃহের বারান্দার

নীচেই কাজ সারিয়া লইত। প্রত্যহ ভোরবেলা পিসীমা গোবর জলের ছিটা দিতে দিতে ছাত্রদিগকে ভর্ৎসনা করিতেন, আর দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতায় অন্ত খুঁত খুঁত করিতেন। অধ্যাপক মহাশয় একদিন ঠাকুরঘর হইতে দিদির কথাগুলি শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"দিদি, আশীর্বাদ কর, আমার বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে এই দুর্গন্ধ যেন স্থায়ী হয়।"

ছাত্রেরা অধ্যাপককে শুধু 'মহাশয়' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত ছাত্রদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হইত তাহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধের ন্যায়। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট ও দূরস্থ পরিবার পরিজন এবং আত্মীয়স্বজনেরাও এই সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত থাকিতেন। তদনুসারে পিসিমা মামা, দাদা, দিদি এবং ছোট ভাইবোন প্রভৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইত। অধ্যাপকের পরলোকগমনে ছাত্রগণ তিন দিন অশৌচ পালন করিতেন (এখনও করিয়া থাকেন)। পিতৃলোকের তর্পণের সময় অধ্যাপককেও স্মরণ করা হয়।

এখন অধ্যাপনার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাধারণভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে প্রসঙ্গতঃ আরও একটি বিষয় স্মরণ করিতেছি।

যে-সকল পরিবারে পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতেরই পঠন-পাঠন চলিতেছিল, সেই সকল পরিবারে বিদ্যারম্ভের পর হইতেই শিশুকে কিছু কিছু সংস্কৃত শিখান হইত। মনে আছে—বিদ্যারম্ভের দিনেই "সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে"—ইত্যাদি সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্র এবং মহর্ষি বাল্মীকির "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্"—ইত্যাদি আদিশ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিতে হইয়াছিল। প্রাচীনদের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল—পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাল্মীকির এই শ্লোকটি নির্ভুলভাবে শিখিতে এবং বলিতে না পারিলে শিশু মূর্খ হইবে।

অতঃপর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের বানান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা প্রমুখ প্রাচীন প্রাচীনাদের মুখ হইতে গণেশ, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র ও স্তোত্র শুনিয়া শুনিয়া শিখিতে হইত। ইহার পরেই চাণক্যশ্লোক আর চণ্ডী ও গীতার কয়েকটি ভাল ভাল শ্লোক শিখিবার নিয়ম ছিল।

অধ্যাপক-পরিবারের শিশু পরে যাহাই পড়ুক না কেন, বাল্যকালে এই প্রাথমিক শিক্ষা তাহাকে অবশ্যই দেওয়া হইত। কিছুটা বাঙ্গালা ও অঙ্ক না শিখিয়া কেহই টোলে পড়িতে আসিতেন না। তখনকার দিনের মধ্য-ইংরাজী এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যাই যেন টোলে বেশী দেখিয়াছি। কেহ কেহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়াও আসিতেন। একেবারে কিছুই না পড়িয়া টোলে ভর্তি হইতে কাহাকেও দেখি নাই।

টোলের প্রাথমিক পাঠ্য ব্যাকরণ। অধ্যাপক মহাশয় সূত্র বৃত্তি প্রভৃতি পড়াইয়া দিতেন। বিশেষ কঠিন ব্যাবৃত্তি, ফক্কিকা, ক্রোড়পত্র প্রভৃতি সূত্রের একসঙ্গে পড়াইতেন না। এক একটি প্রকরণ শেষ হইলে সেই প্রকরণের কঠিন জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পড়াইতেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের টোলে পাণিনি ব্যাকরণের পঠনপাঠন ছিল না। পূর্ববঙ্গে কলাপ ব্যাকরণ, আর অন্যান্য অংশে মুগ্ধবোধ, সুপদ্ম ও সারস্বতের প্রচারই বেশী লক্ষ্য করা যায়।

ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করিয়া পরদিন সেই পাঠ মুখস্থ বলিলে এবং পদসাধন-প্রণালী বুঝাইয়া দিলে অধ্যাপক মহাশয় নূতন পাঠ পড়াইতেন। পাঠ কণ্ঠস্থ না করিলে নূতন পাঠ গ্রহণ করা যাইত না।

সন্ধি এবং শব্দ প্রকরণের পাঠ শেষ হইলেই অমরকোষের কিয়দংশ মুখস্থ করিতে হইত। বেশী

মুখস্থ না করিলেও স্বর্গবর্গ ও পাতালবর্গ সকলকেই মুখস্থ করিতে হইত। কারক, সমাস ও তদ্ধিত প্রকরণের পাঠ শেষ হইলে আখ্যাত প্রকরণপাঠের সঙ্গে গণমালা বা ধাতুকোষ সকলেই কণ্ঠস্থ করিতেন। ব্যাকরণের বিদ্যার্থী পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে উপেক্ষা করিলে অধ্যাপকগণ বিরক্ত হইতেন। আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী—এই বাক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিলেও অধ্যাপকগণ অন্যশাস্ত্রে মুখস্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন না। ছাত্রগণ অন্য শাস্ত্রের গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মুখস্থ না করিলেও যথাসাধ্য মুখস্থ করিতেন।

গণমালা শিক্ষার পরে ব্যাকরণ পাঠের এবসঙ্গে হিতোপদেশের পাঠও চলিত। উহার আদিরসাত্মক অংশ একান্তই বর্জনীয় ছিল। আখ্যাত প্রকরণ পাঠের পর তদ্ধিতান্তের পাঠ চলিত। ধাতুরূপ শিক্ষা ও ক্রিয়াপদের বহুবিধ প্রয়োগ-কৌশলে এই গ্রন্থখানি প্রচুর সাহায্য করে। ইহাকে কাব্যগ্রন্থ মনে না করিয়া আমরা ব্যাকরণের ভিতরেই গণনা করিতাম।

সংস্কৃত হইতে সাধু বাঙ্গালা ভাষায় এবং বাঙ্গালা ভাষা হইতে সংস্কৃতে অনুবাদ করা আর সংস্কৃত ভাষায় রচনা লেখা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য হইত। অনেক টোলে পাক্ষিক সাহিত্যসভা বসিত। তাহাতে সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষার কথা বলা চলিত না।

গ্রামের অনেক টোলে আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বার চৌদ্দ বৎসরের ছোট ছাত্রেরাই তাহাতে বেশী যোগ দিতেন। বিষয়টির নাম ছিল—'শ্লোকঘণ্ট'। ইহা একপ্রকার খেলার মত। অধ্যাপক মহাশয়ও উপস্থিত থাকিতেন এবং সময় সময় খেলায় অংশ গ্রহণ করিতেন। হারজিতের হিসাব রাখা হইত। প্রথম ব্যক্তি একটি শ্লোক বলিতেন। এই শ্লোকের অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্ণ আদিতে আছে যাহার, এরূপ একটি শ্লোক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিতে হইত। বলিতে না পারিলেই একটি নম্বর কাটা যাইত। এইভাবে শ্লোকঘণ্টের প্রতিযোগিতা চলিত। বয়স্কেরা গীতা ও চণ্ডীর শ্লোকই বেশী প্রয়োগ করিতেন। খেলার ছলে ছোট ছাত্রদিগকে গীতা ও চণ্ডী মুখস্থ করানোই যেন এই খেলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে নিয়মিত-ভাবে প্রত্যহ কিছু গীতা ও চণ্ডীপাঠ টোলের ছাত্রদের অভ্যাস হইয়া যাইত।

সকল বিদ্যার্থীই যে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া শাস্ত্রান্তরে প্রবেশ করিতেন তাহা নহে, ব্যাকরণের কিছু বাকী থাকিতেও কেহ কেহ ন্যায়, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিতেন। শাস্ত্রান্তর পাঠের পূর্বে অনেকেই ন্যায় শাস্ত্রের প্রাথমিক গ্রন্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকাসহ ভাষা-পরিচ্ছেদখানি ভাল করিয়া পড়িতেন।

ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের বিদ্যার্থীকে প্রত্যহ অধীত গ্রন্থের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা না হইলেও মাঝে মাঝে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং নিম্নপাঠের ছাত্রকে পড়াইবার সময় উচ্চ পাঠের ছাত্রের ব্যুৎপত্তি অধ্যাপক মহাশয় লক্ষ্য করিতেন। একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়ের পরীক্ষা প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছিলাম—তিনি কোন উচ্চ পাঠের বিদ্যার্থীর মনোযোগ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে তাহাকে পড়াইবার সময় তাহার অধীত গ্রন্থের কোন কোন অংশের অপব্যাখ্যা করিতে থাকিতেন। বিদ্যার্থী সৌজন্যভাবে তাঁহার অপ-সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলে বিরক্তির সহিত পাঠ বন্ধ করিতেন। ইহাতেই বিদ্যার্থীর চরম লজ্জা হইত। আর বিদ্যার্থী অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি প্রদর্শন করিলে মনে মনে বিশেষ খুশি হইয়া প্রকাশ্যে বলিতেন—"তাই নাকি? দেখ তো, কি বলিতে কি বলিতেছিলাম।"

যে সময়কার কথা বলিতেছি, তাহার অনেক

পূর্ব হইতে 'বাঙ্গালা-সংস্কৃত-সমিতির' উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তীর্থ' উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থিসমাজে জাগ্রত হইয়াছে। এই সময়ে কোন ছাত্রই উপাধি পাশ না করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের অথবা বিষদ্‌গোষ্ঠীর প্রদত্ত 'বিদ্যারত্ন', 'তর্কবাগীশ' প্রভৃতি উপাধিতে সন্তুষ্ট হইতেন না। সাধারণ সমাজ এবং অধ্যাপনাদিতে নিযোক্তৃগণও তীর্থ উপাধি এবং তাহার ফলের দিকে লক্ষ্য করিতেন। এই সকল কারণে উপাধির সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেও একটা ঝোঁক সেই সময় হইতেই দেখা দিয়াছে।

বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে টোল শিক্ষা পদ্ধতির বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই। পাঠ মুখস্থ রাখিবার দিকে এখন বেশী ঝোঁক দেখা যায় না। প্রকৃত টোলের বিদ্যার্থী এখন খুব কম। ইংরাজী কলেজের সংস্কৃতপ্রিয় ছাত্রগণই মুমূর্ষু টোলগুলিকে রক্ষা করিতেছেন। পূর্ববঙ্গের কথা তো এখন বলিবারই নহে, পশ্চিমবঙ্গের টোলগুলির অবস্থাও শোচনীয়। ভবিষ্যতে চিরদারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে—এই আশঙ্কায় বুদ্ধিমান ছেলেকে এখন আর কেহই টোলে পাঠান না। নির্মোহ সত্যনিষ্ঠ শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকের সংখ্যাও এখন অঙ্গুলিতে গণনা করা যায়। টোলের অধ্যাপনাধারাকে এখনও যাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, সেই সকল পূজ্যপাদ অধ্যাপকমণ্ডলীর সকলেরই বয়স হইয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থের পঠ কিযোজনার সমর্থ টোলের অধ্যাপক দশ পনর বৎসর পরে পাওয়া যাইবে কি না—আশঙ্কার বিষয়।

গ্রাম থেকে জেলা ও প্রদেশ

(৬)

বকুলবালা সেন

গ্রাম ও জেলার মধ্যে নানা স্তরবিভাগ আছে, যেমন ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা। জেলার সমবায়ে প্রদেশ। এই স্তরবিভাগ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে জেলার মাধ্যমে তা করা যেতে পারে।

প্রথমে ক্রীড়াঙ্গনের তিন দিকে তিনটি ছেলে-মেয়ে ত্রিকোণ রচনা করে দাঁড়াবে। তারা বিভিন্ন গ্রাম; ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যছন্দে একত্রীভূত হয়ে তারা ইউনিয়ন গঠন করবে। তারপর দু পাশ থেকে তিনটি করে বালক বালিকা একত্রে প্রবেশ করে প্রথম ইউনিয়নের দু পাশে আর দুটি ইউনিয়নের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তিনে মিলে হবে থানা। এবার থানার ছড়া আবৃত্তির শেষে সাবধানতার একজনকে থানার প্রতিনিধি স্বরূপ রেখে অন্যান্য সকলে পিছনে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াবে। তারা ছড়ার শেষাংশ আবৃত্তি করতে করতে দু পাশ থেকে আর দুটি ছেলে মেয়ে থানার প্রতিনিধি হয়ে এসে প্রথম প্রতিনিধির সঙ্গে মিলিত হবে। তিন থানার মিলনে গঠিত হলো মহকুমা। এদের আবৃত্তি শেষ হলে দু পাশ থেকে তিনটি করে ছেলে মেয়ে একত্রে এসে আর দুটি মহকুমার প্রতিনিধিত্ব করবে। এইরূপে তিন মহকুমার সমবায়ে জেলা গঠিত হলো। তিন দল মহকুমা ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে একটি বৃত্ত রচনা করে জেলা গঠন করবে।

জেলার ছড়া আবৃত্তির পর, পিছনে যে ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চারি ভাগে বিভক্ত হয়ে ক্রীড়াভূমিতে জেলার পাশে পৃথক পৃথক ষণ্ডলী সৃষ্টি করে দাঁড়াবে। অর্থাৎ তারা জেলার অন্তর্গত গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা। সম্মুখের দু পাশে গ্রাম ও ইউনিয়ন নীচু হয়ে এবং পিছনের দু পাশে থানা ও মহকুমা উঁচু হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসবে।

জেলার ভিতর বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগা-যোগ স্থাপন বা রক্ষা করে স্থলপথে সকল গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া, পাল্কী, লরি, বাস, রেলগাড়ি প্রভৃতি। জল পথে নৌকা, স্টীমার। আকাশ পথে বিমানপোত কচিৎ কোথাও দূরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

এবার এই সকল যানবাহন তাদের কার্য-কারিতার পরিচয় দিতে একের পর একে প্রবেশ করবে ও ছড়া আবৃত্তির পর জেলার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। সর্বশেষে আসবে বাংলার রাজধানী ও প্রধান নদী—কলকাতা ও গঙ্গা।

আঙ্গিক অভিব্যক্তি সহ ছড়া গান ও আবৃত্তি

তিনটি গ্রাম একত্রে :

বাংলা দেশের গ্রাম আমরা, বাংলা দেশের গ্রাম,
বাংলা মায়ের স্নেহে ভরা স্বর্গ হেন ধাম।
(নিম্নলিখিত ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য স্থলে
মিলিত হবে)

প্রথম গ্রাম :

আমার আকাশ সুনীল বরণ
বাতাস মধুময়,
শিল্পীজনের মনের খোরাক আমার কাছেই রয়।

দ্বিতীয় গ্রাম :

বাংলা দেশের বড়ঋতু বার মাসে পড়া,
ফলায় নানা সোনার ফসল আমারি কোল ভরা।

তৃতীয় গ্রাম :

রাখাল ছেলের সহজ সুরে ভাটিয়ালি গান,
বার মাসের তের পরব আমারি সে দান।

তিনটি গ্রাম একত্রে :

ইউনিয়ন পড়ি এস পাঁয়ে পাঁয়ে মিশে,
দেখবো মোরা পল্লীবাসীর উন্নতি হয় কিসে।

(দু পাশ থেকে তিনটি করে ছেলে মেয়ে অর্থাৎ আর দুটি ইউনিয়ন প্রবেশ করবে)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউনিয়ন :

আমরা শান্তি রক্ষা করবো,
রাস্তা ঘাটও গড়বো,
পল্লীমায়ের ছেলে মেয়ে তারাই দেশের রত্ন,
স্বাস্থ্য তাদের রাখতে ভালো করবো বিশেষ যত্ন।

তিনটি ইউনিয়ন একত্রে এবার থানার প্রতিনিধি :

আমরা থানা,
ইউনিয়ন মিলে গিয়ে বাঁধবো এবার দানা।
থানায় থাকেন থানা অফিসার,
তাঁহার যত গুণগাথা বলবো কত আর।
খাকি পোষাক, স-বুট পায়ে করেন পরিভ্রমণ,
শান্তিপ্রিয় লোকের সহায়, অসৎজনের শমন।

(দ্বিতীয় বার ছড়া আবৃত্তির সময় একজন বাদে অপর সকলে পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। দু পাশ থেকে দুটি ছেলে মেয়ে প্রবেশ করবে, তারা থানার প্রতিনিধি। তিনে মিলে মহকুমা রচনা করবে)

তিনজন একত্রে :

ছিলেন বহু, হলেন এক, মহকুমা নাম,
কিছু আছি শহর ঘেঁসা, কিছু কিছু গ্রাম।
আছে বিপুল সুনীল আকাশ, মুক্ত সমীরণ,
মন্ত্রীরাজের পরশেরও পাবে নিদর্শন।

(দু পাশ থেকে তিনটি করে ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে প্রবেশ করবে। তারা দুটি পৃথক গোষ্ঠি রচনা করে দাঁড়াবে—তারাও মহকুমা।)

দ্বিতীয় মহকুমা :

মহকুমা হাকিম থাকেন যেথায় সাব ডিভিশন,
এস. ডি. ও নামে সবে চেনে,
শাসনে আর বিচারেতে আপৎ করেন নাশ ;
রাজশক্তির প্রতিনিধি সবাই তাঁরে জানে।

তৃতীয় মহকুমা :

ফৌজদারী আদালতে বিচারক ডেপুটি,
দেওয়ানী বিচারেতে মুন্সেফ বাবু,
সাধ্য কি দস্যুরা করে কারু কিছুটি,
পুলিশের ভয়ে তারা একেবারে কাবু।

(এবার তিন দল মহকুমা একসঙ্গে ছড়া আবৃত্তির সঙ্গে একটি বৃত্ত রচনা করে জেলায় পরিণত হবে।)

জেলা :

মহকুমা মিলে এবার হয়েছি যে জেলা,
জেলা মিলে খেলবো পরে প্রদেশ গড়া খেলা।

জেলার একাংশ :

আগে ছিলাম শুধুই গ্রাম, ইউনিয়ন তার পরে,
শক্তি পেলাম পরের স্তরে থানা গঠন করে।

জেলার অপরাংশ :

মহকুমার সম্মিলিত শতেক থানার বল ;
জেলার অধিকারে এল মহকুমার দল।

সকলে :

প্রতি জেলার কেন্দ্রভূমি শহর তারে বলে ;
শাসন পালন যা কিছু কাজ সেথা হতেই চলে।
কালেক্টর আর পুলিশ সাহেব, সর্ব অধিকরণ,
রাজশক্তির প্রতিনিধি, জনগণের শরণ।

(পিছনের সারির ছেলে মেয়েরা এবার চার ভাগে বিভক্ত হয়ে একের পর অপর দল ছুটে এসে জেলার চার পাশে জেলার সঙ্গে সংযোগ রচনা করে বসবে। এরা গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা।)

গ্রাম :

বাংলা দেশের গ্রাম, মোরা বাংলা দেশের গ্রাম,
বাংলা মায়ের স্নেহে গড়া স্বর্গ হেন ধাম।

ইউনিয়ন :

আমরা ইউনিয়ন,
পাঁয়ে পাঁয়ে মিলে হলেম এক দেহ এক মন।

থানা :

আমরা থানা,
ইউনিয়ন মিলে গিয়ে বেঁধেছি যে দানা।

মহকুমা :

মহকুমা বলেন ঘরে শতেক থানা জড়ো,
মূল্য মানে আয়তনে অনেকখানি বড়ো।

গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহাকুমা :

জেলা, তুমি অনেক বড় ভাই,
নাই, তাহাতে সন্দেহ তো নাই।
আমাদেরই সমবায়ে তোমার অবস্থান,
গড়েছি হে তোমায়, করি সকল কিছু দান।

জেলা :

তোমরা ও আমি নহি কোন রূপে ভিন্ন,
এক দেহ এক মন চির অবিচ্ছিন্ন।

(জেলার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করে যে দান যাবেন, এবার তাদের আগমন হইবে।)

গ্রাম :

জলের পথে যোগ রেখেছে নৌকা নানা জাতি,

(নৌকার প্রবেশ)

নৌকা :

পাঁয়ের সাথে পাঁয়ের যোগে অবাধ আমার গতি।
ছিপ, পানসি, বজরা, ডিঙি, নাম দিয়েছ কত,
তরতরিয়ে খালে বিলে চলছি শত শত।

ইউনিয়ন :

ডাঙার পথে পাল্কী আছে, আছে গরুর গাড়ি,
দূরের পথে মাঝে মাঝে আছে বাস ও লরি।
ঘোড়া আছে মাল বহিতে, আছে ঘোড়ার গাড়ি,
এদের দিয়েই দূরের সাথে যোগ স্থাপনা করি।

(পাল্কী, গরুর গাড়ি, বাস, লরি, ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ির পর পর প্রবেশ)

পাল্কী :

পাল্কী চলে দুলকি চালে—পাঁয়ের পথে।
চার বেহারার হুম্‌হুমিয়ে—পাঁয়ের পথে।
বর চলে আর ক'নে চলে—পাঁয়ের পথে।
জমিদার আর হাকিম চলে—পাঁয়ের পথে।
রে'গীও চলে হাসপাতালে—পাঁয়ের পথে।
তীর্থগামী বৃদ্ধ চলে—পাঁয়ের পথে।
দুলকি চালে পাল্কী চলে—পাঁয়ের পথে।
হুম্‌হুমিয়ে পাল্কী চলে—পাঁয়ের পথে।

গরুর গাড়ি :

পাড়াপাঁয়ের ভাঙা চোরা ধুলোয় ভরা পথ,
ধীরে ধীরে চলি সেথা আদ্যি কালের রথ।

লরি :

তুমি অতি বীর ভাই মম আগমন,
গঞ্জেতে নিয়ে যাই কৃষকের ধন।
বণিকের মাল বহি করি চলাচল,
পাঁয়ে ও শহরে যোগ রাখি অবিরল।

ঘোড়াগাড়ি :

ঘোড়ায় টানা গাড়ি আমি, অনেক আমার মান,
ধনী গরীব সবার তরেই আমার অবস্থান।

ঘোড়া :

মালবহা ঘোড়া আমি গোবেচারা জানোয়ার,
ইট কাঠ ধান চাল বহে চলি অনিবার।

বাস :

দু-চারিটি পাঁয়ে মোর দেখা পাবে,
সন্ধ্যায় এল কেবা ঘুরে যাবে।
দূর পথে তাড়াতাড়ি যারা যেতে চায়,
সবার পৌঁছুবে নিজ নিজ ঠিকানায়।

থানা :

নদীর পথে জাহাজ চলে যাত্রী লয়ে নানা,
পণ্য কিবা মালপত্রে নাইকো তাহার মানা।

(ষ্টীমারের প্রবেশ)

ষ্টীমার :

নদী পথে দ্রুত চলি হংসের তুল্য,
নদী মাতৃক দেশে জানে সবে মূল্য।

ঘুরে পল্লীরে করি শহরের প্রান্ত,
যাত্রী ও মাল লয়ে ছুটি অবিশ্রান্ত।

মহকুমা :

স্থানে স্থানে রেলগাড়ি যে না আছে তা নয়,

(রেলগাড়ির প্রবেশ)

রেলগাড়ি :

গণ্ডগাঁয়ে রেলের ষ্টেশন নেহাৎ গোটা কয়।
দু' দু' পয়সা, দু' দু' আনা।
যাত্রী লয়ে আনাগোনা,
দু এক ষ্টেশন তফাৎ যদি যাও।
ঘুরের পথে টাকাসিকে যেমন লাগে যাও।

গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা :

ক্বচিৎ কোন বেলায় আবার আছে বিমান খাটি
রাজধানী কি আরও দূরে পৌঁছে দেবে খাঁটি।

(বিমান পোতের প্রবেশ)

বিমানপোত :

উড়ো জাহাজ আমি,
তোমাদেরই বরাত জোরে হেথায় এসে নামি।
রাজধানী কলকাতা, দমদম কাছে তার,
সেথা হতে উড়ে যাই নানা দেশে চারিধার।
দিল্লী কি মাদ্রাজ, বোম্বে ও কুর্গে,
ছুটে যাই মহাচীনে গিরিরাজ দুর্গে।
ইউরোপ আমেরিকা নহে আর দূরে তাই,
তোমাদের ভালবাসি হেথা এসে নামি তাই।

(বেলার প্রতিনিধি স্বরূপ একজন মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যান্য সকলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ক্রীড়াঙ্গনটিকে বেষ্টন করে পিছনে সরে দাঁড়াবে। তখন দুপাশ থেকে আর দুজন ছেলে মেয়ে প্রবেশ করবে। তারাও বেলার প্রতিনিধি)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেলা :

আমরা বেলা, দেশের সেরা বাংলা মায়ের অংশ,
মিলে গিয়ে পৃথক সীমা করবো এবার ধ্বংস।
বেলার সাথে বেলা মিশে গড়বো প্রদেশ বঙ্গ,
পূর্ব ভারত আলো করা স্নিগ্ধ শ্যামল অঙ্গ।

সবাই একসঙ্গে :

এই তো বঙ্গদেশ,
রূপের এবং গুণের যাহার নাই কো সীমা শেষ।
উত্তরে যার ফুলার ঢাকা বিশাল হিমালয়,
সুনীল বঙ্গ উপসাগর দক্ষিণেতে রয় ;
পশ্চিমেতে বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ,
পূর্ব দিকের সীমায় আসাম কমলা লেবুর দেশ।

(দুটি ছেলে মেয়ে—গঙ্গানদী ও কলিকাতা এক সঙ্গে প্রবেশ করবে)

গঙ্গানদী :

গঙ্গা আমি বাংলা মায়ের স্নেহের ধারা,

কলিকাতা :

কলিকাতায় যশে আলো বিশ্বভরা।

গঙ্গা :

হিমালয়ের কন্যা আমি বাংলা মায়ের অলঙ্কার,

কলিকাতা :

আমি দেশের রাজধানী আর বঙ্গবাসীর অহঙ্কার।

গঙ্গা :

সোনার শস্যে ভরি আমি বাংলা মায়ের শ্যামাঙ্গন,

কলিকাতা :

বাণিজ্যে ও কর্মে ক'রে আমি চির অচঞ্চল।

উভয়ে :

বাংলা মায়ের ভাণ্ডারেতে
দোষের জোড়া নাই,
গণচিত্তে সমন্বয়ে
তাই পেয়েছি ঠাঁই।

গঙ্গা ও কলিকাতা বাদে অপর সকলের একাংশ :

রাজধানী কলিকাতা শহর প্রকাণ্ড,
বাংলার শক্তিমত্তা, প্রাণময় তাণ্ড।
গঙ্গার তীরে তুমি বাণিজ্য কেন্দ্র,
ধনবৃদ্ধির তরে সদাই অতন্দ্র।
রাষ্ট্রের তুমি প্রাণ, শিক্ষার মন্দির,
কৃষ্টির ধাম, নাশ সঙ্কোচ গভীর।

বিদ্যের তীর্থের তুমি চির পূজারী,
আগে-চলা পথ পাশে সহৃদয় দিশারী।
বিজ্ঞানে ছুটে চলে চকল বিশ্ব,
সমতালে যেতে সাধ, তুমি হে নমস্য।

অপরাহ্নে :

প্রণাম তোমায় পূত বাহিনী,
পুরাণে শুনেছি তব কাহিনী।
পলি ভরা তট তব ঘেরিয়া
নগর বন্দর উঠে গড়িয়া।
সাধুজন তব নীর পরশে
পুলকিত তনু মন হরষে।
কবি মনে অমর্ত-নাদিনী,
সুরধুনি, তুমি প্রিয়বাদিনী।
ভগীরথের প্রাণ তুমি ধন্যা,
প্রণাম হে হিমগিরি কন্যা।

ছাত্রজীবনের স্মৃতি

শ্রীমৈত্রেয়ী দাশগুপ্তা

"মৈত্রেয়ীদি, আমাদের খাতাগুলো কবে পাবো?……" ফিরে দেখি—তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর কয়েকটি মেয়ে। তাদের আগ্রহউজ্জ্বল মুখের দিকে চাইতেই মুহূর্তে যেন ফিরে গেলাম আমার ছাত্রীজীবনে। আমিও তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছি, বাংলায় অনার্স নিয়ে; অধ্যাপকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি,—"Sir, আমার "মেনোপাওনা"র খাতাটা…" —অধৈর্য আগ্রহ মনে,—কত নম্বর পেয়েছি, কী মন্তব্য লিখেছেন তিনি আমার প্রশ্নোত্তরিকায়। মৃদু হেসে বললেন তিনি—"মেনো-পাওনার মেনা জমে আছে আমার অনেক, না? আচ্ছা, আজ পাওনা মিটিয়ে দেব সব—ছুটির আগে নিয়ে যেও খাতা।" শেষের দিকে ক্লাস ছিলো না সেদিন তাঁর, তবু কলেজে বসে বসে আমার সব কটি প্রশ্নোত্তর সংশোধন করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন খাতা ছুটির আগেই। সেদিন তার মূল্য বুঝিনি; মনে হয়েছিলো আমরা তো কষ্ট করে লিখে দিই—ওঁরা শুধু দেখে দেন, সে আর এমন কি কষ্ট? কিন্তু খাতা দেখে দেওয়া যে লিখে দেওয়ার থেকে কোন অংশে কম কষ্টসাধ্য নয় আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

……খাতাগুলো নিয়ে বসলাম, কিন্তু কাজ হলো না কোন। মন উধাও হয়ে গেল সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে—আমার কলেজজীবনে। কতদিনের কত স্মৃতি, টুকরো টুকরো কথা, ছোট-খাটো কত ঘটনা……

ইংরেজির ক্লাস—একটি ছাত্র 'Clovess' কথাটির মানে জিজ্ঞেস করতে অধ্যাপক বললেন "লবঙ্গ"—আমরা সবাই অবাক—লবঙ্গ! বাংলায় বলেছেন লবঙ্গ? সত্যিই অবাক হবার কারণ ছিল আমাদের; কাট্ ইয়ার থেকেই কতভাবে চেষ্টা করেছি আমরা, কিন্তু ইংরেজির ক্লাসে একটিও বাংলা কথা বলাতে পারিনি তাঁকে দিয়ে। ইংরেজির ঘণ্টায় সব কথাবার্তা ইংরেজিতেই হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। ভারী রাগ হতো এক-এক সময়,—ভাবতাম কি ক্ষতি হয় ইংরেজির ক্লাসে বাংলা বললে? ক্ষতি না হলেও উপকার যে হয়না কিছু পরে বুঝেছি সে কথা। প্রতিদিন ঐ

সময়টুকু বাধ্য হয়েই ইংরেজিতে কথা বলে প্রায় সকলেরই ঐ ভাষায় কথা বলা অনেকটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত।

সেদিনের কলেজ জীবনের এই অভ্যাস আর মুখস্ত্যাসের মধ্যে কতটুকু পরবর্তী জীবনে গ্রহণ করেছি—কিংবা বর্জন করেছি তার হিসাব স্মৃতি-রোমন্থনের আসরে অপাংক্তেয়, কিন্তু যেদিনের ছবি আঁকতে বসেছি সেদিন ভেবেও দেখিনি কত সাধারণ ঘটনাই না অপরূপরূপে দেখা দিয়েছে আমাদের কাছে।

অধ্যাপক মাত্রেরই কোন না কোন মুদ্রাদোষ থাকে। কেউ বা বিশেষ একটি কথা বারে বারে বলতে থাকেন পড়ানোর সময়, কেউ বইখানি একটি বিশেষ 'কায়দায়' ধরেন, কেউ বা হাত নাড়েন বিচিত্র ভঙ্গীতে। আমাদের গণিত অধ্যাপক যখনই বাংলা বলতেন "কাজে কাজেই" শব্দটি ব্যবহার করতেন প্রায় প্রতি কথায়। মনে পড়ে একদিন Calculus বুঝিয়ে চলেছেন তিনি, আমরা শুনতে ব্যস্ত সেই বিশেষ শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হলো—তিনি যে লক্ষ্য করছেন সেদিকে আর খেয়াল নেই; এক সময় হেসে ফেললেন তিনি—"ঐ calculation এ ব্যস্ত থাকলে Integral Calculus যে এগোয় না আর…।" এমন অপ্রস্তুত হয়েছিলাম, মনে আছে আজও। কিন্তু সেই যে আমাদের নির্মল কৌতুকে স্নেহভরে যোগ দিলেন তিনি, তাঁর মর্যাদা কি কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তাতে? নিশ্চয়ই নয়। যখন কঠোরতার প্রয়োজন, কঠোর হয়েছেন তিনি, আবার সহজ হাসিতে যোগ দিয়েছেন আমাদের ছেলেমানুষী আনন্দে।

এমন একটি সহজ সম্পর্ক ছিল আমাদের প্রত্যেকটি অধ্যাপকের সংগে, মনে হয় মফঃস্বল কলেজ বলেই হয়তো তা গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

প্রথম যেবার কলেজ-ম্যাগাজিনে আমি লিখি, বাংলার একজন অধ্যাপক কতভাবে যে উৎসাহ দিয়েছিলেন কোনদিন তা ভুলবার নয়। যতদূর মনে পড়ে বংকিমসাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম;—আমার সে লেখায় কলেজপত্রিকা যে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু লেখার উৎসাহ দেওয়া, আমাকে অনুপ্রেরিত করাই যে ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বাংলার ছাত্রী ছিলাম আমি। সেই সময়েই ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক। আজও যখন সেক্সপীয়ার পড়ি মনে পড়ে তাঁর 'Othello' পড়ানো—কতভাবে কত দিক থেকে আলোচনা করেছিলেন বইখানি, সাহায্য করেছিলেন প্রত্যেককে নিজস্ব একটি মত গড়ে তুলতে।

আজকাল ছাত্রছাত্রীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় একটি অভিযোগ কোর্স শেষ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়নির্দেশিত পাঠ্যতালিকার সমস্ত বই পড়ান হয় না কোন কলেজে। সৌভাগ্য আমাদের—এ অভিযোগ জাগেনি কখনও আমাদের মনে। যাঁদের কাছে পড়েছি কোর্স শেষ করে দিতে তাঁদের আগ্রহ আমাদের থেকে কম ছিল না কোনদিন। মনে আছে, বি. এ পরীক্ষা সামনে, বীরবলের হালখাতা তখনও পড়ান হয়নি সম্পূর্ণ।—রবিবারেও ক্লাস নিতে লাগলেন অধ্যাপক। শেষ পর্যন্ত আমরাই ক্লান্ত হয়ে আমাদের প্রতিদিনই ক্লাস করছি, সে রবিবারে ছুটি চাই। রাজী হলেন তিনি। কিন্তু রবিবার সন্ধ্যেবেলা দেখি বাড়ীতে এসেছেন। সেদিন ক্লাসে যা পড়াবেন ভেবেছিলেন সহজ নয় সে প্রবন্ধ, যদি আর সময় না হয় বুঝিয়ে দেবার—চিন্তিত হয়ে তাই তিনি বাড়ীতেই এসেছেন বই হাতে। কেবল আমার কাছেই নয় অনার্সের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর বাড়ী গিয়ে পড়িয়েছিলেন সেদিন তিনি।

মনে পড়ে আমাদের দ্বয়ী অধ্যক্ষকে। বি. এ পরীক্ষার সময় একদিন প্রবল বন্যা সহরে,—কলেজ ডুবে গেল জলে। কলকাতার কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রাঙ্ক কল করে অনুমতি নিলেন তিনি অন্য জায়গায় পরীক্ষা নেওয়ার। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রী প্রত্যেককে জানিয়ে দিলেন কোথায় যেতে হবে। অনেকের বাড়ীই তখন ডুবতে আরম্ভ করেছে, বৃদ্ধজন ঠেলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাদের পরীক্ষা দেওয়াতে। নিরাপদে থেকে সবকটি পরীক্ষা যাতে তারা দিতে পারে সে ব্যবস্থাও করলেন তিনিই।

এই যে দরদ, এই ঐকান্তিকতা,—ছাত্রী হিসাবে সেদিন যা শুধু অনুভব করেছিলাম, অধ্যাপিকার কাছে তা দেখা দিল বিশেষ এক আবেদন নিয়ে।

ফেলে-আসা কলেজজীবনের নানান্ ঘটনার ঠাসবুনানির মধ্যে কোন নিখুঁত প্যাটার্ণ হয় তো ছিল না—কিন্তু সব মিলিয়ে যে বিচিত্র সংলাপ আজ জাগল স্মৃতির ঝুলি-কোঠায় তা কেবল ঘটনার মধুময় রোমন্থনই নয়—সম্পূর্ণ নূতন এক উপলব্ধি। ঘটনা সব কালেই ঘটে চলেছে, চলবেও। কিন্তু আজ আর কালের সীমানায় আমরা বাঁধা রইলে। জীবনের একটি পর্যায়ে যাঁদের কাছে পেয়েছি, জীবনের অন্য পর্যায়ে দাঁড়িয়ে তাঁদেরই আজ প্রত্যক্ষ করছি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোন থেকে। তাই লিখতে বসেছি তাঁদের ঘিরে স্মৃতি কথার রম্য-কাহিনী।

শিশুর সমস্যা

শ্রীমতী হারিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যালয়ে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী দেখা যায় যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম নহে। এমনকি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধির কোন কিছু বৈলক্ষণ্যও পাওয়া যায় না; অথচ তাহাদের লইয়া পিতামাতা, শিক্ষকশিক্ষিকাগণ বিব্রত হইয়া পড়েন। তাহাদের প্রকৃত ভাবে চেনা যায় না এবং বলেও আনা যায় না। এই শ্রেণীর শিশুকে দুর্বোধ শিশু বলা যাইতে পারে। কেহ বা পড়িতে বসিলেই অন্য কথা চিন্তা করে, কেহ বা সব ভুলিয়া যায়। কেহ বা ভীরু, কেহ বা অল্পেই কাঁদিয়া ফেলে, কেহ হয়তো হঠাৎ একদিন চুরি করিয়া বসে, আবার কাহাকেও ত্রুটি দেখাইলে অত্যন্ত চটিয়া যায়। কেহ কেহ অত্যন্ত লাজুক, কাহাকেও যাহা বলা যায় ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া বসে। কেহ বা অত্যন্ত নির্দয়, আবার কাহারো স্বাধীনভাবে চলিবার ইচ্ছা একান্ত প্রবল। দেখা যায়, ইহাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, কিন্তু পড়াশুনা একেবারেই করিতে চাহে না—ইহার কারণ কি?

ইহার মূল কারণ শিশুর জ্ঞানরাজ্যে নয়, ভাবরাজ্যে কিন্তু মানসিক যাবতীয় ব্যাপার, চিন্তা যুক্তি ও বিচার প্রভৃতি চালিত হয় ভাববৃত্তি দ্বারা। শিশুর দয়া, মায়া, স্বার্থত্যাগ, স্নেহ ইত্যাদি সুকোমল ভাববৃত্তি যদি উপযুক্ত ভাবে বিকশিত হইতে না পারে, তবে শিশু দুর্বোধ হইয়া পড়ে। শিশুগণের দুর্বোধ্যতার কারণ খোঁজ করিলে দেখা যায় যে শিশুর কল্পনারাজ্যে ও বাস্তব জগতে প্রভেদ অতি অল্প, ইহা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া থাকে। এইজন্য না জানিয়া শিশু অনেক সময়

মিথ্যার সৃষ্টি করে। আর, সেজন্য তাহাকে শাস্তি দিলে তাহার মানসিক শক্তির ক্ষতি হয়। শিশুর দৈনিক কার্যকলাপে ও খেলাতে বাধা দিলে তাহার মানসিক উন্নতির ক্ষতি হয়। অনেক পিতামাতা খেলাতে অনর্থক সময় নষ্ট হয় মনে করিয়া শিশুকে সর্বদা পড়াশুনা করিতে বলেন, ইহাতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবনতি ঘটে। যে সকল শিশু পিতামাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে প্রতিপালিত হয় তাহারা ক্রমশঃ নিষ্ঠুর ও সহানুভূতিহীন হইয়া উঠিতে থাকে এবং অপরকে কষ্ট দিবার একটা ইচ্ছা তাহাদের জন্মে। শিশুরা অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু। পরিবারের মধ্যে কলহ দুর্ব্যবহার ইত্যাদি দেখিলে শিশুর বিশেষ মানসিক ক্ষতি হইতে পারে।

এইসকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এইসকল কারণ বর্তমান থাকিলে শিশুর স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাববৃত্তি সমূহ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে শিশু মানসিক বিকারগ্রস্ত ও দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। কিন্তু দুর্বোধ্য বা সমস্যাজনক শিশুও সমাজের অংশ। হতাশ হইয়া তাহাকে প্রত্যাহার করিলে চলিবেনা, তাহাকেও সমাজের উপকারী ও উপযোগী মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সুতরাং এইরূপ অত্যন্ত দুর্বোধ্য বা দুরূহ শিশুর অনিষ্ট ব্যবহার সংশোধন করিবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকশিক্ষিকাকে চেষ্টা করিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিশুটি স্বাধীনচেতা না অন্যের উপর নির্ভরশীল, কর্মঠ না অলস, অধ্যবসায় আছে কিংবা শীঘ্রই কাজ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, জিনিস পত্র নষ্ট করিয়া ফেলে না গুছাইয়া রাখে, প্রফুল্ল অথবা গম্ভীর প্রকৃতির, ক্ষমাশীল না প্রতিশোধ অভিলাষী, নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কিনা, প্রতারণা করার ইচ্ছা আছে কি না অথবা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে কি না। এই সকল বৃত্তি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া শিশু কেন দুর্বোধ হয় তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দুর্বোধ শিশুর প্রতি অসীম ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে, কারণ তিরস্কার বা শাস্তির দ্বারা দুর্বোধ শিশুর কখনো সংশোধন হয় না। যাহাকে ভালবাসে ও যাহার নিকট সহানুভূতি পায় সহজেই তাহার আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাহার বাধ্য হয়। সুতরাং শিক্ষকশিক্ষিকা শিশুকে ভালবাসিতে ও তাহার হৃদয় অধিকার করিতে চেষ্টা করিবেন। "তুমি অমুকের তুলনায় অত্যন্ত হীন" এইভাবে কখনো কোন কথা বলিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিবেন না, বরং তাহাকে সর্বদা উৎসাহ দিবেন ও প্রশংসা করিবেন। শিশুকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন সে মনে করিতে না পারে যে তাহাকে বাধ্য করিয়া শেখানো হইতেছে, কারণ দুর্বোধ শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে সে বাধ্যতা স্বীকার করে না, এজন্য অন্যান্য চিত্তাকর্ষক কার্যের ব্যবস্থা করিয়া পাঠে অনুরাগ জন্মাইয়া পাঠের অনিচ্ছাকে দমন করিতে হইবে।

পারিপার্শ্বিক অন্য কোন কারণে শিশু দুর্বোধ্য হইয়া উঠিলে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তাহার দুর্বোধ্যতা দূর করিতে হইবে।

শিশুদের মধ্যে সাধারণত গোলমাল, কানাকানি, চঞ্চলতা, মিথ্যা কথা বলা, একগুঁয়েমি প্রভৃতি নানা-ভাবের অত্যধিক প্রবণতা থাকে। শিক্ষকশিক্ষিকাকে ধৈর্য ও বিবেচনার সহিত এইসমস্ত দোষগুলির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। মিথ্যাভাষী শিশুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়; এই দোষ যদিও অতি সাধারণ কিন্তু ইহার ক্রিয়া অতি সুদূরপ্রসারী এবং অপরিসীম ক্ষতিকর; আবার এই দোষ সংশোধন করা আরও কঠিন। শাস্তির ভয় হইতে নিরাপদ হইবার বাসনায়, প্রতারণা

করিবার লোভে, অন্য কোন দুষ্কৃতকারী বন্ধুকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় অথবা বিশেষ কোন সুবিধা লাভের জন্য শিশুগণ কখনও কখনও মিথ্যা কথা বলে।

কি উদ্দেশ্য লইয়া ছাত্র-ছাত্রী মিথ্যা কথা বলে প্রথমেই শিক্ষক-শিক্ষিকা তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা করিবেন এবং পরে তাহার প্রতিকার করিবেন। নিজেরা সর্বদা কার্যে ও বাক্যে সততা দেখাইবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীকে বুঝিতে দিবেন যে তাহারা তাঁহাকে কিছুতেই প্রতারণা করিতে পারিবে না, প্রতারণা করিলেই ধরা পড়িবে। মিথ্যাকথা বলা যে দোষ এবং কাপুরুষতার লক্ষণ, এবং তাহা যে কত ঘৃণ্য তাহা বুঝাইয়া দিবেন। নিজ আচরণ দ্বারা ইহাও বুঝাইবেন যে সত্যবাদিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যাহারা পিতামাতা, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট সর্বদা কঠিন ব্যবহার পায় তাহারাই সাধারণত মিথ্যাকথা বলিতে ও প্রতারণা করিতে শেখে। এইরূপ স্থলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাত্র-ছাত্রীর মনের ভয় দূর করিবেন এবং সহানুভূতির সহিত তাহাকে দোষ স্বীকার করিতে শিখাইবেন। যতক্ষণ প্রমাণ না পান, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের বিশ্বাস করিবেন এবং নানারূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাহাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন। সত্যভাবে গল্প বলিয়া যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে দিলে শিশু সত্যবাদী হইয়া ওঠে। আবার কোন নীতিপূর্ণ গল্প বলিলে সত্যবাদী শিশু মিথ্যাকথার অপকারিতা ও সত্যকথার উপকারিতা বুঝিতে পারে। গৃহে ধর্মসম্পর্কীয় শিক্ষা দিলে ও ঘুমাইবার পূর্বে জীবনীপাঠ করিতে দিলে সততার প্রতি শিশু আকৃষ্ট হয়।

আর এক শ্রেণীর শিশু দেখা যায় যাহারা অত্যন্ত অবাধ্য। ভয় প্রদর্শন বা শারীরিক দণ্ডদ্বারা শিশুরা বাধ্যতা শেখে না কিন্তু শিক্ষকদের প্রতি ভালবাসা জন্মিলে বালক আগ্রহের সহিত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে। কারণ আজ্ঞানুবর্তিতা বালকস্বভাবের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুতরাং শিক্ষক শিক্ষিকা চেষ্টা করিবেন যেন শিশু তাঁহার ব্যবহারে আকৃষ্ট হয় ও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা পালন করে।

বিদ্যালয়ের নিয়ম এরূপ হওয়া উচিত যে, সে সম্বন্ধে ছাত্রদের পরিষ্কার ধারণা থাকিবে এবং উহা পালন করিলে যে তাহাদের মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা যেন তাহারা বুঝিতে পারে। ছাত্রছাত্রীর প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে ও প্রথমে অল্প অল্প করিয়া নিয়ম পালন শিক্ষা দিতে হইবে এবং ঐ সম্বন্ধে অভ্যাস করাইতে হইবে। বিদ্যালয়ের নিয়ম পালনে অভ্যস্ত হইলেই গুরুজন ও শিক্ষকশিক্ষিকার আদেশ পালনেও তাহাদের ক্রমে অভ্যাস হইয়া আসিবে।

শিক্ষকশিক্ষিকা এমন আদেশ করিবেন না যাহা পালন করিতে শিশু অসমর্থ হয়। যে সব শিশু শিক্ষকশিক্ষিকাকে বিরক্ত করিবার জন্য অবাধ্য হয়, তাহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া প্রফুল্লভাব দেখাইবেন। যাহারা লজ্জা, ভয় কিংবা দুর্বলতাবশত অবাধ্য হয় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বাধ্য হইতে শিক্ষা দিবেন। বালকবালিকার মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য নানাবিধ চিত্তাকর্ষক কাজের ব্যবস্থা করিলে অবাধ্য বালক উহাতে আকৃষ্ট হইয়া শিক্ষকের বাধ্য হইবে। কেবল বিদ্যালয়ে নয় যাহাতে গৃহেও শিশু বাধ্যতার অভ্যস্ত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কলহপ্রবৃত্তি শিশুর একটি সহজ বৃত্তি। শিশুর ইচ্ছায় বা কার্যে কোনপ্রকার ব্যাঘাত জন্মাইলে আমরা তাহার কলহবৃত্তি ও ক্রোধের পরিচয় পাইয়া থাকি। গৃহশিক্ষার উপরেই এই বিষয় বেশী নির্ভর করে। গৃহে যদি অনবরত কুকথা ও ঝগড়া শোনে তবে বিদ্যালয়ে আসিয়া পিতা-

ভ্রাতার এবং গৃহের অন্যকরণে ঝগড়া করিয়া থাকে, অকথা কুকথা ব্যবহার করে। আত্মাভিমান এবং কর্তৃত্বপ্রিয়তা যাহাদের মধ্যে বেশী দেখা যায় এবং যাহারা অন্যের নিকট অবনত হইতে চাহে না তাহারাও অনেক ক্ষেত্রে কলহপ্রিয় হইয়া থাকে। কলহের মূল কারণ আত্মসংযমের অভাব। যে সকল শিশু অসৎ প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না তাহারাই ঝগড়া করিতে ভালবাসে। কলহপ্রিয় বালকবালিকাদের সর্বদা কার্যে ব্যস্ত রাখিতে হইবে, এমন খেলা ও কার্যের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে তাহাদের স্বার্থপরতা দূর হয় এবং নিঃস্বার্থপরতা, আত্মসংযম, শুশ্রূষা ইত্যাদি শিক্ষা করিতে পারে। শ্রেণীবদ্ধ বা দলবদ্ধ হইয়া কোন বস্তু সংগ্রহ করা, বিদ্যালয়ের ছোটখাট সংকাজ করা, উদ্যানের কাজ করা অথবা দলবদ্ধ হইয়া খেলা করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বার্থপরতা প্রশমিত করা সম্ভব। নৈতিক শিক্ষাপূর্ণ নানা পুস্তক পাঠ করিতে দিলে এবং ঐরূপ গল্প বলিলে শিশু অন্যের সুখ দুঃখ বুঝিতে পারে। তাহাতে তাহার নীচতা, স্বার্থপরতা, কলহপ্রিয়তা দূর হয়। কলহপ্রিয় শিশুকে আবশ্যক হইলে আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে, কিংবা তাহার কোন প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত নিন্দনীয় কার্যের জন্য তাহাকে অনুতপ্ত হইতে দিতে হইবে। সময় সময় তাহাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলে অথবা নেতার পদ দিলে তাহার কলহপ্রিয়তা দূর হইয়া যাইবে।

শিক্ষকশিক্ষিকা যদি চিত্তাকর্ষক কার্যের এবং লিখনপঠনের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শিশুমনের এই সকল দুর্বোধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সমস্যা দূর হইয়া শিশুগণ ভবিষ্যতের সমাজ ও দেশের হিতকারী নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দের স্রষ্টা এই শিক্ষকশিক্ষিকাগণই। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই গুরু দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া অপরিসীম ধৈর্যের সহিত সম্পূর্ণ মনোনিবেশ চিত্তে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে দেশ ও সমাজ সুস্থ, সবল, বিচক্ষণ নাগরিকদ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে।

"শিক্ষা"র নিয়মাবলী

১। 'শিক্ষা' বাংলা মাস অনুসারে বাহির হইবে। বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা অগ্রিম দেয় প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণ্য করা হয়। বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলে অগ্রহায়ণ হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ তোতার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৭৲ টাকা। শিক্ষকের কর্তব্যের পৃষ্ঠা ২৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৮৲, সিকি পৃষ্ঠা ৯৲ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ তোতার লেন, পোঃ বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কেমিক্যাল্‌স্ এণ্ড মিনারেল্‌স্ কোম্পানী লিমিটেড

আজকাল বহুপ্রকার শিল্প-সংক্রান্ত রাসায়নিক বস্তু তৈয়ারি করিতেছেন এবং বিদেশে সেইগুলি রপ্তানি করিতেছেন। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের এই উত্তম অভিনব ও প্রশংসনীয়। ১৯৩১ সালে স্থাপিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতে করিতে এখন ইহা একটি সর্ব্বজনখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

কারখানা : ১১, ট্যাংরা রোড, কলিকাতা

টেলি : ২৪—৪৯০৫

কার্য্যালয় : ৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলি : ২৪—১০০৪।১০০৫

সোল এজেণ্টস্

দাস এণ্ড কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

শিক্ষা

ম ধি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১৩শ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৬২ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম

এ পর্যন্ত ইংরেজী হইয়া আসিয়াছে শিক্ষার মাধ্যম। এখন ভারতবর্ষে নানা দিগ্‌ব্যাপী পরিবর্তনের মধ্যে শিক্ষা এবং শিক্ষার মাধ্যমেরও পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাহা সম্বন্ধে এখনকার অবস্থা হইল এই যে, প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করায় কাহারও কোনও আপত্তি না থাকিলেও এবং মাধ্যমিক স্তরেও মাতৃভাষা ব্যাপক ভাবে মাধ্যমরূপে স্বীকৃত হইলেও কলেজী শিক্ষায় মাতৃভাষাই চলিবে, না, ইংরেজী চলিবে, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে তো এতদিন প্রশ্নই ছিল না।

উত্তর প্রদেশের গভর্নর শ্রী কে, এম্, মুন্সী মহাশয় নাগপুরে গুজরাট সাহিত্য পরিষদের উদ্বোধনী সভায় (গত ২৭ অক্টোবরে) একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশের প্রত্যেক রাষ্ট্রে যদি হিন্দীকে উচ্চ শিক্ষার বাহন না করা হয় তাহা হইলে প্রাদেশিকতা বাড়িবে এবং ভারতের ঐক্য বিপন্ন হইবে। আর যদি হিন্দীকে ঐরূপ বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে প্রাদেশিক ভাষাগুলি ক্রমতর 'হকার' লাভ করিবে। যাহারা হিন্দী অনর্গল বলিতে বা লিখিতে পারিবে না, নিকট ভবিষ্যতে তাঁহাদের নিজের রাষ্ট্রের বাহিরে আর কোথাও ঠাঁই হইবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের গভর্নর হরেকৃষ্ণ মহতাব মহাশয় বলিয়াছেন, হিন্দীকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ না করিলে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির মান নামিয়া যাইবে, অন্যান্য রাষ্ট্রের বিদ্বানদের সঙ্গে সংযোগ হইবে কীণ। দেশে রাজ্য পরিচালন কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে, সেবার কার্য হইবে সীমাবদ্ধ, এবং প্রাদেশিকতা জাতীয়তাকে উৎখাত করিতে যাইবে।

কিন্তু কেন এত ভয়? আমরা যদি হিন্দীকে একেবারেই বর্জন করিতে যাইতাম, তাহা হইলে না হয় এমন হইত। অন্যে হিন্দী বলিলে তাহা বুঝিতে পারিব, কিন্তু নিজের মাতৃভাষায় বলিলে তাহা আরও পরিষ্কার ভাবেই বুঝিব, এই অবস্থার ব্যতিক্রম হইবে কেন? আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে ভাষায় শিখান, অধ্যাপক হীরেন্দ্রসুন্দর যে ভাষায় শিক্ষাদান করিতেন, রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ ও ভাব অভিব্যক্ত করিতেন, তাহার স্থানে হিন্দীকে কেন বসাইব, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা কেন হইবে না—ঐরূপ যুক্তির কি এখনও প্রয়োজন আছে? ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়?

ছাত্রসমাজে অসংযম

২৯ অক্টোবর তারিখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রতিনিধিরা দিল্লীতে একত্র হইয়াছিল। প্রায় ২৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বারো শতেরও বেশি ছাত্র একত্র হয়, উপলক্ষ্য, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় যুবোৎসব। উৎসবের আরম্ভে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ প্রতিনিধিদের নিকট তাহারা এবিষয়ে কি ভাবে তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাই আলোচনা হয়—ছাত্রসমাজে অসংযমের কারণ কি, তাহার প্রতিকারই বা কি?

ছাত্রেরা নানা দিক্ হইতে সমস্যাটি আলোচনা করে। কেহ বলে যে, বাড়ির কুশিক্ষাই এজন্য দায়ী, কেহ বা বলে যে এজন্য দায়ী হইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক দলাদলি, কেহ বা বলে যে, কলেজে ছাত্রাধিক্যই ইহার কারণ। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ভারতবর্ষে দ্রুত হইতেছে, আমাদের সমাজ তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য এখনও স্থাপন করিতে পারে নাই, তাই এত অসংযম; আহার জীর্ণ হয় না; কর্তৃপক্ষও সমস্যাটি ভাল করিয়া অনুধাবন করেন নাই। ইহাও এক কারণ হইতে পারে। দুই চারিজন ছাত্র ইহাও বলিয়াছে যে, ছাত্র-সমাজে অসংযম জাতীয়তার যুবশক্তির ক্ষেত্রে অসংযমেরই একটা অংশ মাত্র।

শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি জনাব হুমায়ুন কবীর বলেন যে, ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থে ও জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে এবিষয়ে অবহিত হইয়া এই শিক্ষার সদ্ব্যবহার করা উচিত। শুধু বর্তমান শিক্ষা নিষ্ফল বলিলে চলিবে না, ইহার মধ্য দিয়াই অনেক নেতাকে আমরা পাইয়াছি। ধীরে ধীরে বর্তমান দুরবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে, এবং যদি ক্ষুদ্র ও সাময়িক ব্যাপার লইয়া প্রলয় কাণ্ড করিয়া বসি, তবে আর নেতৃত্বের শিখরদেশে আমরা পৌঁছাইতেই পারিব না।

আলোচনা সভার সভাপতি শ্রীসৌধি বলেন যে, সংযম জীবনব্যাপী সাধনার ফল এবং শিক্ষার প্রথম ধাপে অর্থাৎ ছাত্রদশাতে ইহা বহুল পরিমাণে আশা করিলে নিরাশ হইতেই হইবে। অবশ্য সেই-জন্যই আবার বাল্যকালে সংযম শিক্ষা বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞান কলেজ বনাম টেকনলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রী থ্যাকার একটা সমস্যার কথা বলিয়াছেন, অতীত কালে এই সমস্যার বিষয়ে বেশী কিছু চিন্তা করা হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতেই হইবে। সমস্যাটা হইল শিক্ষিতের বেকার-সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবে এই সমস্যার উৎপত্তি বলিয়া তিনি মনে করেন; যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিল্পগুলির প্রয়োজন কি তাহা বোঝেন না, মনুষ্য যে শিক্ষা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করেন না। তৃতীয় বিকল্পের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। তাহা হইল এই যে, শিল্পের প্রসার, শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বড় বড় কথা বলা হইলেও আসলে শিল্পের উন্নতি এত সামান্য হইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিদ্‌দিগকে শিল্পের মধ্যে নেওয়ায় কিছু বিশেষ পার্থক্য হয় নাই। তা ছাড়া, এ বিশ্বাস ছড়ানো আছে যে শিল্প-প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ স্থলেই যন্ত্রবিৎ বা মিস্ত্রীকে দিয়াই চালানো যায়। শুধু উপরে কয়েকজন বিশেষশিক্ষিত লোক থাকিলেই

হইল। সম্ভবত ব্রিটিশ শিল্প ভিক্টোরিয়ার যুগে যেমন ছিল তাহা হইতে এই বিশ্বাস আসিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড এখন আর ভিক্টোরিয়ার যুগে নাই। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে শিল্পপতিরা এবিষয়ে অনেক অবহিত হইয়াছেন, এবং বহু-সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোককে দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো যে কত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আজকাল আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ, দেশের যেখানে গুণী লোক পাওয়া যায় সকলকেই শিল্পের কাজে না লাগাইলে চলিবে না। P. E. P. সার্ভের ফলে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সালে যে ৩৯৪১ জন ডিগ্রী লাভ করিয়াছিল ও প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৩'৪ জন manufacturing industry তে যোগ দেয়। যাহারা প্রথম শ্রেণীর Honours পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ভাগ, শতকরা ২৩'৭ জন শিল্পের দিকে যায়, আর ১৮.৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য। তারপরে ৮'৬ শতকরা জন যায় সিভিল সার্ভিসে। দেখা যায়, ভাল ছেলেদের মধ্যে শিক্ষকতার আহ্বানে তেমন সাড়া জাগায় না, যাহারা মধ্যম শ্রেণীর তাহারাই শিক্ষকতার দিকে যায়। ইহা ভাবনার কথা, উদ্বেগের কথা, কারণ বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষায় অবনতি হইলে দেশের সমূহ ক্ষতি, শিল্পের সমূহ ক্ষতি। বিলাতে প্রতি সপ্তাহেই কোন না কোন বিভাগ হইতে অভিযোগ শোনা যায় যে ঠিক ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে না।

কিন্তু আমাদের দেশে? শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা না থাকিলেও দলে দলে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করিতেছে, আশা যে যথাসময়ে একটা সরকারি চাকুরি পাইবে। এবং এই বিষয়ে নেতারা ভাবিতেছেন যে অধিকাংশ সরকারি চাকুরীর জন্য ডিগ্রী পাওয়ার প্রয়োজন নাই, এরূপ নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত শিক্ষার্থীর ভিড় কমিবে। কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখিতেছেন না যে, দেশের যেখানে গুণী লোক পাওয়া যায় সকলকে সরকারি কাজে লাগানো কত দরকার, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত নয়, আমাদের দেশে public sector-এর ক্ষেত্র কত বিস্তৃত করা হইতেছে। শুধু সারা জীবন রুটিন-মাফিক কাজ করিতে হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কেও দেশের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এ পর্যন্ত তাঁহারা যেমন মামুলিভাবে চলিয়াছেন, তেমন ভাবে চলিলে হইবে না। পলিটেকনিক প্রণালীকে আরও বেশি কাজে লাগাইতে হইবে। টেকনলজির শিক্ষা জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ইহারই মধ্যে বিশেষ ভাবে সরকারি চেষ্টা চলিতেছে। এই সব টেকনলজিক্যাল প্রতিষ্ঠান কিরূপ মানে চলিবে, তাহার উপর ইহাদের উপযোগিতা নির্ভর করে। আমেরিকার মাসাচুসেটস ও ক্যালিফর্ণিয়ার টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউট ও লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিতে হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার মান বহু বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কোনও অংশে কম নহে। এক ইম্পিরিয়াল কলেজেই তিন হাজার ছাত্রের স্থান। কিন্তু স্নাতকপূর্ব শ্রেণীতে যে তিন বৎসর পড়িতে হয় সেখানে বিশেষ করিয়া গণিতে, মূলীভূত বিজ্ঞান গুলিতে ও ইনজিনীয়ারিং এর প্রধান প্রধান শাখায় দক্ষতা অর্জন করা চাই। স্নাতকোত্তর বিভাগে আবার যথেষ্ট বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইংরেজ শিল্পপতিরা বিশেষ করিয়া এইরূপ বিশেষজ্ঞদের, (যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন) সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় ও যান্ত্রিক বিদ্যালয়—কলেজ অফ সায়েন্স বা টেকনলজিকাল ইনস্টিটিউট উভয় প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষাদানের মানকে যথাসম্ভব উন্নত রাখিতে হইবে, তবেই দেশের ও শিল্পের কল্যাণ।

ভূগোল শিক্ষা

শহরের পরিচয়

শ্রীমতী বকুলমালা সেন

আমাদের দেশ পল্লী-প্রধান। অধিকাংশ বালক বালিকারই শহরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে না। নিম্নলিখিত ছড়াগুলির সাহায্যে গান ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শহরের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ক্রীড়াভিনয়টিকে পাঁচটি অংশে ভাগ করে নিতে হবে। বালক বালিকা নগর ভ্রমণ করে নগরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করছে, এই ভাবটিকে স্বল্পপরিসর স্থানে সম্ভবপর করার জন্য নগরকেই চলমান কল্পনা করে নিতে হবে। এজন্য নগরের পরিচয়-যোগ্য বস্তুগুলি পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়ে পর পর ক্রীড়াঙ্গণে প্রবেশ করবে। প্রতিদলের পরিচয় দান সাঙ্গ হলে তারা পিছন দিকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রথম ভাগে থাকবে রেলগাড়ি, ফেরিওয়ালা ও কুলি। রেলগাড়ির প্রতিনিধিস্থানীয় একদল ছেলে মেয়ে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে লাইন করে ক্রীড়াঙ্গণ ঘুরে আবার যথাস্থানে দাঁড়াবে। কুলি ও ফেরিওয়ালা পরে আসবে।

প্রথম দল পিছনে গিয়ে দাঁড়ানোর পর দ্বিতীয় দলের সবাই একেএকে প্রবেশ করবে। এই দলে থাকবে পীচের রাস্তা, দোকান, বাগান, যানবাহন, জলের কল, নলকূপ, পার্ক। পীচের রাস্তার প্রতিভূ ছেলেমেয়েরা প্রথমে আসবে সারি বেঁধে। তারা ছড়াগানের সঙ্গে একবার ক্রীড়াঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে মধ্যস্থলে ক্রীড়াঙ্গণকে পাশাপাশি দুভাগে বিভক্ত করে সরল রেখায় বসবে। এর পর একে একে যানবাহন এসে এই রাস্তাকে মধ্যস্থলে রেখে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে ছড়াগান বা আবৃত্তি করবে। তারা স্বীয় ভূমিকার গতিবেগকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে।

তৃতীয় দলে আসবে অফিস আদালত, ডাকঘর, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ও ক্লাব। খেলার মাঠের প্রতিভূ ছেলেমেয়ের দল পরস্পরের হাত ধরে চতুষ্কোণ রচনা ক'রে ছড়াগান বা আবৃত্তির সঙ্গে প্রবেশ করবে এবং ক্রীড়াভূমির মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ রচনা করে হাঁটুগেড়ে বসবে। বসবার পর দ্বিতীয়বার ছড়াগানের সময় সম্মুখ ও পিছনের অংশ পৃথক্‌ভাবে ছড়ার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ গান বা আবৃত্তি করবে এবং শেষ দুই পংক্তি সকলে একত্রে গান বা আবৃত্তি করবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক সঙ্গে ও কলেজ পরে প্রবেশ করবে। ক্লাবের পিছনে পিছনে একই সঙ্গে ব্যায়ামাগার, ক্রীড়াভূমি ও সংস্কৃতি সংঘ প্রবেশ করবে। ক্রীড়াঙ্গণের মধ্যস্থলে যাওয়াআসি জায়গায় ক্লাবকে রেখে একদিকে পাঠাগার ও সংস্কৃতিসংঘ অপর দিকে ক্রীড়াভূমি ও ব্যায়ামাগার দাঁড়াবে। ব্যায়ামের সঙ্গে অফিসার ও কেরাণী এবং অফিস ও আদালত একসঙ্গে প্রবেশ করবে।

চতুর্থ দলে আসবে ফুটপাথ, পৌর অফিস, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, সভাসমিতি, কারখানা। ফুটপাথের ভূমিকায় একদল ছেলেমেয়ে সারিবেঁধে আবৃত্তি বা গানের সঙ্গে প্রবেশ করে ক্রীড়াঙ্গণের দুইপাশে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে বসবে। পৌর অফিসের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ এবং কারখানার সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় মজুর ও মালিক প্রবেশ করবে।

পঞ্চম দলে আসবে বিজলীবাতি, বত্তি, রঙ্গমঞ্চ ও উপাসনালয়। বত্তির সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বত্তিবাসী, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সিনেমা, নাটক, ও জলসা প্রবেশ করবে। সর্বশেষে উপাসনালয়ের প্রতিভূ হয়ে আসবে ধূপ, দীপ ও শঙ্খ।

প্রতিদল স্থান ত্যাগ করে যাওয়ার আগে যখন সমবেতভাবে গান বা আবৃত্তি করবে, তখন একবার ক্রীড়াঙ্গণ প্রদক্ষিণ ক'রে পিছনে নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাবে। পঞ্চম দল শেষের ছড়া আবৃত্তির সময় উপাসনালয় বাদে অন্যান্য সকলে এবং বালক বালিকা দুইপাশে গিয়ে দাঁড়াবে। সর্বশেষ অংশটুকু সকল দল একসঙ্গে গান বা আবৃত্তি করবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিচয়জ্ঞাপক পোশাক বা নাম-লেখা টিকিট ব্যবহার করবে।

আত্মিক অভিব্যক্তিসহ ছড়াগান ও আবৃত্তি

রেলগাড়ি—

ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক
রেলগাড়ি এল ঠিক,
চিরকাল অনলস কর্মে।
ছুটোছুটি হুটোপাটি
যত ভরা হবে মাটি,
চটপট নাম প্লাটফর্মে।

প্রথম ফেরিওয়ালা—

পান বিড়ি বিড়ি পান
সোডা লেমনেড,

দ্বিতীয় ফেরিওয়ালা—

সিঙ্গাপুরী কলা খান
জোড়া ডামলেট।

তৃতীয় ফেরিওয়ালা—

চা চাই বাবু গরম চা
গরম চা, গরম চা,

চতুর্থ ফেরিওয়ালা—

তালমুট তাজা,
একদম তাজা।

কুলি—

কুলি বাবু কুলি কুলি,
উঠলো সবুজ নিশান দুলি।

সকলে—

ছাড়লো গাড়ি সময় হৈ,
লাগলো বিষম হল্লা হৈ।
খোকা খুকু, সকর এই।
হারিয়ো না পথের খেই।
ইস্টিশান এ সহরে,
ব্যস্ত সকল পহরে।

বালক—

এই শহরের ইস্টিশান
বিষম ব্যাপার ভাই।
পুরো করে শ্বাস নেব তার যত্নটুকু নাই।

(বালক বালিকা বাদে সকলে)

রেলগাড়ি—

বাপ বাপ বাপ বাপ
নাই কিছু পরিমাপ,
যত পার উঠে পড় গাড়িতে।
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক,
চলে এস ঠিক ঠিক,
কে কে যাবে বিদেশে কি বাড়িতে।

ফেরিওয়ালা ও কুলি :

গাও গান, খাও পান,
এসে গেল ইস্টিশান,
তাক খুলি ঝোলা খুলি তুলিতে,
ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক
যাত্রীরা হও ঠিক,
ঘুমঘোরে লেগেছ যে দুলিতে।

বালিকা—

হাজার লোকের আনা গোনা
দুরেক রকম ভাষা,
বাইরে চল দেখবো শহর আজব চীজে ঠাসা।

প্রথম দোকানী—

আমার দোকান স্টেশনারি,
জিনিস আছে রকমারি ;

দ্বিতীয়—

ফটো তোলার ষ্টুডিও এ, তুলবি নাকি ছবি ?

তৃতীয়—

রেস্তোরাঁতে খেতে কি সাধ ?
যা চাও পাবে সবই।

চতুর্থ—

রকম রকম কাপড় জুতো,
সবই আছে মনের মত।

পঞ্চম—

ফুলের গহনা পরতে কি সাধ আছে ?

ষষ্ঠ—

শখ আছে কি ছোট্ট রঙীন বাছে ?

সকলে—

অবাক চোখে দেখছো কি ভাই,
দোকান ঘরে এসে ?
কি কি নেবে চিন্তা করো
স্থানের তলায় বসে।

বালক ও বালিকা—

কিছু না ভাই, আমরা শুধু দেখবো ঘুরে ফিরে,
কি মাধুর্য লুকিয়ে আছে শহরের এই ভিড়ে।

বাজার—

সোনার খোকা সোনার খুকু, এদিক পানে চাও,
বাজারখানি মাঝি দেখে কোথায় চলে যাও ?

প্রথম বিক্রেতা—

দেখছো কত মাংস মাছ
বিকিরি হয় সকাল সাঁঝ।

দ্বিতীয় বিক্রেতা—

কি আছে আর কী যে নেই বলবো কত মুখে,
যা কিছু চাও সবই পাবে কেনো মনের সুখে।

বালক—

কত রকম জিনিস এনে করেছে যে জড়,
দেখছো ভাই,

বালিকা—

মস্ত বাজার গাঁয়ের চেয়ে অনেক বেশী বড়,
নয়কি তাই ?

পীচের রাস্তা—

দোকানীদের কথার জালে খোকাখুকু প'ড়ো না,
দুচোখ ভরে দেখ শুধু, কোন কিছুই কিনো না।
তার চেয়ে এই রাস্তা আমি, আমার বুকে চলো,
সকল স্থানে নিয়ে যাব, কোথায় যাবে বলো।
কাজল-কালো অঙ্গ আমার যান বাহনে ভরা,
ট্রাফিক পুলিশ পথ দেখাবে পেরিয়ে এস ত্বরা।

ট্রাম—

সাবধান ! থাম থাম,
চেয়ে দেখ আমি ট্রাম,
চলি দ্রুত বিদ্যুৎ ঝলকে।
নিয়ে যাই বহু দূরে
কালিঘাট আলিপুরে
যার যেথা কাজ আছে—পলকে।

বাস—

এগিয়ো না খোকা খুকু,
দাঁড়াও না একটুকু,
চাপা পড়ে প্রাণ যাবে শেষে যে !
আপিস ও আদালতে
ইস্কুলে সিনেমাতে
দ্রুত এসে উঠে পড়ো যাবে যে।

ট্যাক্সি—

পীপ পীপ ভোঁপ ভোঁপ ছুটে যাই,
পথে পথে থামিবার ধার নাই।
যাবে যদি এস না,
আরামেতে ব'স না,
তাড়া নেব মীটারে যা ওঠে ভাই।

রিক্সা—

টুন টুন টুন ঘণ্টা বাজে
সকাল সাঁঝে
রিক্সা চলে।

হুস্ হুস্ হুস্ পরাণ কাঁপে
ভিড়ের চাপে
ঝিকসা চলে।
মানুষ-টানা এ ঘানখানা
চল্লতে কারো নাই কো মানা।
বৃদ্ধ এস,
বালক এস,
তীর্থগামী যাত্রী এস,
ঘণ্টা দোলে
মধুর দোলে,
ঝিকসা চলে।

ঘোড়ার গাড়ি—

টগবগ টগবগ চলেছে ঘোড়া
টেনে লয়ে গাড়িখানি পিছনে ঘোড়া।
মধ্যযুগের কথা পড়ে যে মনে
বিলুপ্ত অভিজাত জনের সনে।

গরুর গাড়ি—

শহরের নয়নাগী ব্যস্ত বিনা,
চলে নাকো ট্রাম বাস ট্যাক্সি বিনা।
তাই আমি মোট বই
যাহা পাই তাই লই।
আদিম কালের রূপ ছাড়িতে নারি,
ক্যাঁচ কোঁচ ক্যাঁচ কোঁচ গরুর গাড়ি।

দমকল—

অবিরাম ঠন ঠন
শুনে প্রাণ উচাটন,
আগুন লেগেছে কোথা, দমকল ছুটেছে।
সব সর হট্ যাও,
ত্রস্ত যেতে পথ দাও,
না জানি কি প্রলয়ের হুতাশন জ্বলেছে।

সাইকেল—

রিনি রিনি রিনি চিনি,
সাইকেলে কেনা চিনি।
কোনদিকে নাহি চায়,
ত্রস্ত নিজ পথে ধায়।
এল এল চাপা দিতে ছুটে এল ট্রাক ওই,
নেমে পড়ো, শুয়ে পড়, নাহি পথ ভাহা বই।

ট্রাক—

দেহে মোর কোনো খানে নাই ছিরি ছাদ,
মোটর গাড়ির সগোত্র,
সমুখে পড়িলে ঠিক হবে অপঘাত,
মানিব না কোন স্তব স্তোত্র।
বকাবক গর্জনে ছুটে যাই,
অভিজাত দলে তবু স্থান নাই।

জলের কল—

সভক্তি প্রণাম করি তোমাদের
বাংলার কুলদীপ মানবের।
নিজেদের গরবেই আছ বেশ,
দেখছো না খোকা খুকু তবে শেষ!
কণ্ঠ ও তালু গেছে শুকিয়ে,
পেলো নাকো যেতে পথ পেরিয়ে।
খোকা খুকু! পিপাসায় কর দূর,
এ জল শীতল জলে ভরপুর।

নলকূপ—

ঠাণ্ডাজলের বড়াই করা তোমায় কি
তাই সাজে?
শীতল জলের ইচ্ছা হলে আসবে
আমার কাছে।
খোকা খুকুর সাথে আমার গাঁয়ের পথে চেনা,
আমার কাছে আসবে যে তা আছেই
আমার জানা।

বালক—

থাক থাক ঝগড়া,
ভরে প্রাণ কোঁপড়া।

মালিকা—

তোমাদের দেশে ভাই গাড়িঘোড়া বিস্তর,
সবটাতে তাড়াতাড়ি, সব কিছু সত্বর।

বালক—

যেতে দাও ককমারি,
এস আগে তাড়াতাড়ি
জল খেয়ে চিত্ত
করি রস সিক্ত।

পার্ক—

সরস সবুজ ঘাসে ঢাকা,
মাঝে মাঝে বেঞ্চি রাখা,
অহোরাত্র কাজের ভিড়ে স্বর্গ হেন ধাম।
ছায়া আছে দোলনা আছে,
নিত্য বাদীর মন্ত্র আছে,
আদর করে সবাই আমার 'পার্ক' রেখেছে নাম।
শীতল জলে ঠাণ্ডা হয়ে খোকা খুকু এস ভাই,
একটু খানি আরাম কর, হেথা কিছু বিলম্ব নাই।

বালক বালিকা—

মিষ্টি তোমার কথা গুলি লাগছে বড় ভালো,
যন্ত্র রাজ্যের ফেলে তুমি দিব্যলোকের আলো।
হেথায় এসে দেহমনের ক্লান্তি হলো ক্ষয়,
তোমার কোলে তোমার বোলে সুধার ধারা বয়।

বালক বালিকা বাহে দকলে—

পথের পরে পথ যে কত
যান বাহনে সদাই তপ্ত;
দোকান বাজার শত শত,
সব জিনিসই চিত্তহরা।
নলকূপ আর জলের কলে
সাঁঝ সকালে দলে দলে
মেয়ে পুরুষ লাইন দিয়ে
পূর্ণ পাত্র যায় নিয়ে।
রাস্তাগুলোর বাঁকে বাঁকে
ছোট্ট ভূমিখণ্ড থাকে।
বালো তাদায় কি নাম যে
খোকা খুকু, দেখ ভেবে।

অফিস ও আদালত—

খোকা খুকু চলে যায়
এ দিকেতে নাহি চায়,
এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই।
এ পাশেতে এস না,
একটুকু ব'সো না,
মতুবা হৃদয়ে বড় ব্যথা পাই।

অফিস—

অফিসেতে অনন্তায় গিসগিস।
কত লোক আসে যায়
কত কিছু কাজে ধায়,
কথা বলে চুপি চুপি ফিস ফিস।

আদালত—

কাজ চলে আদালতে ছয়দম।
দারোগার চাপরাশি
কারো মুখে নেই হাসি
কলে যেন চলে ফেরে কথা কয়।

ব্যাঙ্ক—

ব্যাঙ্কের লেন দেন চলছে তো চলছে
অবিরাম।
শত শত কেরাণীরা খাটছে তো খাটছে
বিবি রাম!

অফিসার—

ছোট বড় অফিসার
কাজে কারো নাহি পার,
প্রাণপণে ক্লান্তিরে কথছি।

কেরাণী—

হাতে নাহি গোনা যায়
কত কিছু আর যায় টুকটি।

ডাকঘর—

সব চেয়ে আগে এস এখানে,
দেখ দেখি চেয়ে মোরে চেন কি?
যেরূপ দেখেছ মোর সেবানে
তার সাথে কোন কিছু মেলে কি?

প্রকাণ্ড এ বাড়িখানি ডাকঘর,
তিলার্ধ নাহি কারো অবসর।
প্রাথমিক বিদ্যালয়—
পল্লীর স্কুল হতে ভিন্ন
যত দেখ শুধু মোরে চিনিবে,
মিলাইয়া দেখ সব চিহ্ন
উত্তম বলে মোরে মানিবে।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়—
তিনতলা বাড়ি দেখ যত
শিক্ষক সংখ্যার কত যে!
শাখা প্রশাখার তার প্রান্ত
গোণা নাহি যায় তাহা সহজে।
দুপুরে ও সকালেও বসে স্কুল,
মৌচাক বলে নাহি করো ভুল।
কলেজ—
এদিক পানে চাইবে নাকি কলেজ আমার নাম,
চিনতে কি তাই পার?
কত গাঁয়ের স্কুলের ছেলে হয়ে সিদ্ধকাম
এই খানে হয় জড়।
বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে
ছুটছে সবে হেথায় এসে
ডিগ্রি তরে নানা,
ছেলে মেয়ে বামুন চাঁড়াল,
আসছে ধনী, আসছে কাঙাল,
মুক্ত দুয়ার সবার কাছে নাই যে কোনো মানা।
স্বদেশ বিদেশ নাই কো ভেদ,
জ্ঞান চর্চায় রয় না খেদ।
বালক বালিকা—
কলেজ, তোমায় বড্ড ভালবাসি,
দুদিন পরে আমরা সুজন ছুটবো হেথা আসি।
খেলার মাঠ—
হাডু-ডু-ডু ছুটবল,
কত কত খেলা আছে দেখ না।

টেনিস ও ক্রিকেটের
উপাদান আছে ঢের,
ভাল করে দেখে শুনে শেখনা।
দিগন্ত ছোঁয়া আমি খেলিবার মাঠ,
বসিবার গ্যালারির দেখ কিবা ঠাট।
ক্লাব—
বড়াই করা থাক না তোলা,
রাখো তোমার খুলি খোলা,
ওগো খেলার মাঠ!
সুধিষ্ঠাকুর চোখ বুঁজেছে, বন্ধ করা পাট।
এস খোকা, এস খুকু,
এ দিক পানে
ভয় বা কি?
ফিরিয়ে এস এপথ টুকু
সাবধানে,
শুনলে কি?
ছেলেমেয়ের প্রিয় যাহা দেখবে যদি
সে এই ক্লাব,
তৈয়ী রাখি সকল জিনিস নিরবধি
নাই অভাব।
ক্লাবের পাঠাগার—
আলমারী ভরা বই
পাঠাগার দেখ ওই,
পড়বে?
ব্যায়ামাগার—
দেহচর্চার তরে
কত সাজ থরে থরে,
লড়বে?
ক্লাবের ক্রীড়াভূমি—
খেলিবার সরঞ্জাম
কত তার করো নাম!
দেখেছ?
সংস্কৃতি সংঘ—
সঙ্গীত বাদ্য
শেখে সবে নিত্য
বুঝেছ?

ক্লাব—

ছেলেমেয়েদের আমি বেসেছি ভালো,
তাই তো তাদের পথে মেলেছি আলো।

বালক—

গালোয়ান হবো আমি ডম্বেল ভেঁজে,

বালিকা—

ভেবেছ কি হ'বে আমি লতিকাটি সেজে?

বালক—

বড় বড় লেখকের এত বই আছে,
ছাড়বো না সব আমি পড়বো।

বালিকা—

সাহিত্য রসের সরোবরে যে কমল রাজে
তারি বাসে প্রাণ মন ভরবো।

বালক—

হা-রু-রু-রু ফুটবল খেলবো,

বালিকা—

নানাজাতি সঙ্গীত শিখবো,

বালক—

সেরা ছেলে হবো আমি এদেশের, বুঝেছিস?

বালিকা—

আমি হবো বাংলার সেরা মেয়ে—দেখে নিস।

বালক বালিকা বাদে সকলে—

অফিস ও আদালতে
কাজ চলে বিনিমতে
দশটা ও পাঁচটা।
ব্যাঙ্কের হিসাবের
সারাদিন চলে ফের
মিলে যায় শেষটা।
ডাক-ঘরে চিঠি দিতে
সেভিংসে টাকা নিতে
আসে লোক অগণন,
বিদ্যার ঘর যুড়ে
বিদ্যালয়েরে পুজে
দেশে দেশে গুণীজন।

খেলিবার মাঠে রোজ
স্বাস্থ্যের লাগে ভোজ
ছেলেদের মেয়েদের;
সংঘের ছায়া-তলে
ভবিষ্য-দীপ জ্বলে
নাশ নাই তারতের।

ফুটপাথ—

ফুটপাথ ধরে চল এগিয়ে,
চারিদিকে চোখ রাখ জাগিয়ে।
ঘরেছে পকেটমার সব ঠাঁই,
হকারের উৎপাতে শেষ নাই।

পৌর অফিস—

সবার সাথে আছি মিশে মর্যাদা তাই রইল না,
খোকা খুকু সবিস্ময়ে আমার পানে চাইল না।
শুনবে খোকা খুকু? আমি কেউ কেটা তো নই,
শহর খানির যতেক বোঝা আমার শিরেই বই।

পৌর অফিসের প্রথম বিভাগ—

ঘুরছে পাখা, চলছে গাড়ি,

দ্বিতীয় বিভাগ—

শ্রমিক কৃষক সারি সারি,

প্রথম বিভাগ—

গ্যাসের আলো বিজলী বাতি
বাইরে ঘরে আলছি নিতি।

দ্বিতীয় বিভাগ—

ধাপ্পা বাটের আবর্জনা
পরিষ্কারের উপায় নানা
করছি আমি অনলস,
চাই না মান চাই না যশ।

হাসপাতাল—

মানছি তুমি কর্মী অতি,
তাই পেয়েছ সবার নতি।
আমিও কম নই,
কয়জনের সেবাব্রত সারা জীবন বই।

ডাক্তারখানা—

কত ওষুধ পত্র
আমি যোগাই নিত্য।
যত রুগ্ন জনা
হাতে যায় না গণা,
আসে সন্ধ্যা প্রাতে,
আসে মধ্য রাতে।
আছে যতেক হাওয়াই
আমি তাদের খাওয়াই।

সভা সমিতি—

লাখো লোকের সমাবেশে
হরেক রকম নেতা এসে
বলছে কথা দৃপ্ত সুগম্ভীর।
খোকা খুকু হেথায় এস,
চুপটি করে একটু ব'স
শীঘ্র তেয়াগি সাবধানে গ্রহণ কর ক্ষীর।

বালক—

সভা-সমিতির কথা শুনেছি কানে
আজি তাহা দেখিলাম চক্ষে,

বালিকা—

কত না মহৎ ভাব জাগায় প্রাণে
প্রেরণার লাগে বাণ বক্ষে।

কারখানা—

দেখবে কিছু নতুন যদি
ছোড়ে এস এখানে—
সভা থাক।
মালিক মজুর নিরবধি
খাটছে দেখ যেখানে,
নাই কো ফাঁক।

প্রথম মজুর—

চলছে মেশিন সকাল সাঁঝে,
ব্যস্ত সবাই যে যার কাজে।

দ্বিতীয় মজুর—

শিল্প গড়ে নানান জাতি
খাটছে মজুর দিবস রাতি।

মালিক—

যন্ত্র যুগের বিশেষ অবদান,
যাচ্ছে শোন সাঁঝের ভেঁপু, কাজের অবসান।

বালক বালিকা—

নগর দেখে ফিরছি পথে পথে
ক্লান্ত চরণ দুটি,
অবশ দেহ টেনে চলছি কোনমতে
আকাশপারে একে একে উঠছে তারা ফুটি।

বালক বালিকা বাদে

সকলে—

রাস্তার দুই ধারে ফুটপাথ,
তারি পাশে বড় বড় বাড়িতে
কত কত কাজ চলে দিনরাত
নগরীর কল্যাণ করিতে।
সুস্থ ও রুগ্নের যাহা চাই,
মূর্খ ও গণীবের যাহা নাই,
তারি তরে খাটি দিন রাত,
অবজ্ঞার নই মোরা পাত্র।

বিজলীবাতি—

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল।
ভয় পেয়ো না খোকা খুকু
সবুর কর।
দিনের আলোর সমান আলো
জ্বালবো, বসো, একটুখানি
ধৈর্য ধর।
দেখছো এবার আলোর খেলা,
বিজলী বাতির চাঁদনী খেলা?

বস্তি—

মজুরেরা দলে দলে বাস করে যেখানে
নাম তার বস্তি;
খোকা খুকু না দেখিলে—কি কি আছে সেখানে
পাবে না কো বস্তি।

প্রথম বস্তিবাসী—

ছোট ছোট এঁদো ঘরে নাই আলো হাওয়া নাই,
নাই কারো ফুর্তি,

দ্বিতীয়—মলা মাছি ভন ভন—তারি মাঝে
আছি এই প্রাণহীন মূর্তি।

রঙ্গমঞ্চ—দুঃখ তোমার কত যে তা' সবাই জানি,
খোকা খুকু বুঝবে গো তা বুঝবে।
বড় হয়ে কঠোর করে আঘাত হানি
অমঙ্গলের সাথে তারা যুঝবে।

সিনেমা—এখন তারা ছোট নেহাৎ হাসি খুশির মরণা,
তাই তো ডাকি হেথায় এস।
আমার মাঝে নিত্য রাজে আনন্দেরই বন্যা,
খোকা খুকু, একটু বস।

নাটক—হাসি গানের উৎস আমি
না জানে কে ?
খুশি বিলোই দিবসযামী
না মানে কে ?

জলসা—

জলসা আমি পূর্ণ নাচে গানে,
ভাসাই সবে আনন্দেরই বানে।

বিজলীবাতি, বস্তি ও বালক বালিকা বাদে
সকলে—

সকল বিষণ্ণতা নাশি'
সবার মুখে ফোটাই হাসি।
রঙ্গভূমি নাম,
তোমরা খুশি হলেই আমার পূর্ণ মনস্কাম।

উপাসনালয়ের দীপ—

আরতির দীপ জ্বলে শান্ত,
খোকা খুকু, এস পথ-ক্লান্ত,
ভুলোনা ঐ মনোহর বাক্যে
মায়ামর রূপ চাকচিক্যে।

শঙ্খ—

সুগম্ভীর শঙ্খেতে ধ্বনিত
ঘণ্টা ও কাঁসরেতে রণিত

এস ভাই দেবালয়ে, নিত্য
লও মাগি অমলিন চিত্ত।

ধূপ—

নিঃশেষে আপনারে বিলায়ে
বাতাসে সুবাসটুকু মিলায়ে
যাচি শুধু দেবতার তুষ্টি
সাধিবারে আত্মার পুষ্টি।

ধূপ-দীপ-শঙ্খ—

খোকা খুকু, এস কর্ম-ক্লান্ত,
দেবালয়ে দীপ জ্বলে শান্ত।

বালক—

ভালবাসি তোমায় মোরা সবার চেয়ে বেশী
তাইতো হেথা আসি
পুরলো মনস্কাম।

বালিকা—

তোমার সুবাস, তোমার আলো,
ঘুচায় সবার মনের কালো,
শহর গাঁয়ে বিভেদ কিছু নাই।

বালক বালিকা—

তোমার এ রূপ চিরন্তনী
সকল জ্ঞানের উৎস আমি,
পরাণ ছোঁকো প্রণাম লহ তাই।

বিজলীবাতি—আলোই আমি বিশ্ব-জোড়া আলো,
বস্তি—যার না তাতে আমায় নিবিড় কালো।
রঙ্গমঞ্চ—নৃত্য-গীতে লহর তুলে চলি,
উপাসনালয়—চরণ-তলে সব অশুভ দলি।

উপাসনালয় ও
বালক বালিকা বাদে
সকলে (পাঁচ দল একত্রে)—

আলোকে ও অন্ধকারে এই তো নগর-চিত্র,
পল্লীবাসী নগরবাসী চিরকালের মিত্র।
অবাক খোকা খুকু দেখে আজব যত কাণ্ড,
দেখা শোনার ভাবলো কিছু জানা শোনার ভাণ্ড।

বাংলা পড়ানোয় পর্যবেক্ষণশক্তির অনুশীলন

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

অল্প সময়ে মানবশিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য সমাজ-স্রোত থেকে শিক্ষায়তনকে পৃথক্ করে' নেওয়া হয়েছিল। তারপর কালক্রমে সেই শিক্ষায়তন সমাজকে অগ্রাহ্য ক'রে চলতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দিক্‌কে বিকশিত করা। বার্ধ না হওয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত মানুষই মধ্যপুরুষ হ'তে চায়। কাজেই অনেক অর্থ-প্রার্থী নীচে নেমে আসতে বাধ্য হয়, কেউ সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কেউ বাণিজ্য করে, কেউ বা রাজনীতি।

ইস্কুলকে আবার মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, সমাজের মধ্যেও। কিন্তু এখনকার সমাজ বয়স্ক গড়বার কাজে অত্যন্ত মূঢ়। তাই শিশুদেরই বয়স্ক মনে করে বড় বড় জ্ঞানের বই মুখস্থ করাতে থাকে, তাদা আরম্ভ করাতে থাকে। শিশুরা অক্ষম হয়ে পড়ে। দার্শনিকদের আবার টনক নড়ল। এবার তাঁরা শিশুদের উপযোগী ক'রে পাঠক্রম এবং পাঠদান পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আছেই, কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অহমিকাও এসে জোটে। মহাকাল তার সংশোধন করে দেন। মনোবিদ্যার ব্যাখ্যা, শিশুর মনোবিশ্লেষণ, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা প্রভৃতি সহজ অথচ জটিল বিষয় এসে পাঠদান-কে শিক্ষার পক্ষে অসার্থক করে তোলে। বিষয়গুলি সহজ, কারণ সহজেই এগুলি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু জটিল, কারণ ঐগুলির স্পষ্ট রূপ যেমন দেখা যায় না তেমনি ঐগুলি মেনে শিক্ষকেরা পাঠদান কার্যটি সমাধা ক'রে উঠতে পারেন না। শিশুদের শিশু ব'লে মান্য করা উচিত এটি যেমন সহজে বলা যায়, তেমনি শিক্ষকেরা যে মানুষ সে কথা সহজে তোলা যায় না। অতএব শিশুদের শিক্ষা এমন মিঠে হ'য়ে উঠল যে খাদ্য হিসেবে লক্ষ্যের বেশি কার্যকরী নয়। ব্যাগ্‌লী তাই বলেন, ক্রিয়াভিত্তিক যে নতুন শিক্ষা তা নিতান্তই কোমল, ফুলের ঘায়ে মূর্ছে-পড়া শিক্ষা।

মন্তব্যটি একেবারে মিথ্যা নয়। তবে, পুরনো শিক্ষাও যে বড়ই কড়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন আমরা যদি এই দুইটি মিলিয়ে নিই, তবে শিক্ষা আপাত দৃষ্টিতে সার্থক হয়ে ব'লে মনে করা যায়। এই নতুন শিক্ষাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি জীবন-উপযোগী শিক্ষা হলে। অর্থাৎ, আগের দিনের শিক্ষা ছিল ব্যবহারিক জগৎনিরপেক্ষ জ্ঞান অর্জন, এখনকার শিশুরা জ্ঞান এবং কর্মনিপুণতা অর্জন করবে কোন উদ্দেশ্যমূলক কর্ম-পরিকল্পনা যাতে তাদের সফল হয় সেইজন্য, এবং সমগ্র জ্ঞান অর্জন এবং কর্মচাঞ্চল্যকে একটি সামঞ্জস্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করবে। এই সামঞ্জস্যিক অর্থপূর্ণ সম্পর্ক আর কিছুই নয়, কর্ম ও ভাব-জগতের অনুষঙ্গ।

কিন্তু ইস্কুলের ভেতর এই ব্যাপারটি কি করে সমাধা করা যায়? সে-বিষয়ে চিন্তা করে ঠিক করা গেছে, সমগ্র শিক্ষাক্রমকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করতে হবে। (ক) পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা, (২) কর্ম-মূলক শিক্ষা, (৩) অনুষঙ্গ প্রণালীর শিক্ষা, (৪) সমস্যা-সমাধান করতে শেখা, (৫) পরীক্ষা-নিরীক্ষা-মূলক শিক্ষা, (৬) সৃষ্টিশীল শিক্ষা, (৭) স্মরণ ও চর্বণ পদ্ধতির শিক্ষা।

আমাদের সমস্যা হচ্ছে বাংলা-ভাষা শিক্ষাদানে

এই সংস্কৃতি শুধু কিভাবে লাভ করা যায়? ভাষা শিক্ষার সঙ্গে এই সংস্কৃতি শিক্ষারীতির কোথায় মিল, এবং কেমন করেই বা সে কর্তব্য সম্পাদন করা যায়?

উত্তর যে মনে মনে মেলেনা এমন নয়: তবে অসুবিধা হচ্ছে ক্লাসে বা শ্রেণীকক্ষে এই সব রীতি বাংলা ভাষার বেলায় গ্রহণ করা যায় কিনা। ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত এই সব সম্পন্ন করা তত কঠিন নয় কিন্তু সমবেতভাবে এগুলি কি করা যায়?

আমাদের দেশে 'দেখে শেখা' আর 'ঠেকে শেখা' এই দুটো কথা খুব প্রচলিত। কিন্তু বিদেশী ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা সুরু সঙ্গে আমরা অবলম্বন করেছি 'পড়ে শেখা' আর 'শুনে শেখা'-কে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেকটা দূর পর্যন্ত এই ব্যাপারই চলে; আমাদের শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এই জন্যই আমাদের সরস্বতী মূর্তিতে বাক্‌শক্তি যতখানি আছে ততখানি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই যতই শিখি ততই মনে হয় শেখা হ'ল না, তখন চলি বিদেশে আরও ডিগ্রী আনতে। ডিগ্রী দিয়ে দেশের লোককে বোঝাতে চাই, 'আমরা অনেক জেনেছি'। জেনেছি কিন্তু জানিনি। দেখে শেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষাগ্রহণের সহজ আর প্রধান পথ সেই ইন্দ্রিয়গুলি প্রখর হয়, অভ্যস্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের শক্তি স্মৃতির উপরেও অনেকখানি। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আর তৎপরতা না হলে চিন্তাশক্তিও জাগেনা। 'ঠেকে শেখা'র মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তনক্রিয়া পরিপুষ্ট আর পরিচ্ছন্ন হয়। ভাষা শিখবার বেলাতেও তাই।

বর্তমান শিক্ষা-রীতিতে পরিবেশ গঠন একটি প্রধান অঙ্গ। শিশুর চারপাশে এমন পরিবেশ রচনা করতে হবে যাতে সেই শিক্ষার বিষয়-বস্তু শিশুরা সেই পরিবেশ থেকেই আহরণ করে নিতে পারে। আহরণ করবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং নিজেরাই। এই পরিবেশ রচনা কৃত্রিমও হতে পারে আবার স্বাভাবিকও হতে পারে। শিশুরা বৃক্ষশিশুর মতো স্বাধু নয়। তারা চলাফেরা করে, স্থান বদলায়, অনেক কিছু দেখে, অনেক কিছু দেখে ভাবে। যাতেই তারা শিক্ষার বেলাতে উভয় প্রকারের পরিবেশকেই কাজে লাগাতে হয়। কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করা ব্যয়সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। সে ক্ষেত্রে যদি স্বাভাবিক পরিবেশের উপর নির্ভর করা যায় তবে শিক্ষা অনেকটা সহজ হয়ে এল।

একটি পুরনো ইস্কুলের কথাই বলছি। প্রথম শ্রেণীতে একটি মাষ্টার মশাইকে পেলাম, তাঁর এক অদ্ভুত বাতিক। ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ কি কি দিয়ে খেলিরে?' 'ভাত কি থেকে হয় জানিস?' 'লাঙলের চেহারা বোর্ডে আঁকতে পারিস?' 'সকালে তুই শশা খেয়েছিস বলছি না? শশার কেমন চেহারা রে? কিসের সঙ্গে শশার তফাৎ কি?' কোন দিন জিজ্ঞেস করতেন, 'বাড়ী থেকে ইস্কুলে আসবার পথে কি কি দেখলি বল।' 'হেড মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের মধ্যে কার ছবি টাঙানো আছে?' 'চোখ বুজে বলত, এই ঘরের কটা কড়ি বরগা?' ইত্যাদি, অথচ তিনি পড়াতেন ভূগোল—তা আমায় ইংরেজিতে। প্রথম প্রথম মনে করতাম এ তাঁর খোশ গল্প। পরে কিন্তু তাঁর আসবার আগে বিশেষ সতর্ক থাকতাম। তাঁর জুতোর ফিতে পরানোর ছিরি কটি, বোতাম লাগিয়েছেন কি না, কে নতুন রঙের জামা পরে এল—এগুলির সন্ধান নিতে আমরা তৎপর হয়ে উঠতাম। ভূগোলের সঙ্গে কি সম্পর্ক তা জানতাম না, তবে কৌতুক অনুভব করতাম।

পুরনো ইস্কুলের মাস্টার মশায়ও এই পর্যবেক্ষণ শক্তির কথা জানতেন। সাহিত্যিক হতে হলে

এই দেখবার শক্তি যে কত উন্নত হওয়া উচিত তা আমরা সবাই জানি। বানান-পদ্ধতিতে, বাক্যগঠন করতে, রচনা লিখতে, কবিতা পড়তে, অপরের কথা শুনতে—এই পর্যবেক্ষণ শক্তির চর্চা করা বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই কেবল অঙ্কন বিভাগেই যে এর প্রয়োজন তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছবির গোলমাল হলে তো মুস্কিল। 'ঘর' আর 'ঘাস' শব্দ দুটি দেখতে না জানলে বানান আর অর্থ ভুল হবে। 'প্রমথ চৌধুরী' দেখতে ভুল হয় বলেই 'প্রথম চৌধুরী' হয়ে যায়। মধুসূদন 'কীর্তিবাস' কথাটি নিয়ে বিশেষ অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানে 'কৃত্তিবাস' পড়লে অসুবিধা হবে যে।

অভিজ্ঞতাকে ঠিকমতো মনে বসানোর জন্যই পর্যবেক্ষণ শক্তির চর্চার দরকার। কিন্তু ইস্কুলে এই শক্তির চর্চাকে কেবল বাড়িয়েই ক্ষান্ত হয় না, একে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে শেখানো হয়। আমরা যখন দেখি তখন এলো মেলো ক'রে দেখি। ইস্কুল শেখাবে সেগুলো কি করে বিন্যস্ত করা যায়। বাইরের পরিবেশ 'প্রদর্শনী বিভাগ' নয় যেসব কিছু পরপর সাজিয়ে রাখা হবে; সেখান থেকে সব কিছু সাজিয়ে নিতে হবে। রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা বলেন, 'দুঃখ কষ্ট ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে।' কিন্তু কেবল তীক্ষ্ণ হ'লেই হবে না' তাকে সাজিয়ে ব্যবহার না-করতে পারলে চিন্তা-শক্তির উন্নতি হয় না। এই জন্যই দুঃখকষ্ট পেলেই মানুষে প্রতিভাশালী হয় না। 'ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হবে, তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বস্তু এমন ভাবে সাজাতে শিখতে হবে যাতে অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা অর্থ 'দেখা' নয়, 'আহরণ' নয়। অভিজ্ঞতা আলমারী নয়। অভিজ্ঞতা হচ্ছে নদীর মতো, তার গতি আছে, বস্তুপুঞ্জ আছে, বিশেষ গতিপথ আছে, উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে।

ইস্কুলে ছেলেরা যখন ভর্তি হয় তখন আমরা মনে করি, সে স্বাভাবিক মানুষ, বন্ধুদের মতো সে অনেক কিছু দেখেছে, তার অভিজ্ঞতা আছে। ভর্তির সময়কার পরীক্ষাকার্যেও আমরা এই ধারণাই প্রয়োগ করি। মূলত, ভর্তির পরীক্ষা যে তাদের 'অভিজ্ঞতার অনটন' দেখা নয়, তাদের অভিজ্ঞতার বিশেষ দিক্ নির্ণয় সে কথা আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাই বলেই ইস্কুলের মানের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার মান না-মিললে আমরা তাদের বয়খাস্ত করি। বয়খাস্ত না করার কথার মধ্য দিয়ে ইস্কুলের কর্তব্য সমাপন করি। গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে এই ব্যবস্থা অশ্রীতিকর বটেই। ভর্তির পরীক্ষায় দেখতে হবে তার ত্রুটিটা কোথায়, তাকে কিভাবে পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু এই সব পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞরা বিশেষ অজ্ঞতার পরিচয় দেন—একথা বলতেই হবে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, তথাকথিত অবুদ্ধিমান আর বুদ্ধিমানদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই, আছে পরিমাণগত। যারা বুদ্ধিমান তারা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অনেক বেশি খবর রাখে, আর অনেক বেশি সতর্ক। কিন্তু তাদের ঐ সংবাদ যে খুব সুবিন্যস্ত তা নয়।

কাজেই শিক্ষককে প্রথমেই দেখতে হবে, পরিবেশ সম্বন্ধে ছেলেরা কেন সচেতন নয়, সেগুলো তারা কেন সাজিয়ে রাখতে পারে না। তারা ঘটনাক্রমে সব কিছু দেখে, অতি পরিচিত বস্তুকে ঔদাসীন্যভরে দেখে। এই দুটি দিক যদি আমরা মনে রাখি, তাহ'লেই আমরা আমাদের কর্তব্য বুঝতে পারি। ঐ ঘটনাক্রম পর্যবেক্ষণ শক্তিকে পরিচালনামূলক পর্যবেক্ষণে রূপান্তরিত করতে হবে, আর পরিচিত বস্তুকে নিবিষ্ট চিত্তে দেখবার স্পৃহা জন্মাতে হবে।

তার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে যখন আমরা উদ্দেশ্য-পরিচালিত ক'রে তৈরী করতে পারব, তখনই তার

পর্যবেক্ষণ শক্তি থাকের হবে। এইভাবেই শিক্ষার কাজে সুফল হবে। পর্যবেক্ষণ করবার সময়ে ছেলেরা সক্রিয় হ'য়ে উঠুক এই-ই হবে শিক্ষকের নীতি। এই শক্তির দুটো দিক্ আছে। শিক্ষকেরা মনে করেন, পর্যবেক্ষণ শক্তি হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের উপায়, ছাত্রেরা মনে করে শিক্ষার এই-ই লক্ষ্য। শিক্ষক ভবিষ্যৎ দেখতে পান, ছাত্রেরা আশু সমস্যাতেই মগ্ন। ছাত্রেরা নানাবিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করে এই পর্যবেক্ষণ শক্তিতে। এখনও যারা বিশ্লেষণ-প্রিয় নয়। শিক্ষক সময় বুঝে যদি চলেন তবে হতাশ হবেন না। কারণ এই বিষয়বস্তু বিশ্লেষ ক'রে ক'রে যখন তারা রাখতে অভ্যস্ত হবে তারপরই আসবে এই বিষয়কে নিয়ে মনের পরিচালনার ক্ষমতা।

পোড়ার দিকে ইস্কুলের বাইরের বিষয়বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করা ভালো। আমাদের এই দেশে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। পুজো আছে, বীরপুজো আছে, কবি-দিবস আছে, অভিনয় আছে, সিনেমা আছে, খেলা আছে, আরও কত কি আছে। প্রথমদিকে সেইগুলির বর্ণনা শুনে নেওয়া ভালো তারা কতখানি দেখেছে, কতখানি মনে রেখেছে। পড়ার মধ্যে যদি এই প্রক্রিয়াটি আবশ্যিক ভাবে থাকে, তবে সময় আসবে যখন ছেলেরা বস্তু ক'রে দেখতে শিখবে; পরপর সাজিয়ে বলতে পারবে। বলার পরে আসবে লেখা।

বয়স্ক ছেলেরা অনেক খুঁটিনাটি দেখে, অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বলতে পারে, লিখতে পারে। শিশুরা তা পারে না। তাদের বয়স অনুযায়ী ক্ষমতাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল। ঐ ক্ষমতার মধ্য দিয়েই তারা তাদের দৃষ্টি আরও সতর্ক করুক, তারা সাজিয়ে রাখতে শিখুক। অভ্যাসের মধ্য দিয়েই এই ক্ষমতা আয়ত্ত হবে। রচনা লেখানোর ঘণ্টায় এই কাজটি ভালোভাবে করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলতে বাধা নেই, আমাদের দেশের ইস্কুলে রচনা লেখার ঘণ্টাটি নিতান্ত অপাংক্তেয়। সেই শেষের ঘণ্টাটি থাকে রচনা লেখায়। এই সময়ে ছেলেরা ছুটি পাওয়ার জন্য উসখুস করে। শিক্ষকও বলেন, 'আচ্ছা যা।' অথচ আমাদের দেশের পরীক্ষায় রচনা অংশটিই আসল। কপালে দুঃখ থাকলে খণ্ডাবে কে বলুন?

দেখবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হ'লে দেখবার বস্তুটির প্রতি আগ্রহ থাকা চাই। আগ্রহ সৃষ্টিও করা যায়। আগ্রহ থাকলেই প্রয়াস আসে। ইস্কুল থেকে ছাত্রদের নিয়ে বাইরে বেরোনো, নদীর তীরে হাঁটা, বাগান করতে শেখা, বৃক্ষরোপণ উৎসব, আমোদ অনুষ্ঠান, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, যাত্রা-অভিনয় প্রভৃতি কাজের মধ্যে অনেকখানি আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। বস্তু, ব্যক্তি, অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যই তাদের আগ্রহ বর্ধন করে। একটি ডাকঘর দেখিয়ে নিয়ে এসে তারই ছাঁচে ইস্কুলে ছেলেদের দিয়ে একটি ডাকঘর পরিচালনা ক'রে তার উপর একটি রচনা লেখালে ডাকঘর সম্পর্কে তাদের বেশ সুন্দর আর স্পষ্ট ধারণা হবে। ঐ সঙ্গে ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্বন্ধে স্বাধীন মতামতও লিখতে বলা যেতে পারে।

অনেক ইস্কুলেই দেখা গেছে, পঞ্চমশ্রেণীর নীচে ছেলেদের লেখানোর মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয় না। কারণ বোধ হয় এই, তারা মনে করেন যে, ছেলেরা ঐ বয়সে লিখতে পারে না। লেখার মতো লিখতে হয়ত পারে না কিন্তু তাদের মনোভাব প্রকাশ করবার চেষ্টায় তারা বিমুখ একথা বোঝা গেল কি করে? আসল কথা, নিম্ন বয়স থেকে বলার অভ্যাস আমরা তৈরী করিনি, তাই এই শ্রেণীতে তারা গুছিয়ে লিখতে পারে না। নিজে গুছিয়ে লিখতে না-জানলে বইয়ের গোছান লেখা-ও যে তারা বুঝতে পারবে না। শুধু পড়বে শব্দ-অর্থ আর বানান। বইয়ের পড়া লেখার চেয়ে, নিজেদের অভিজ্ঞতা, চাক্ষুষ বিষয়ের বর্ণনা করা সহজ। সেই

দিক্ দিয়েই তো আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আর তার প্রধান এবং প্রথম পথ এই পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মানো। ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রকাশ করতে খুব বেশি ভালোবাসে, অভিনয় করতে ভালোবাসে, খেলতে ভালোবাসে। সেই পথকেই অবলম্বন করে আমাদের এগোতে হবে।

যারা লিখতে পারে না, অথচ পড়তে পারে তাদের জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। উত্তরগুলো কেবল 'হাঁ' 'না' অংশে দাগালেই চলবে। যেমন : নিচের কথা গুলো 'ঠিক' বলে মনে হলে 'হাঁ'-এর যায়গায় গোল দাগ দাও, আর 'ভুল' মনে হ'লে 'না'-এর যায়গায় গোল দাগ দাও।

১। কোকিল ডাকে হুতা-হুতা ক'রে.....হাঁ না।
২। কাঁঠালের গায়ে কাঁটা নেই.....হাঁ না।
৩। কুকুর শিং নিয়ে তাড়া করে.....হাঁ না।
৪। বটগাছ ছায়া দেয়.....হাঁ না।
৫। আমগাছের পাতা ছাতার মতো বড় আর চওড়া.....হাঁ না।
৬। শজারুর গায়ে কাঁটা আছে.....হাঁ না।

একটি ছবির বই দেওয়া হল। সেটি আবছাটা করে পড়ল। তারপর যদি ছাপানো প্রশ্নপত্র দিয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া যায় তবে পড়ার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টির প্রমাণের সৃষ্টি করা যায়। যেমন :

(১) বইতে কয়টি ছবি আছে ?
(২) কয়টি রঙীন ছবি ?
(৩) কি কি পশুর নাম আছে ?
(৪) কি কি পাখীর নাম আছে ?
(৫) মানুষের নাম কয়টি পেলে ?
(৬) কাকটি কোথায় বসে ছিল ?
(৭) কয়টি ছড়া আছে ?
(৮) লেখকের নাম কি ?
(৯) বইটি কোন্ ছাপাখানা থেকে ছাপানো হয়েছে ?
(১০) বইয়ের দাম কত ?
(১১) বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা কত ?

কোন সময় ছেলেদের নিয়ে মুদিখানার কিংবা মনোহারী দোকানে শিক্ষক পরিদর্শনে বেরোতে পারেন। ফিরে এসে, তারা যা-যা দেখল তার একটা স্মৃতি-রচনা পরীক্ষা করলেন। তারপর লম্বাতীয়, তৈলজাতীয়, শর্করাজাতীয় প্রভৃতি ভাগ ক'রে বিষয়বস্তু যা দেখেছে তার নাম ঐ ঐ শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করতে আহ্বান করবেন। এইভাবে স্মৃতির আবৃত্তি এবং পরিচয়মূলক অভীক্ষার পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। যারা লিখতে পারে তারা লিখবে, যারা বলতে পারে তারা বলবে।

এমনি ক'রে বলা, লেখা এবং দেখার দিক শিক্ষা দেওয়া হয়। বলা, লেখা ভাষা-শিক্ষার বিশেষ অবলম্বন। কাজেই ভাষা-শিক্ষায় এই পর্যবেক্ষণ শক্তির চর্চা বিশেষ কার্যকরী। তা ছাড়া স্মৃতির, দিকটি কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিজ্ঞতার সেই সেই সঞ্চিত দিকও তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

তবে এমনি পাঠদানে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হতে হয়। প্রধান শক্ত কাজ হচ্ছে, নিজের বলবার স্পৃহাকে কমিয়ে আনা। দ্বিতীয় শক্ত কাজ, নিজের পর্যবেক্ষণ শক্তির বিশেষ ব্যবহার এবং যে-সব পুঁথি-পুস্তক পড়তে দেবেন সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় রাখা। তৃতীয় শক্ত কাজ, ছেলে-মেয়েদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন। চতুর্থ, শিক্ষককে অধ্যয়ন-বিদ্যার কিছুটা অধিকার সঞ্চয় করতে হবে। শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগে এই অধ্যয়ন বিদ্যা আবশ্যিক ভাবে আছে। অনেকে বলেন, 'ওর প্রয়োজন কি ? আমরা শিক্ষা-ইতিহাস পড়ব, শিক্ষানীতি ও বিজ্ঞান পড়ব, পড়ব বিষয়গত পদ্ধতি, আঁকতে শিখব কেন ? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি, বাঙলার শিক্ষকের পক্ষে আঁকতে

জানা, আর প্রত্যেকটি বিভাগ সাঙ্গাতে জানা শিক্ষণ-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য একথা ঠিক যে, শিক্ষণ-শিক্ষার এই দিকটি যাতে বিশেষ করে শেখানো হয়, প্রায়োগিক করে শেখানো হয় তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। নতুবা ব্যবসায়ী কাজে কোন সাড়াই আসে না।

ইতিহাসের লক্ষ্য ও মূল্য*

শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস

ইতিহাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য ইহার লক্ষ্য (aims) ও মূল্যের (values) মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করিতে হইবে। কোন কাজ করিতে গিয়া যে উদ্দেশ্যকে আমরা মনের সামনে রাখি তাহাই লক্ষ্য। কাজটি আমরা করি যেহেতু সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে ইচ্ছা করি। কাজটি করিতে করিতে ও তাহা শেষ করিয়া আমরা যাহা পাই তাহাই প্রকৃত ফলাফল বা গুণাগুণ, এবং তাহাই মূল্য। আমাদের লক্ষ্য ও প্রকৃত ফলাফল এক না-ও বা হইতে পারে। ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কারই কলম্বাসের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। লক্ষ্য একটিমাত্র হইতে পারে কিন্তু মূল্য নানা প্রকারের হইতে পারে এবং তাহাদের গুরুত্ব কম বেশি হইতে পারে। অনেক কিছু কারণে আমরা হয়ত কোন কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি, আদর্শকে রূপ দিতে গিয়া সেক্ষেত্রে আমাদের নানাবিধ অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে। এই অভিজ্ঞতাগুলিই মূল্য এবং তাহাই আমাদের লাভ।

বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা দিতে গিয়া আমরা অনেক মূল্য উপলব্ধি করিয়া থাকি। কিন্তু যখন আমরা ইতিহাস পড়ান ঠিক করি তখন সর্বদা মূল্যগুলি উপলব্ধি করিব, এই লক্ষ্য থাকে না। সুতরাং লক্ষ্যের সহিত মূল্যগুলি মিশাইয়া ফেলা আমাদের উচিত হইবে না। অনেকেই কিন্তু মিশাইয়া ফেলেন; তাহা "কেন আমরা ইতিহাস শিখাই" এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়।

এই প্রশ্নের উত্তর অনেক হইতে পারে; প্রধান কয়েকটা উত্তর নীচে লিখিত হইতেছে।

১। শিশুদের স্মরণশক্তি, কল্পনা, ও যুক্তিতর্কের ক্ষমতা শিক্ষা দিবার জন্য আমরা ইতিহাস শিখাই।

২। নৈতিক লাভের জন্য আমরা ইতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকি। "ইতিহাস আর কিছু নয়, দৃষ্টান্তের দ্বারা দর্শনের শিক্ষাদান।" "ইতিহাস একটি ধ্বনিমাত্র যাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সত্য ও মিথ্যার নৈতিক নিয়মাবলী উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেছে।"

৩। দেশভক্তি জাগাইবার জন্য আমরা ইতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকি। আমাদের বালকবালিকাগণ তাহাদের মাতৃভূমির গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা অবশ্যই জানিবে এবং সেই বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিয়া মাতৃভূমিকে অবশ্যই ভালবাসিতে শিখিবে।

৪। যে সময় যে ধরণের গভর্নমেন্ট বর্তমান থাকে তাহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিতে আমরা ইতিহাস শিখাই।

*Oxford University Press হইতে প্রকাশিত Suggestions for the Teaching of History of India by V. D. Gate হইতে "Aims and Values" অধ্যায়ের মর্মানুবাদ।

৯। কথায় আছে ইতিহাস অতীত রাজনীতি। সুতরাং আমরা ভবিষ্যতের রাজনীতিকগণের শিক্ষার জন্য ইতিহাস পড়াই।

প্রশ্ন এই যে, উপরে যে সকল উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইল সেগুলি লক্ষ্য না মূল্য? ইতিহাস শিক্ষার মধ্য দিয়া আমরা যে উদ্দেশ্য পূরণ করিতে চাই, ইহাদের কোনটিকে কি একটি উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? যদি ইহাদের কোনটিকে আমাদের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় তবে আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে এমমাত্র ইতিহাসই এই লক্ষ্য পূরণ করিতে পারে অথবা অন্য যে কোন বিষয় (সাহিত্য, ভূগোল, দর্শন, অঙ্ক ইত্যাদি) অপেক্ষা ইতিহাসই যথেষ্টভাবে এবং অধিকতর পূর্ণতার সঙ্গে এই কাজ করিতে পারে। যদি আমরা দেখি যে মোটের উপর যাহাকে উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহা একটি মূল্য, এবং আমরা ইতিহাস অন্য উদ্দেশ্যে পড়াইতে গিয়া এই মূল্য উপলব্ধি করি, সেক্ষেত্রে ইহার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ আমরা না-ও করিতে পারি। কারণ, ইহা আমাদের ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণাকে অথবা আলোচনাকে প্রভাবিত করিতে পারে না।

আমরা এখন নানাবিধ লক্ষ্য ও তাহাতে যে সব সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া দাবী করা হয় তাহার বিচার করিব। এবিষয়ে আমরা আমাদিগকে দুইটি প্রশ্ন করিব। এই উদ্দেশ্য কি সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত? অন্য কোন বিষয় দ্বারা কি এই লক্ষ্য অর্জন করা যায় না? এখন উপরের পাঁচটি উত্তর লইয়া আলোচনা করিব।

১। শিশুদের স্মরণশক্তি চর্চার জন্য আমরা কি ইতিহাস শিখাই? এই লক্ষ্য কি মহৎ? পাটীগণিত বা ভূগোলের ন্যায় অন্য দুটি বিষয় স্মরণ-শক্তি বাড়াইবার কাজে কি সাহায্য করিতে পারে না?

একদা স্মরণশক্তির শিক্ষা অথবা কল্পনা বা যুক্তি-তর্কের ন্যায় মনোবৃত্তিগুলির শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত। তখন মানুষ বিশ্বাস করিত যে মন মাত্র কতকগুলি পরস্পর স্বাধীন ও বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির সমষ্টি মাত্র। মানুষ আরও মনে করিত যে এই মনোবৃত্তিগুলি পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত মসলা ও উপায় খোঁজ করাই শিক্ষকের কাজ। প্রাণীবিদ্যা হইতে আমাদের জ্ঞান হইয়াছে যে মন একটি প্রত্যঙ্গ (organism) এবং ইহার বৃদ্ধি হয়। তাই আমরা বিদ্যালয়গুলিতে ইতিহাস কিংবা অন্য কোন বিষয়ের প্রবর্তন কেবল এই কারণে করিতে পারি না যে মানসিক অনুশীলন (gymnastics) তাহারই দ্বারা উৎকৃষ্ট রূপে সাধিত হয়।

কল্পনা ও যুক্তিতর্ক শিক্ষণের কাজ যদি ইতিহাস করে তবে অন্য বিষয়গুলিও ঐ একই কাজ করিবার ক্ষমতা রাখে। ইতিহাসের চেয়ে সাহিত্য কল্পনার এবং অঙ্ক যুক্তিশীলতার বিকাশ অনেক বেশি করে। তাহা হইলে বলা যায় যে কল্পনা, স্মরণশক্তি অথবা যুক্তিতর্ক শিক্ষা লক্ষ্য নয়—মূল্যমাত্র। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইতিহাস দ্বারাও ইহা লাভ করা যায়।

২। নৈতিক কারণে কি আমরা ইতিহাস পড়াইব? ইতিহাস অনেক বড় বড় মানুষের কথা নিয়া আলোচনা করে। তাঁহারা অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করিয়াছিলেন এবং মহৎ কাজের জন্য নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আরও বলা হয় যে ইতিহাস দেখায়, পরিণামে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় হয়।

এই উক্তি সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে সৎলোক কষ্ট পাইয়াছেন, এবং দুষ্ট লোক লাভবান হইয়াছে। তারপর, ইতিহাসে যাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সৎ ও ধার্মিক নন। লক্ষ লক্ষ মহৎ চরিত্রের নরনারী ইতিহাসে স্থান পান নাই।

নৈতিক কারণে ইতিহাসের এত সকল বড় লোকদের নাম দেওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অধিকাংশেরই চরিত্র জটিল। তখনকার কালের প্রচলিত নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া তাঁহারা চলিবেন। এই সকল লোকের বাস্তব চরিত্র অনুসরণ না করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক এই অসুবিধা এড়াইয়া চলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের সদ্‌গুণ লইয়া বাড়াবাড়ি করেন এবং বিরুদ্ধপক্ষের মন্দ কাজ বেশি করিয়া আলোচনা করেন। এই প্রকার আলোচনা ও বিচার লোকের মনে শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ইহা ইতিহাস নয়। ইতিহাসের নৈতিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে ইহা একটি মূল্য মাত্র, ইতিহাস শিখাইবার প্রধান লক্ষ্য নয়।

৩। দেশভক্তির প্রেরণা দিবার জন্যই কি আমরা ইতিহাস শিখাইব? ইহা অবশ্যই একটা মহৎ উদ্দেশ্য এবং সম্ভবত অন্য বিষয়ের চেয়ে ইতিহাস দ্বারা এই কাজটি সহজে করা যায়।

ইহাই যদি ইতিহাস শিক্ষাদানের লক্ষ্য হয় তবে ইতিহাস শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক অনুভূতিকে সম্পূর্ণ বিদ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। তবে আমরা কেন মূল দলিল পত্র সংগ্রহ করিবার কষ্ট স্বীকার করিব? তাহার কতদূর সত্য, কেনই বা সে খোঁজ করিব? কেনই বা আমাদের ব্যাখ্যা (interpretation) ও সিদ্ধান্তের সত্যতার খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা সম্যক অবহিত হইব? যদি দেশভক্তিই আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আমাদের অতীতের গৌরব ঘোষণা ও বিরুদ্ধপক্ষের অতীতের নিন্দাবাদ সমর্থনীয় হইবে। "ঠিকই করুক বা ভুলই করুক, তবুও আমার মাতৃভূমি" এই প্রকার মনোভাব তখন বৈধ হইবে। অপর পক্ষে আমরা আশা করি যে ঐতিহাসিকগণ ও ইতিহাস শিক্ষক অতীতকে—তা তাহাদের নিজেদের হোক, বা বিরুদ্ধ পক্ষের হোক,—বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লোকের সামনে হাজির করিবেন।

অবশ্য অতীতকে সঠিকভাবে দেখাইতে গিয়া আমরা শিশুকে যেন তাহার দেশকে ভালবাসিবার পথে চালনা করি। তাহাতে কোনই দোষ নাই। সত্যের অনুসন্ধানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, কেবল দেশ-ভক্তি নয়, মূল্য হিসাবে আমরা তাহা লাভ করি।

৪। শাসকদের হাতে প্রচার কার্যের যন্ত্র হিসাবে ইতিহাসকে তৈয়ারী হইতে আমরা দিব কি? দিলে, তাঁহারা কি নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য নূতন ভাবে ইতিহাস রচনা করিবেন না? কখনই তাহা হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। দেশভক্তি ও নীতির ন্যায় মহৎ কারণে যদি আমরা সত্যকে বিসর্জন করিতে প্রস্তুত না হই, তবে স্পষ্টতই অন্য কোনও কারণে তাহা করিতে পারি না।

৫। রাজনীতিবিদের শিক্ষা কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত? আগেকার দিনে তাহাই ইতিহাস শিক্ষাদানের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সমাজের সকল স্তরের শিশুর পক্ষে ইতিহাস স্কুলে পঠিতব্য বিষয় হইবার বহু আগেই শাসনকলা ও কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য রাজপুত্রগণ ইহা অধ্যয়ন করিতেন। ভাবী সেনাপতিগণ যুদ্ধ বিদ্যা শিখিবার অঙ্গ হিসাবে ইহা আরম্ভ করিতেন।

কিন্তু রাজনীতি ইতিহাসের অঙ্গ মাত্র। সমাজের মধ্যে মানুষ যে বৃহত্তর সামাজিক জীবন যাপন করে, রাজনৈতিক জীবন তাহার একটি দিক মাত্র। ইতিহাস পূর্ণাবয়ব সমাজের জীবন লইয়া আলোচনা করে। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, কলা, ইত্যাদি বিষয় লইয়া সামাজিক জীবন বহুমুখী। ইতিহাসকে সেই বহুমুখী সমাজের প্রতি সমান বিচার করিতে হয়। এই গণতন্ত্রের যুগে রাজনীতি বিষয়ে নির্বাচিত, তাই অবস্থায় অল্প কয়েকজন লোককে শিক্ষা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত

নয়। আমাদের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে মানুষ সমাজের যে স্তর থেকেই আসুক না কেন, বর্তমান সমাজে তাহাকে পূর্ণ ও গরিমাময় জীবন যাপন করিতে হইবে এবং আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে ইতিহাস এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারে কি না।

তাহা হইলে আমাদের স্কুলে ইতিহাস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কি হইবে? বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষিত ঐতিহাসিক মণ্ডলীর প্রদর্শিত লক্ষ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা বলেন যে ইতিহাস বর্তমানের ব্যাখ্যা করে। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা, লোকজন, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম, আচার ব্যবহার এবং সমস্যাসঙ্কুল বর্তমানকে বুঝিতে ইতিহাস আমাদিগকে সাহায্য করিবেই। কেমন করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্তমান রূপ গ্রহণ করিল তাহা যতক্ষণ না জানিতে পারি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে ও আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া আনা সম্ভব নয়। বর্তমান হইল অতীতের শিশু, ইহা অতীত হইতে জন্মিয়া টিকিয়া লাভ করিয়াছে। ঘটনাচক্রে বাস্তবিক পক্ষে অতীতের স্বরূপ। কতকগুলি (conditions) আমাদের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ঘটনাচক্রের পূর্বে ঘটিয়াছিল যাহার ফলে এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিণতি দেখা দিয়াছে। ঐ ঘটনাচক্রগুলি আবার তাহারও আগে সংঘটিত কতকগুলি ঘটনাচক্রের ফল। এইভাবে কার্যকারণের ধারা গভীর অতীতের দিকে চলিয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াও আমরা রিপন, ডালহৌসী, রামমোহন রায়, শিবাজী, আকবর, বাবর, হর্ষবর্ধন, সমুদ্রগুপ্ত, অশোক, বুদ্ধ, ব্যাস এবং তাঁহাদের পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের গুহাবাসীদিগের সহিত কার্যকারণের সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট।

বর্তমানকে বুঝিতে হইলে বর্তমানের মধ্যে সূত্রায়িত অতীতকে আমাদিগকে অবশ্যই দেখিতে হইবে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কেহ কেহ ইহা এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে তাঁহারা বর্তমানের ইতিহাস পড়াইয়া পরে অতীতের ইতিহাস পড়াইবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বর্তমান হইতে আরম্ভ করিয়া বিপরীত ক্রম অনুসরণ করিতে করিতে প্রস্তর যুগে পৌঁছিবার পক্ষপাতী। এই মতবাদের গুণাগুণ আমরা পরে আলোচনা করিব। এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট যে বর্তমান কালকে জানাই ইতিহাস, সুদূর অতীতকে জানা ইতিহাস নয়। শুধু অতীতকে জানিবার জন্য আমরা অতীতের প্রতি আগ্রহশীল নই। অতীত লইয়া ঠাকুরমার রূপকথা বলিবার আমাদের সময় নাই। যদি কোন ব্যক্তি বা ঘটনা বিক্ষিপ্ত হয় তাহাতে আমাদের কোন উৎসাহ নাই। একটি বিক্ষিপ্ত ও সম্পর্করহিত ঘটনা বা মানুষ ইতিহাসে নয়। ইতিহাসে স্থান পাইতে হইলে অবশ্যই ইতিহাসের পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

বর্তমানকে বিশ্লেষণ করা, ব্যাখ্যা করা, এবং তাহার কারণগুলিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার সুবিধা একমাত্র ইতিহাসেরই আছে। আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বর্তমানকালীন সমস্যাগুলিকে বুঝিয়া উঠিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা এমন জীবন যাপন করিতে পারি যাহা উন্নত এবং লাভজনক হইবে। ইতিহাস ইহার পথ নির্দেশ করিতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে আমরা অনেক মূল্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু আমরা তাহাদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত নই।

৩১-১২-৫৪ সালের ভ্যালুয়েশনের ফলাফল

বোনাস

আজীবন বীমায় — বার্ষিক হাজার করা ১৪৲ টাকা

মেয়াদী বীমায় — বার্ষিক হাজার করা ১২৲ টাকা

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোঃ লিঃ

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিং

১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

ম্যানেজিং ডিরেক্টর,

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, এম-এ, এল-এল বি, বে পি

ঠিক

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

(১৯৪৯ সালে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হেড অফিস ঃ ২ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন ৮ কোটী টাকা।

গৃহীত মূলধন ৪ কোটি টাকা।

আদায়ীকৃত মূলধন ২ কোটী টাকা।

সংরক্ষিত তহবিল ৮৬½ লক্ষ টাকা

ভারতবর্ষের সমস্ত শহরে এবং বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্রে শাখাসমূহ

পাকিস্তানে—চট্টগ্রাম ও করাচী।

ব্রহ্মদেশে—রেঙ্গুন, মৌলমিন, আকিয়াব, মান্দালয় ও বেসিন।

ইউনাইটেড কিংডম্—লণ্ডন। সম্প্রতি হংকংএ ও খোলা হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই এজেন্সীর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের সুব্যবস্থা আছে।

জি. ডি. বিড়লা
চেয়ারম্যান

বি. পি. ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার